কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত

বিষ্ণুপুরাণ

সার সংকলন

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

পুরাণ পরিচয়

পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। পুরা ভবম্ ইতি পুরা-ট্যু বা তুট, নিপাতনে তুড় ভাব বা 'ত' লোপ পেয়ে পুরাণ হয়েছে। পুরাকালে প্রাচীন কাহিনীর এক বিশেষ গ্রন্থের নাম ছিল পুরাণ। বেদাদি গ্রন্থে এর উৎপত্তির কথা আছে। অথর্ব বেদে আছে যে যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট থেকে ঋক্ সাম ছন্দ ও পুরাণ উৎপন্ন হয়েছিল।—ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুসা সহ (অথর্ব ১১. ৭. ২৪)। এই রকমেরই কথা আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ (২. ৪.:১০) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪. ৬. ১০. ৬)।—ভিজে কাঠের আগুন থেকে যেমন পৃথক ধোঁয়া বার হয়, তেমনি সমস্ত বেদ ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই সেই মহান ভূতের নিঃশ্বাস। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ।—ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম (৭. ১. ১)। বেদ যেমন আর্য ঋষিদের প্রার্থনায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল, কতকটা সেই ভাবেই ঋষিরা পুরাণও পেয়েছিলেন। তাই শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় যে 'পুরাণ বেদ, এ সেই বেদ' এই কথা বলে অধ্বর্যু পুরাণ কথা বলেন।—অধ্বর্যুস্তাক্ষ্যো বৈ পশ্যতো রাজেত্যাহ ...পুরাণং বেদঃ সোহয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত (১৩. ৪. ৩. ১৩)।

এখন যেমন পুরাণকে ইতিহাস মনে করা হয় না, সেকালেও তা হত না। ইতিহাস শব্দটিও প্রচলিত ছিল এবং তার একটি বিশেষ অর্থ ছিল। বেদের ভাষ্যে সায়নাচার্য লিখেছেন যে বেদে দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি ঘটনার নাম ইতিহাস।—দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। এবং আগে অসৎ ছিল, আর কিছু ছিল না, ইত্যাদি জগতের আদিম অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির বিবরণের নাম পুরাণ।—ইদং বা অগ্রেনৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃ প্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গ প্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্। শঙ্করাচার্যও তাঁর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে একই কথা লিখেছেন—উর্বশী পুরূরবার সংবাদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভাগের নাম ইতিহাস এবং সর্বাগ্রে শুধু অসৎ ছিল ইত্যাদি বিবরণের নাম পুরাণ।

একালে অবশ্য পুরাণের এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সেকালে যা

ইতিহাস বলা হত, তাও এখন পুরাণের অন্তর্গত হয়েছে। অর্থাৎ সেকালের মানুষ যা ইতিহাস বলে মনে করতেন, একালের মানুষ তা আর ইতিহাস মনে করেন না। দেবাসুরের যুদ্ধ বা উর্বশী পুরূরবার কাহিনী এখন পুরাণেরই অন্তর্গত হয়েছে। সূর্য বংশের রাম বা চন্দ্র বংশের কৃষ্ণকে এখন আর ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু এই সব উক্তি থেকে স্পষ্টই মনে হয় যে পুরাকালে পুরাণ নামে একখানি পবিত্র গ্রন্থ ছিল। কিন্তু আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র মনুসংহিতা ও মহাভারতে পাওয়া যায় যে পুরাণের সংখ্যা অনেক। শিব পুরাণের রেবা খণ্ডে আছে যে বেদব্যাস ছিলেন অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা।—অষ্টাদশ পুরাণানাং বক্তা সত্যবতী সুতঃ। পদ্ম পুরাণের সৃষ্টি খণ্ডেও ঠিক একই কথা আছে। কিন্তু মৎস্য পুরাণে স্পষ্ট-ভাষায় আছে যে প্রথমে একখানি পুরাণই ছিল।—পুরাণমেকমেবাসীৎ (৫৩'৪)। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও আছে যে সকল শাস্ত্রের আগে ব্রহ্মা পুরাণ প্রকাশ করেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে বেদ নিঃসৃত হয়।—

প্রথমং সর্বশাস্ত্রানাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্তেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতা॥ (১'৫৮)

এই পুরাণে এ কথাও স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে বেদব্যাস একখানি মাত্র পুরাণ সংহিতা প্রচার করেন।

এই সব পৌরাণিক উক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মহর্ষি বেদব্যাস যে পুরাণ সংহিতাটি প্রচার করেছিলেন, তাতে তিনি প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাসকে একত্র করে তাকেই পুরাণ সংহিতা বলেছিলেন। সংহিতা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এই রকম। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে পুরাণ, তাতে এই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে প্রাচীন ঋষিদের বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার কথা ছিল। এই অংশের রচয়িতার নাম জানা যায় না বলেই তাকে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে যুক্ত হয়েছিল প্রাচীন ইতিহাসের কথা, পূর্বে যা ইতিহাস নামেই প্রচলিত ছিল। এই একখানি গ্রন্থ থেকেই পরবর্তী কালে যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি রচিত ও প্রচলিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বেদব্যাস যদি নিজে এই মহাপুরাণগুলি রচনা করতেন, তাহলে একই বিষয়বস্তু সকল গ্রন্থে আলোচিত হত না এবং বিভিন্ন পুরাণে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হত না।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে বেদব্যাস আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্পশুদ্ধি দিয়ে পুরাণ সংহিতাটি রচনা করেন। নিজের চোখে দেখে যা লেখা হয় তার নাম আখ্যান, উপাখ্যান হল পরম্পরাশ্রুত কথা, পরলোক ও অন্যান্য বিষয়ে গীতের নাম গাথা এবং শ্রাদ্ধ কল্পাদি নির্ণয়কে কল্প-শুদ্ধি বলা হয়। বেদব্যাস তাঁর সূত জাতীয় শিষ্য রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণকে এই পুরাণ সংহিতা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালের অধিকাংশ পুরাণই এই সূতের মুখে বলা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে সূত নিজের পরিচয় দিয়েছেন এই বলে যে সূত তাঁদের জাতীয় নাম এবং পুরাণ পাঠ তাঁদের জাতীয় ধর্ম। বেদব্যাসের শিষ্য সূতের বর্ণনায় শ্রোতাদের দেহ রোমাঞ্চিত হত বলেই তাঁর নাম রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণ হয়েছিল। সেদিন এই পুরাণ ছিল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। জগতের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে বেদব্যাসের কাল পর্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এই পুরাণ সংহিতায় বিধৃত হয়েছিল।

সেকালে পুরাণ সংহিতা কোন ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত হত না। তা হলে বেদব্যাস সূতকে পুরাণ সংহিতা দিতেন না। সূতের পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন না। পুরাণ সংহিতা ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত হলে বেদব্যাস নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে এই গ্রন্থ দিতেন। বেদের মতো পুরাণও ব্রাহ্মণদের অধিকারভুক্ত হত। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দ্বিতীয় ভাগে ঠিক এই কথাই লিখেছেন, 'পুরাণে সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশ বিবরণ, মন্বন্তর এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের চরিত্র বিষয়ের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। ধর্ম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ দেওয়া ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এখনকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথন, দেবার্চনা, দেবোৎসব ও ব্রত নিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্বোক্ত পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র। যদি ধর্মোপদেশ দান ইদানীন্তন প্রচলিত পুরাণের ন্যায় পূর্বতন পুরাণেরও উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা সূত জাতির ব্যবসায় না হইয়া অধুনাতন ব্রাহ্মণ কথকের ন্যায় ষটকর্মশালী ব্রাহ্মণ বর্ণেরই বৃত্তি বিশেষ বলিয়া ব্যবস্থিত হইত। ঋষি, মুনি ও অপর সাধারণ ব্রাহ্মণগণকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া সূতাদি নিকৃষ্ট জাতির ব্যবসায় হওয়া কদাচ সম্ভব নয়।'

রোমহর্ষণের ছ'জন শিষ্য ছিল বলে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে তিনজন কশ্যপ বংশীয়ের নাম শাংসপায়ন অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। এঁরা তিনজন গুরুর কাছ থেকে পাওয়া মূল পুরাণ সংহিতা অবলম্বন করে এক একখানি নূতন পুরাণ রচনা করেন। এই ভাবেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রচয়িতা পুরাণগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। পুরাণগুলির ভাষা ভাব ও রচনাভঙ্গি বিশ্লেষণ করে এই কথাই প্রমাণ হয় যে একটি সুবিস্তৃত কালের মধ্যে পুরাণগুলি রচিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের রচনা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন, যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এক এক অংশ পাঠ করিলে এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনার এত বিভিন্নতা যে যিনি বিষ্ণুপুরাণ কিম্বা ভাগবত, অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না।'

এই প্রসঙ্গেই পুরাণগুলির রচনা কালের কথা এসে পড়ে। সাধারণ ভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা এবং তিনি দ্বাপরের শেষে ও কলির প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। পুরাণেই এই হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু প্রফেসর এইচ. এইচ. উইলসন বলেছেন, 'And the testimony that establishes their existence three centuries before christianity, carries it back to a much more remote antiquity—to an antiquity that is probably not surpassed by any of the prevailing fictitious institutions or beliefs of the ancient world.' তাঁর মতে খ্রীষ্টের জন্মের তিন শো বছর আগে এই পুরাণগুলি যে বিদ্যমান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে সব প্রমাণ দেখা যায় তাতে আরও অনেক প্রাচীনকালে—প্রাচীন পৃথিবীর কোন জাতির কল্পনায়ও যা আসতে পারে না, তেমন অতীতে—এই সব পুরাণ বিদ্যমান ছিল বলা যেতে পারে। এই সশ্রদ্ধ মন্তব্যে এ দেশের পণ্ডিতরা সুখী হতে পারেন না। পাঁচ হাজার বছরকে তিন শো বছর বলায় তাঁদের সংস্কারে বোধহয় আঘাত

লেগেছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন যে বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্যৎ রাজবংশের কথায় বুদ্ধ ও নন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুরুষের উল্লেখ দেখেই তাঁর মনে হয়েছে যে গ্রন্থখানি এই সময়ের পরে রচিত। ভবিষ্যৎ রাজবংশের কথা যে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে পারে, সে কথা তাঁর মনে হয় নি; বা হলেও সে সম্ভাবনার কথা তিনি মেনে নেন নি। সে যুগে ছাপাখানার সৃষ্টি হয়নি। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তখন হাতে লিখে রক্ষা করা হত এবং পণ্ডিতরা এই কাজ করবার সময়ে যে কিছু যোগ করতেন না, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক গ্রন্থেই অনেক শ্লোক অনায়াসে প্রক্ষিপ্ত হত।

যে পুরাণে শুধু সৃষ্টি রহস্যের বিবরণ ছিল, নিঃসন্দেহে তা বৈদিক যুগের। বেদ যেমন আর্য ঋষিদের কল্পনায় উদিত হয়েছিল, এই পুরাণও তেমনি তাঁদের তপস্যার ফল। বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণে পাওয়া যায় পুরাণেরই পঞ্চ লক্ষণ। সেগুলি হল সর্গ বা সৃষ্টিসত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা লয় ও পুনর্সৃষ্টি, দেবতা ও পিতৃগণের বংশাবলী, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। বংশানুচরিতে সূর্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদের বিবরণ। বৈদিক পুরাণে শুধু সৃষ্টি বিষয়ের বর্ণনা ছিল বলেই মেনে নিতে হয় যে পরবর্তী কালেই পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে। হতে পারে যে বেদব্যাস সঙ্কলিত প্রথম পুরাণ সংহিতার এই পঞ্চ লক্ষণ পরবর্তী কালে পুরাণ রচনার আদর্শ বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল। বেদব্যাস সঙ্কলিত মূল পুরাণ সংহিতাও যে অতি প্রাচীন কালে রচিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাকে পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন বলা উচিত কিনা তার বিচার এখন অসম্ভব। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে অনেক পরবর্তী কালের রচনা তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম নিয়েও কিছু মতবিরোধ আছে। যেমন, কেউ বলেন যে বিষ্ণুপুরাণের পর শিবপুরাণ, কেউ বলেন বায়ুপুরাণ বিষ্ণুপুরাণের পর। কারও মতে শিব ও বায়ুপুরাণ একই, আবার অন্যের মতে এ দুটি পুরাণ ভিন্ন। শিবপুরাণও দুখানি আছে। ভাগবত নিয়েও এই রকম মতভেদ আছে। বৈষ্ণবরা শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ বলেন; কিন্তু শাক্তরা বলেন দেবী ভাগবতই মহাপুরাণ। কাজেই এই দুই পুরাণের একটিকে মহাপুরাণ ও অন্যটিকে উপপুরাণ বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাধারণ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতই মহাপুরাণ বলে স্বীকৃত।

এই সব পুরাণের ক্রম নিয়েও পুরাণে পুরাণে বিরোধ আছে। এই বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণের মতই সর্বাধিক গ্রাহ্য। ক্রমানুসারে বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়। কাজেই তার পরে যে সব পুরাণ রচিত হয়েছে তার ক্রম নির্দেশ যে বিষ্ণুপুরাণে সম্ভব নয়, তাও স্বীকার করতে হয়। মোটামুটি ভাবে সমন্বয় করে যে ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই ভাবেই পুরাণগুলির আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনায় উইলসন সাহেবের মতও অন্তর্ভুক্ত করা হল।

প্রথম ব্রহ্মপুরাণ। এর পূর্ব ভাগে সৃষ্টি প্রসঙ্গে দেবাসুরের জন্ম বৃত্তান্ত এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ আছে। উত্তর ভাগে উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনায় বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে মিল অত্যন্ত বেশি। এতে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নেই। উড়িষ্যার মন্দিরের বর্ণনা দেখে মনে হয় যে এই পুরাণ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দের পরে রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত এই পুরাণ দ্বিতীয় বৃহত্তম। অথচ পুরাণের প্রকৃত লক্ষণ এতে নেই। সৃষ্টি খণ্ডে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা। ভূমি খণ্ডে পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল স্বর্গ খণ্ডের প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরে তীর্থের মাহাত্ম্য ও ধর্মালোচনা, পাতাল খণ্ড রামায়ণের একটি অংশ এবং উত্তর খণ্ড ধর্মতত্ত্বের বিবৃতি। এই পুরাণে ভারতে ম্লেচ্ছের আগমন জৈন আচার ও আধুনিক বৈষ্ণবদের চিহ্ন ধারণের প্রসঙ্গ দেখে অনেকেই এটি দ্বাদশ শতাব্দের পরের রচনা মনে করেন এবং শেষ খণ্ডটি পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দে রচিত বলে অনুমান করেন।

তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ। এই পুরাণ ছ'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সৃষ্টি বিবরণ ও ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি চরিত্র বর্ণনা, দ্বিতীয় অংশে ভরত বংশের বিবরণ ও জম্বু দ্বীপ ও সপ্ত পাতাল প্রভৃতির বর্ণনা, তৃতীয় অংশে মন্বন্তর ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি, চতুর্থ অংশে সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, পঞ্চম অংশে কৃষ্ণের কথা ও ষষ্ঠ অংশে কলির বর্ণনা আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর থেকে ভবিষ্যৎ রাজবংশের বিচার করে একাদশ শতাব্দের মধ্য ভাগ পাওয়া যায়। বৌদ্ধরাও এ দেশে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। কাজেই এই সময়ের মধ্যেই বিষ্ণুপুরাণ রচিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

চতুর্থ বায়ু বা শিবপুরাণ। বায়ুপুরাণ নামে যে পুরাণ এখন প্রচলিত আছে, তা সব চেয়ে প্রাচীন ও পুরাণের সমস্ত লক্ষণ যুক্ত। ছটি সংহিতায় বিভক্ত শিবপুরাণের একটি সংহিতার নাম বায়বীয় সংহিতা, পূর্ব ভাগ ও উত্তর ভাগ নামে তার দুটি ভাগ। শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। জগতের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে শিবের বিবাহ, গণেশ ও কার্তিকের জন্ম, কাশী মাহাত্ম্য ও শিবপূজার বিধি এই পুরাণে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম শ্রীমদ্ভাগবত। অনেকের মতে এটি শ্রেষ্ঠ পুরাণ। রচনার গুণ ও সাহিত্যিক মূল্যেই এটি শ্রেষ্ঠ। অনেকের ধারণা যে এটি ব্যাসদেব বিরচিত এবং বিষ্ণুপুরাণের সমকালীন। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার এই পুরাণের উদ্দেশ্য বলে বৈষ্ণবরা এই গ্রন্থের পূজা করেন। এই গ্রন্থে দ্বাদশটি স্কন্ধ আছে এবং অন্যান্য পুরাণের ন্যায় নানা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ চরিত্র বর্ণনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পুরাণের মতে সকলের উপরে ভক্তি এবং ভক্তি থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শাক্ত মতে দেবী ভাগবতই পঞ্চম পুরাণ। এই পুরাণটিও দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত এবং দুটি ভাগবতেই শ্লোকের সংখ্যা আঠারো হাজার। দেবী ভাগবতে দেবী দুর্গার চরিত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ নারদ পুরাণ। চার পাদে বিভক্ত এই পুরাণে বিষ্ণুর প্রাধান্য কীর্তন করা হয়েছে। হরির উপাসনায় যে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় তা নানা উপাখ্যানে প্রমাণের চেষ্টা আছে। নারদীয় ও বৃহন্নারদীয় নামে একই রকমের দুখানি পুরাণ আছে। এই পুরাণের শেষাংশে আছে যে দেবনিন্দক ও গোঘাতকের নিকট যেন এই পুরাণ পাঠ না করা হয়। এর থেকেই অনুমান করা হয় যে মুসলমান অধিকারের পর ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দে এই পুরাণ রচিত হয়েছে। এতে পুরাণের লক্ষণ নেই বলে একে পুরাণ না বলে ভক্তিগ্রন্থ বললেই ভাল হত।

সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এই পুরাণে সৃষ্টি রহস্য, দর্শন, তীর্থ মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ তো আছেই, তার উপরে নানা সুন্দর উপাখ্যানের মধ্যে আছে দেবী মাহাত্ম্য নামে দুর্গা স্তব। এই দুর্গা স্তব চণ্ডী নামে হিন্দুর গৃহে পূজার মতো শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করা হয়। পুরাকালে চণ্ডীমণ্ডপে নিত্য চণ্ডী পাঠের ব্যবস্থা

ছিল। এই পুরাণটি অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন এবং নবম বা দশম শতাব্দীতে সংগৃহীত বলে অনুমান করা হয়।

অষ্টম অগ্নিপুরাণ। অগ্নির নিকট থেকে পাওয়া বলে এই পুরাণ অগ্নিপুরাণ নামে অভিহিত। এই পুরাণে অবতারের কথা, রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের কাহিনী এবং পূজা ও ব্রত পদ্ধতি, দেব দেবীর আকার বর্ণনা ও তীর্থ মাহাত্ম্যের সঙ্গে নানা শাস্ত্রের আলোচনা আছে। যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ ও পশু চিকিৎসা, সাহিত্য ব্যাকরণ ছন্দপ্রকরণ রাজধর্ম ও রত্ননিরূপণ এবং ব্যাকরণ অংশে ধাতু ও শব্দরূপও পাওয়া যায়। যুদ্ধপ্রণালী ও অস্ত্রাদি নির্মাণের পদ্ধতি, দুর্গ ও নগর নির্মাণের কৌশল, এমন কি তন্ত্রের বীজ মন্ত্রও এই পুরাণে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থকে কোন প্রাচীন পুরাণ বলে মনে হয় না, কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সংকলন।

নবম ভবিষ্য পুরাণ। এই পুরাণের পাঁচটি পর্বে ব্রহ্মের প্রাধান্য প্রকাশের প্রয়াস আছে। প্রথম চারটি পর্বে সংক্ষেপে সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনার পরে বিষ্ণু শিব ও সূর্য পূজা ও এই দেবতাদের মাহাত্ম্যের বিশদ বর্ণনা আছে। পঞ্চম পর্বে স্বর্গের বর্ণনা। প্রাচীন রাজবংশের কাহিনীও এই পুরাণে আছে। এরই মধ্যে শাক দ্বীপের সূর্য উপাসক 'মগ' জাতির উল্লেখ দেখে উইলসন সাহেব মনে করেন যে এতে ইরাণের অগ্নি উপাসকদের কথা বলা হয়েছে। বম্বে থেকে প্রকাশিত ভবিষ্য পুরাণে মোগল বাদশাহ আকবরের কথা, কলকাতার বর্ণনা এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের নাম দেখে অনেকে একে পুরাণ না বলে আধুনিক গ্রন্থ কিংবা কতকগুলি বিষয়কে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

দশম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। এই পুরাণ চার খণ্ডে বিভক্ত। ব্রহ্ম খণ্ডে সৃষ্টির ব্যাপারে কৃষ্ণের দেহ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি দেখানো হয়েছে, প্রকৃতি খণ্ডে সৃষ্টি কার্যে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী ও রাধা এই পঞ্চ প্রকৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে, গণেশ খণ্ডে গণেশের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ডে কৃষ্ণলীলার কথা। প্রকৃতি ও গণেশ খণ্ডে অনেক পৌরাণিক কাহিনীও স্থান পেয়েছে। রাধার প্রসঙ্গ আর কোন পুরাণে পাওয়া যায় না বলে অনেকেই মনে করেন যে এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকেই রাধা কৃষ্ণ লীলার কথা প্রচলিত হয়েছে।

একাদশ লিঙ্গপুরাণ। দুই ভাগে বিভক্ত এই পুরাণের উদ্দেশ্য শিব মাহাত্ম্য ও লিঙ্গ পূজার পদ্ধতি প্রচার। প্রথম ভাগে সৃষ্টি বিবরণের পর লিঙ্গের উদ্ভব ও পূজা, শিবের বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ আছে। উত্তর ভাগে বিষ্ণু ও শিব মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ আছে। এই পুরাণে আছে যে প্রলয়ের পরে যে অগ্নিময় লিঙ্গের উৎপত্তি হয়, তার জ্যোতিতেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জ্যোতির্ময় হয়েছেন। এই লিঙ্গ থেকেই বেদাদি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে পুরাণটি আধুনিক হলেও এই সময় থেকেই লিঙ্গ পূজার প্রচলন হয়েছে।

দ্বাদশ বরাহ পুরাণ। এই পুরাণে বরাহ অবতারের লীলা প্রসঙ্গ আছে। পুরাণের লক্ষণ, সৃষ্টি বিবরণ, দশাবতার তত্ত্ব, পূজাপার্বণ, ব্রত কথা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। অনেকে এটিকেও লিঙ্গপুরাণের মতো পুরাণ না বলে একখানি ধর্মগ্রন্থ বলেন। রামানুজের কালের কথা দেখে এই পুরাণকে দ্বাদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়।

ত্রয়োদশ স্কন্দ পুরাণ। এই বৃহত্তম পুরাণটি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। কাশী উৎকল ও প্রভাস খণ্ডে এই তিনটি তীর্থ ও দেবতার মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। মহেশ্বর খণ্ডে শিবের ও বৈষ্ণব খণ্ডে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন এবং ব্রহ্ম খণ্ডে রামেশ্বর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অনেক তীর্থের কথা আছে। অনেকে বলেন যে অবন্তী খণ্ড নামে আর একটি খণ্ডে আরও অনেক তীর্থের বিবরণ আছে। এই খণ্ডগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত বলে মনে করা হয়। স্কন্দ পুরাণে এত তীর্থের বিবরণ আছে যে এটিকে তীর্থের পুরাণ বললে অনুচিত হবে না।

চতুর্দশ বামন পুরাণ। এই পুরাণে বিষ্ণুর বামন অবতারের কাহিনীই প্রধান। অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী থাকলেও এই পুরাণে বিষ্ণুর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তিন চার শো বৎসর পূর্বে কাশীবাসী কোন ব্রাহ্মণ এই পুরাণ সংগ্রহ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

পঞ্চদশ কূর্ম পুরাণ। এই পুরাণের চারটি সংহিতার মধ্যে এখন শুধু ব্রহ্ম সংহিতাই পাওয়া যায় এবং এই সংহিতাটিই কূর্ম পুরাণ নামে প্রচলিত। এতে

সৃষ্টি ও বংশ বিবরণ থেকে শুরু করে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও ক্রিয়া মাহাত্ম্য আছে। ঈশ্বর গীতায় দর্শন তত্ত্বের ভক্তি সাঙ্খ্য ও কাল যোগ এবং ব্যাসগীতায় ব্রহ্মচারী ধর্মের কথা আছে। অনেকের মতে এই ঈশ্বর গীতা শ্রীমদ্ভাগবত গীতার সঙ্গে তুলনীয়। শিব ও দুর্গার মাহাত্ম্য এই পুরাণে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং এই পুরাণের মতে শিবপুরাণ ও বায়ুপুরাণ এই দুইটি মহাপুরাণ। এতে কয়েকটি তন্ত্র শাস্ত্রের উল্লেখ দেখে মনে করা হয় যে পুরাণখানি বেশি পুরাতন নয়।

ষোড়শ মৎস্য পুরাণ। এই পুরাণে বিষ্ণুর মৎস্য অবতারের কাহিনী প্রধান হলেও আরও অনেক পৌরাণিক কাহিনী, সূর্য ও চন্দ্র বংশ ও ভবিষ্য রাজবংশের বিবরণ আছে। এতে মহাপুরাণের পঞ্চ লক্ষণ আছে; কিন্তু এই পুরাণে উপপুরাণের বর্ণনা দেখে অনেকে একে বেশি প্রাচীন বলে স্বীকার করেন না।

সপ্তদশ গরুড় পুরাণ। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে দুই খণ্ডে বিভক্ত এই পুরাণে গরুড়ের কোন কথা নেই। এতে অনেক পূজা প্রায়শ্চিত্ত ব্রতকথাদি আছে, রত্ন পরীক্ষা, আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ, ছন্দ, স্ত্রীবশীকরণ, মশক নিবারণের কথাও আছে। এ ছাড়া সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, নানা পৌরাণিক কাহিনী ও নরকের বর্ণনা আছে। এই পুরাণে অনেক নীতি কথা ও রাজধর্মের কথাও পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। স্কন্দপুরাণের সব কয়টি খণ্ড যেমন একত্রে পাওয়া যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণও পাওয়া যায় না। বায়ুপুরাণের শেষ অংশের নাম ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হয়েছে কিনা বোঝা যায় না। এখন যা পাওয়া যায় তাতে অনেক পৌরাণিক কথা আছে। তার মধ্যে প্রধান হল সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত অধ্যাত্ম রামায়ণ। এই রামায়ণের অন্তর্গত রাম গীতায় অনেক দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে।

উপরে উক্ত পুরাণগুলির সংকলন কাল সম্বন্ধে বিদেশী পণ্ডিতেরা যে মত প্রকাশ করেছেন, আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত তা মেনে নিলেও অনেকে তা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা মনে করেন যে প্রধান পুরাণগুলির সঙ্কলন কাল বৈদিক যুগের ঠিক পরেই। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের অনুবাদ করেছিলেন ডক্টর

বৃহ্‌লার। তিনি ঐ গ্রন্থখানি তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে রচিত বলে মনে করেন, এমন কি পাণিনির পূর্বেও তা রচিত হয়ে থাকতে পারে বলেছিলেন। এই গ্রন্থে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাবের কোন উল্লেখ না থাকায় এটি খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দে রচিত বলে মনে করা হয়। আর এই গ্রন্থে কোন পুরাণ ও ভবিষ্যৎ পুরাণ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে ভবিষ্য পুরাণের ক্রম নবম বলে সে সময়ে এর পূর্বেকার আটখানি পুরাণ প্রচলিত ছিল ভাবলে অনুচিত হবে না। যবদ্বীপে যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পাওয়া যায় তা এ দেশের পুরাণ থেকে অভিন্ন। পঞ্চম শতাব্দে হিন্দুরা এই গ্রন্থ যবদ্বীপে নিয়ে যান এবং সেখানকার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভবিষ্য রাজবংশের উল্লেখ নেই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই অষ্টাদশ মহাপুরাণের শেষ পুরাণ এবং এর থেকেই প্রমাণ হয় যে পঞ্চম শতাব্দের পূর্বেই সমস্ত পুরাণগুলি রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্য রাজবংশ এর পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ভারতে তখন গুপ্ত যুগের শেষ অবস্থা। অনুমান করা যেতে পারে যে ষষ্ঠ শতাব্দে গুপ্ত যুগের শেষ রাজারাই নিজেদের নাম পুরাণে প্রক্ষেপ করিয়েছেন। এইভাবে বিচার করলে মেনে নিতে আপত্তি হবে না যে বিষ্ণু পুরাণ পরীক্ষিতের সময়, গরুড় পুরাণ জনমেজয়ের পর এবং জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের সময় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ সংকলিত হয়েছিল।

বেদব্যাস যে পুরাণ সংহিতা সঙ্কলন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য কোথাও লিপিবদ্ধ করে না গেলেও অনুমান করা শক্ত নয় যে সেটি শিক্ষামূলক গ্রন্থ ছিল। কী ভাবে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, প্রাণীর জন্ম হয়েছে কী ভাবে এবং পুরাকালে যে ইতিহাস প্রচলিত ছিল তাই সযত্নে সঙ্কলন করে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য শ্রাদ্ধাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে পাঠ করে শোনাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় যে পরবর্তীকালে এই পুরাণ প্রচারের উদ্দেশ্য হয়েছিল ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও শক্তির মহিমা প্রচার। অষ্টাদশ পুরাণে এই উদ্দেশ্যই উৎকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শৈব পুরাণকার শিবকে বলেছেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্রষ্টা, তেমনি বৈষ্ণব পুরাণকার বিষ্ণুকে এই সম্মান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে শাক্ত পুরাণকার ভগবতীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্তির জননী রূপেও প্রচার করেছেন। আবার সৌরগণের বর্ণনায় সূর্যই সকলের প্রসবিতা। লিঙ্গপুরাণে শিব বলছেন, তোমরা দুই মহাবলই আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ। তুমি লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার ডান পাশে ও তুমি হৃদয়োদ্ভব বিশ্বাত্মা বিষ্ণু আমার বাঁ পাশে উৎপন্ন হয়েছ।

শিব তাই বিষ্ণুকে বৎস বলে সম্বোধন করেছেন। এই ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা বলছেন, আমি বিষ্ণু কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করছি এবং শিব তাঁর বশে সংহার করছেন। এই ব্রহ্মাই আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্যে বলছেন, হে দেবী, তুমি আমার বিষ্ণুর ও শিবের শরীর উৎপাদন করেছ। ভবিষ্য পুরাণে সূর্যকে সকলের প্রসবিতা বলা হয়েছে।

স্কন্দ পুরাণের কেদার খণ্ডে স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে দশটিতে শিবের, চারটিতে ব্রহ্মের, দুটিতে বিষ্ণুর এবং দুটিতে ভগবতীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এই পুরাণেরই সম্ভব কাণ্ডে পাওয়া যায় যে শিব লিঙ্গ স্কন্দ ব্রহ্মাণ্ড ভবিষ্য মার্কণ্ডেয় মৎস্য কূর্ম বরাহ ও বামন এই দশটি পুরাণে শিবের, বিষ্ণু শ্রীমদ্ভাগবত গরুড় ও নারদ এহ চারখানি পুরাণে বিষ্ণুর, ব্রহ্ম ও পদ্ম এই দুটি পুরাণে ব্রহ্মর, অগ্নিপুরাণে অগ্নির ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সূর্যের মহিমা প্রচারিত হয়েছে। শাস্ত্রকাররা এই অষ্টাদশ পুরাণকে প্রধানত সাত্ত্বিক তামসিক ও রাজসিক অথবা বৈষ্ণব শৈব ও ব্রাহ্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। বিষ্ণু নারদ শ্রীমদ্ভাগবত গরুড় পদ্ম ও বরাহ এই ছখানি পুরাণ সাত্ত্বিক বা বৈষ্ণব পুরাণ, শিব লিঙ্গ মৎস্য কূর্ম স্কন্দ ও অগ্নি এই ছখানি পুরাণ তামসিক বা শৈব পুরাণ এবং ব্রহ্ম বামন মার্কণ্ডেয় ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত ও ব্রহ্মাণ্ড এই ছখানি রাজসিক বা ব্রাহ্মপুরাণ। শেষ পুরাণগুলিতে ব্রহ্মের প্রাধান্য কীর্তিত হয়েছে। এই বিভাগেও মতান্তর দেখা যায়। শুধু মতের বিরোধ নয়, সাম্প্রদায়িক বিরোধ। বিভিন্ন পুরাণে এই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যে বিরোধ, পুরাণকাররা নিজেরাই তার কারণ বলেছেন। বিরোধ ভঞ্জনের জন্য বলেছেন যে কল্প ভেদে রচনা ভেদ হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণ কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায়। এ দেশে প্রাচীন কাল থেকেই দেবতা অনেক ও তাদের প্রত্যেকের উপাসনা প্রচলিত আছে। ঋষিরাও নিজেদের মনোমত দেবতার উপাসনা করতেন এবং সেই দেবতাকে সকলের প্রিয় করবার জন্য নানা ভাবে তাঁদের মহিমা কীর্তন করতেন। পরবর্তী কালে পুরাণ রচনার সময়ে এই মনোভাবের জন্যই পুরাণে সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে।

উপপুরাণগুলি সম্বন্ধেও নানা মত দেখা যায়। উপপুরাণের সংখ্যাও আঠারো, এই কথাই সাধারণভাবে স্বীকৃত। সেগুলির নাম—আদ্য, নারসিংহ, স্কন্দ, শিবধর্ম, দুর্বাসা, নারদীয়, কাপিল, বামন, উশনা, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা,

মাহেশ্বর, শাম্ব, সৌর, পরাশর, মারীচ ও ভার্গব। অন্যত্র আরও পাঁচটি নাম পাওয়া যায়—বায়বীয়, নান্দিকেশ্বর, পাদ্ম, দেবী ও ভাস্কর। এ ছাড়াও মহাপুরাণ বলে স্বীকার না করলে আরও কয়েকখানি মূল্যবান পুরাণ উপপুরাণের পর্যায়ে পড়বে। যেমন, শিব ও বায়ুপুরাণের মধ্যে যে কোন একখানি। নারদীয় পুরাণ শিবপুরাণকে মহাপুরাণ বলেছেন, আর পণ্ডিতেরা বলেছেন যে কল্পভেদে কখনও বায়ুপুরাণ কখনও শিবপুরাণ মহাপুরাণ এবং অপরটি উপপুরাণ। তেমনি ভাগবত তিনখানি—শ্রীমদ্ভাগবত, দেবী ভাগবত ও বিষ্ণু ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ বললে অন্য দুখানি উপপুরাণ। মহাভারতকেও অনেকে মহাপুরাণ বলেন। সে ক্ষেত্রে অন্য একখানি মহাপুরাণ উপপুরাণের তালিকায় আসবে। শৈব বৈষ্ণব ও শক্তি উপপুরাণ ছাড়াও আরও অনেক উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়। সৌর গাণপত্য ও 'সঙ্কীর্ণ' উপপুরাণ। এই সমস্ত মিলিয়ে উপপুরাণের সংখ্যা একশোরও বেশি হতে পারে। এই সবের মধ্যে কল্কিপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু পুরাণের মতো বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণও আছে। বৌদ্ধরা তাদের নখানি পুরাণকে নবধর্ম বলে। জৈনদের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের নামে এক একখানি পুরাণ আছে। তার মধ্যে আদি পদ্ম উত্তর ও অরিষ্টনেমি এই চারখানি পুরাণ প্রধান।

পুরাণের দেবতত্ত্ব বা অবতারবাদ আলোচনা করতে হলে বেদে এই দুটি প্রসঙ্গের সম্বন্ধে একটা ধারণা করা দরকার। প্রাচীন আর্য সমাজে ব্রহ্মাই ছিলেন উপাস্য দেবতা। কিন্তু বিষ্ণু শিব ও শক্তির উল্লেখও বেদ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। চারটি বেদেই বিষ্ণুর বহু মন্ত্র আছে। বৈদিক যুগে বিষ্ণুও যে একজন প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে যখন বেদের ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদগুলি রচিত হয় তখন অন্যান্য দেবতার চেয়ে ব্রহ্মার উপাসনাই প্রবল হয়ে ওঠে। চার বেদেই আমরা রুদ্রের নাম পাই। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয় সংহিতায় রুদ্রাধ্যায় আছে। তাতে রুদ্রের শত নামের মধ্যে শিব ও মহাদেব আছে। সূর্যও প্রধান দেবতা, সমস্ত বেদেই তাঁর স্তব আছে। দুর্গা বা শক্তির উপাসনাও যে প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রচিত পুরাণে এই বৈদিক দেবতারা সম্পূর্ণ রূপ পেয়েছেন।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ব্রহ্মের উপাসনাই সবচেয়ে প্রাচীন,

অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা পরে প্রচলিত হয়েছে। বৈদিক যুগে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি প্রধান দেবতাদের উপাসনাও প্রচলিত ছিল না বলে বৈদিক গ্রন্থে তার বর্ণনা নেই। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বৈদিক গ্রন্থে দেবতত্ত্বের যেরূপ আভাস, পুরাণে তাহাই সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া বিপুল আয়তন লাভ করিয়াছে। ফলতঃ পূর্বতন দেবতা বিশেষের অনেকানেক উপাখ্যান পশ্চাৎ রূপান্তরিত ও পরিবর্ধিত করিয়া পৌরাণিক বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহা হিন্দু শাস্ত্রের বহুতর স্থলে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তজনেরা অন্যদীয় সুশোভন অলঙ্কার অপহরণ করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের মনোমত সজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে উদোর পিণ্ড বুধোর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া হিন্দু ধর্মের অভিনব রূপ উৎপাদন করা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্র ক্রমশঃ কতই পরিবর্তিত ও কি বিপর্যস্তই হইয়াছে!'

এই অভিযোগ সর্বতোভাবে অস্বীকার করা যায় না। বৈদিক গ্রন্থে আমরা অনেকগুলি অবতারের নাম দেখিতে পাই। ঋগ্বেদে বামন অবতারের কথা, শতপথ ব্রাহ্মণে বামন, মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ অবতারের কথা, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কূর্ম অবতারের কথা, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বরাহ অবতারের কথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরশুরাম এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষদে কৃষ্ণের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব বৈদিক গ্রন্থে অবতার ব্রহ্মার, বিষ্ণুর নয়। বৈষ্ণব পুরাণকাররা এইসব অবতার বিষ্ণুর নামে প্রচার করেছেন অনেক পরবর্তী কালে। ঠিক একই ভাবে শৈব পুরাণকার ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে শিবের নানা অবতারের কথা বলেছেন। সূর্যের অবতারের কথা বলা হয়েছে ভবিষ্য প্রভৃতি সৌর পুরাণে। শাক্ত পুরাণকাররা মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে দেবীর অবতারের কথা বর্ণনা করেছেন।

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মনে হবে যে বৈদিক গ্রন্থে এই অবতারবাদ পৃথিবীর সভ্যতার বিবর্তন প্রকাশে সহায়তা করেছিল। পৃথিবী যখন জলমগ্ন ছিল, তখন মৎস্য ছিল ব্রহ্মের বা ব্রহ্মার অবতার, পৃথিবী কর্দমাক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হলে জন্ম হয় কূর্মের, তারপর ক্রমে ক্রমে বরাহ, বামন ও মনুষ্যের। এই ভাবেই পূর্ণাবয়ব মানুষ পৃথিবীতে এসেছে।

পুরাণে যে প্রাচীন ভারতের একটা বিশ্বস্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে

কোন সংশয় নেই। অন্তত এ দেশে লিখিত ইতিহাসের পূর্বে যে সব রাজবংশ রাজত্ব করেছিল, তার পরিচয় শুধু পুরাণেই আছে। এ কথা বলেছিলেন এ দেশের পণ্ডিত ডি. আর. ভাণ্ডারকর এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যেও অনেকে এ কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক ভি. এ. স্মিথ বলেছিলেন যে মৎস্য পুরাণের অন্ধ্র রাজবংশ ও রাজাদের রাজত্ব কাল ভুল নয়। এ. বি. কীথ পুরাণের ইতিহাস সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলেও এফ. ই. পার্জিটার ও এল. ডি. বার্নেট মনে করেন যে বেদের চেয়ে পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। সব কথা হয়তো সত্য নয়, কিংবা কিছু অসঙ্গতিও হয়তো আছে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি যে মুখ্যত এ দেশের ঐতিহাসিক দলিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সূর্য বংশের ইক্ষাকু অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। তাঁর এক পুত্র নিমি ছিলেন বিদেহের রাজা। এই সূর্য বংশেরই এক রাজা বৈশালীতে রাজত্ব করতেন, আর একজন গুজরাতে। সূর্য বংশের কন্যা ইলা ও চন্দ্র বংশের পুরূরবা প্রতিষ্ঠান বা এলাহাবাদে রাজত্ব করেন। পুরূরবার পুত্র অমাবসু কনৌজে রাজা হয়েছিলেন, আর কাশীর রাজা হয়েছিলেন তাঁর পৌত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। আধুনিক পণ্ডিতরা হিসাব করে দেখেছেন যে এই সব রাজকুলের আদি পুরুষ ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় দু হাজার বছর আগের মানুষ। অর্জুনের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ অধিসীমকৃষ্ণের কথাও পুরাণে আছে। তারপরে ভবিষ্য রাজবংশের কথাও অনেক পুরাণে আছে। এই সব রাজাদের নাম আমাদের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন শিশুনাগ নন্দ মৌর্য শুঙ্গ কণ্ব অন্ধ্র ও গুপ্তরাজাদের কথা। কীভাবে এইসব নাম পুরাণে এসেছে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। শক, হূণ, যবন আভীর প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী জাতির কথাও পুরাণে পাওয়া যায়। পুরাণে আছে বলেই এদের কথা ইতিহাস নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সৃষ্টি রহস্য ও প্রাচীন ইতিহাস ছাড়াও আরও অনেক রকমের কথা পুরাণে আছে। শুধু পূজাপদ্ধতি, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, দর্শন তত্ত্ব, তীর্থ-মাহাত্ম্য নয়, রাজধর্ম, যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যা আয়ুবিদ্যা ও পশু চিকিৎসা-সাহিত্য, ব্যাকরণ ছন্দপ্রকরণ প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয়ও আছে। যুদ্ধের অস্ত্রাদি নির্মাণ, দুর্গ নির্মাণ, নগর ও গ্রাম পত্তনের কথাও আলোচিত হয়েছে। এই সব আলোচনায় তৎকালীন উৎকর্ষের পরিচয় জানা যায়। এক কথায়, এই সব পুরাণ প্রাচীন হিন্দুজাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রায় বিশ্বস্ত ইতিহাস। শ্রদ্ধা সহকারে এই পুরাণগুলি

পাঠ না করলে ভারতবাসী তার প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা অবহিত হতে পারবে না। ইদানীং দুষ্প্রাপ্য বলেই পুরাণ তার মূল্য হারিয়েছে, কিন্তু তাই বলে তার সত্য মূল্য বিন্দুমাত্র কমে নি। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো পুরাণও ভারতের অমূল্য রত্ন।

বিষ্ণুপুরাণের ভূমিকা

বিষ্ণুপুরাণের মতে এই পুরাণখানি তৃতীয়, অর্থাৎ এর পূর্বে আর দুখানি মাত্র পুরাণ রচিত হয়েছিল। এই পুরাণটি ছটি অংশে বিভক্ত এবং এর শ্লোক সংখ্যা তেইশ হাজার বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই পুরাণের ইংরাজী অনুবাদক প্রফেসর এইচ. এইচ. উইলসন মাত্র সাত হাজার শ্লোক পেয়েছেন। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন প্রসঙ্গ দেখে তিনি এর রচনা কাল একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী বলে মনে করেন। কারণ এ দেশে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব বর্তমান ছিল। এই পুরাণে ভবিষ্য রাজবংশের যে বিবরণ আছে, তা থেকে জানা যায় যে কলি যুগের চার হাজার একশো ছেচল্লিশ বৎসর গত হয়েছে, অর্থাৎ ১০৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজাদের বিবরণ আছে। এই হিসাবেই বিষ্ণুপুরাণের রচনা কাল নির্ণীত হয়েছে।

কিন্তু এ দেশের পণ্ডিতরা এই রচনা কাল নির্ভুল বলে মনে করেন না। তাঁরা অনুমান করেন যে আদি বিষ্ণুপুরাণ অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের সময়ে রচিত হয়েছিল এবং ভবিষ্য রাজবংশের কথা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে পরবর্তী কালে। বিষ্ণু পুরাণ নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম পুরাণগুলির অন্যতম এবং দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে 'অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে এই পুরাণ সর্বশিষ্ট সম্মত ও বিসম্বাদ শূন্য।' এই জন্যই সারানুবাদের জন্য এই পুরাণটি আমরা প্রথমে গ্রহণ করেছি।

বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গি বৈষ্ণব। সুতরাং অন্যান্য দেবতা এখানে গৌণ। এইমত সমস্ত পুরাণের নয়। কোন পুরাণে শিব প্রধান, কোন পুরাণে শক্তি প্রধান, আবার কোন পুরাণে ব্রহ্মও প্রধান। উপনিষদে আমরা যে সোঽহং চিন্তা দেখি. বিষ্ণু পুরাণের এক জায়গায় সেই অহং তত্ত্ব সুন্দর ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করছেন। একে একে তাঁকে বিশ্বের সৃষ্টি কর্তা পালন কর্তা ও সংহার কর্তা রূপে প্রণাম করলেন। তারপর তাঁকে দেখলেন আত্ম রূপে। বললেন, আমিই তিনি, আমা হতেই সব উৎপন্ন হয়েছে।

অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্ম সংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥

প্রহ্লাদের মুখে আমরা বেদান্তেরই সেই অহং জ্ঞানের কথা শুনি।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে শৈশব থেকেই আমরা পুরাণের অনেক কাহিনী শুনে আসছি। কিন্তু এই সব কাহিনী সব পুরাণে এক রকম নয়। উদাহরণ স্বরূপ প্রহ্লাদের কাহিনীই ধরা যেতে পারে। আমরা জানি যে হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্রের জীবন নাশের জন্য সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তোমাকে বারে বারে রক্ষা করে?' উত্তরে প্রহ্লাদ বললেন, 'হরি।' ক্রুদ্ধ পিতা প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় সে?' প্রহ্লাদ বিনীত ভাবে বললেন, 'তিনি সর্বত্র আছেন।' 'এই স্ফটিক স্তম্ভে আছেন?' 'আছেন' শুনেই পদাঘাতে সেই স্তম্ভটি ভাঙতেই বিষ্ণু নৃসিংহ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে কোলের উপর রেখে নখাগ্রে তাঁকে বধ করলেন। কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে এই কাহিনী অন্য রকম। হিরণ্যকশিপুর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর প্রহ্লাদ এসে যখন তাঁর চরণ বন্দনা করলেন, পিতা তখন পুত্রকে আলিঙ্গন করে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন, 'বৎস, তুমি জীবিত আছ?' এবং নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করলেন। তার পরের শ্লোকেই দেখা গেল যে বিষ্ণু নৃসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করলে প্রহ্লাদ দৈত্যদের অধিপতি হলেন। একটি সুদীর্ঘ কাহিনীর এমন আকস্মিক সমাপ্তি অভাবনীয় ও বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

এই সারানুবাদে আর্যশাস্ত্রে প্রকাশিত বিষ্ণু পুরাণের মূল ও অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে এবং পুরাণ পরিচয়ের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে মুখ্যত নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত বিশ্বকোষ, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত পৃথিবীর ইতিহাস এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত ভারতকোষ থেকে। এই গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশের ব্যাপারে আমার অকৃত্রিম সুহৃৎ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ও স্নেহাস্পদ শ্রীবিপুলকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ পাঠকের সমাদর পেলে দেবী মাহাত্ম্য প্রকাশক মার্কণ্ডেয় পুরাণের সারানুবাদ করার ইচ্ছা আছে। মহাভারতে যেমন গীতা, তেমনি হিন্দুর প্রিয় গ্রন্থ চণ্ডী এই মহাপুরাণের অন্তর্গত।

রম্যাণি
বি. এফ. ৭৭, সল্টলেক সিটি — গ্রন্থকার
কলিকাতা-৭০০০৬৪

সূচীপত্র

প্রথমাংশ

দ্বিতীয়াংশ

তৃতীয়াংশ

ষষ্ঠাংশ

সম্পূর্ণ

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত

বিষ্ণুপুরাণ

সার সঙ্কলন

প্রথমাংশ

ও নারাযণং নমস্কৃত্য নবঞ্চৈব নবোত্তমম্।
দেবীং সবস্বতীঞ্চৈব ততো-জযমুদীরযেৎ ॥

নবোত্তম নব, নাবাযণ ও দেবী সবস্বতীকে নমস্কাব কবে জযপ্রদ শাস্ত্র পাঠ কবতে হয।

মঙ্গলাচরণ

হে পুণ্ডবীকাক্ষ, তোমা জয হোক, হে বিশ্বেব উদ্ভাবক, আদি মহাপুরুষ হৃষীকেশ, তোমাকে নমস্কাব। যে নিত্য অক্ষব ব্রহ্ম ঈশ্বর রূপে গুণেব উর্মিব দ্বাবা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েব আধাব হয়ে প্রধান ও বুদ্ধি প্রভৃতি জগৎ প্রপঞ্চেব উৎপাদক, সেই বিষ্ণু মতি অণিমাদি ঐশ্বর্য ও মুক্তিদান করুন। বিশেষ বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবতা ও গুরুকে প্রণাম ক'ব বেদ সম্মিত পুবাণ বলব।

মৈত্রেয়-পরাশর সংবাদ

বশিষ্ঠের পৌত্র পরাশর সন্ধ্যাহ্নিক সমাপ্ত কবে উপবিষ্ট ছিলেন। মৈত্রেয এই বেদ-বেদাঙ্গ-পাবঙ্গম পুরাণ-ইতিহাসবেত্তা মুনিকে প্রণাম কবে বললেন, গুরু, আপনার নিকটেই আমি বেদ-বেদাঙ্গ ও

ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। এবারে আমি জগৎ সৃষ্টির বিষয়ে কিছু শুনতে চাই।

পরাশর বললেন, ধর্মজ্ঞ মৈত্রেয়, তুমি আমাকে পুরাতন কথা মনে করিয়ে দিলে। পিতামহ বশিষ্ঠ যা বলেছিলেন, তা আমার মনে পড়ছে। বিশ্বামিত্রর প্রেরিত রাক্ষস আমার পিতাকে ভক্ষণ করেছে জেনে আমার ক্রোধ জন্মেছিল এবং রাক্ষস বিনাশের জন্য আমি যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলাম। সেই যজ্ঞে শত শত রাক্ষস ভস্ম হতে দেখে আমার পিতামহ বললেন, বৎস, ক্রোধ ভাল নয়। তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। রাক্ষসদের অপরাধ নেই, তোমার পিতার যা ভবিতব্য ছিল তাই হয়েছে। সাধুরা ক্ষমাকেই সার মনে করেন, তুমিও যজ্ঞ বন্ধ কর। পিতামহর কথায় আমি তখনই যজ্ঞ বন্ধ করেছিলাম।

এই সময়ে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য সেখানে এলেন। পিতামহ তাঁকে অর্ঘ্য দিলেন এবং পুলস্ত্য আসন গ্রহণ করে আমাকে বললেন, গুরুজনের কথায় শত্রুতা ভুলে তুমি যে আমার বংশধর রাক্ষসদের ক্ষমা করলে, এর জন্য তুমি সর্ব শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করবে। আমার বরে তুমি পুরাণ সংহিতার কর্তা হবে।

মৈত্রেয়, তোমার প্রশ্ন শুনে এই পুরাতন ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। এইবারে আমি তোমাকে পুরাণ সংহিতা বলব। তুমি শোন।—

বিষ্ণু থেকেই জগৎ সম্ভূত হয়েছে এবং বিষ্ণুতেই তা সংস্থিত। বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ কর্তা এবং তিনিই এই জগৎ স্বরূপ।

বিষ্ণুস্তুতি, সৃষ্টি বিবরণ ও প্রলয় বর্ণনা

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
যদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব জিষ্ণবে॥
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।
বাসুদেবায় তারায় স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণে॥

একানেক স্বরূপায় স্থূলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে॥
স্বর্গস্থিতি বিনাশানাং জগতোহস্য জগন্ময়ঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরাত্মনে॥

পরাশর বললেন, যিনি বিকারহীন, শুদ্ধ, নিত্য, পরমাত্ম-স্বরূপ, সদা এক রূপ, সর্বজয়ী, যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারী, সেই হিরণ্য-গর্ভ হরি শঙ্কর বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি এক হয়েও অনেক স্বরূপ, স্থূল হয়েও সূক্ষ্ম, অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত রূপ, সেই মুক্তিদাতাকে নমস্কার। জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের যিনি মূল কারণ, সেই জগন্ময় পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি বিশ্বের আধার স্বরূপ এবং অতি সূক্ষ্ম, সেই সর্বভূতে অবস্থিত অচ্যুত পুরুষোত্তমকে নমস্কার। এই জ্ঞান স্বরূপ অত্যন্ত নির্মল ভ্রান্ত দৃষ্টিতে প্রকাশিত বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্তা জন্মরহিত অক্ষয় অব্যয় জগদীশ্বর বিষ্ণুকে প্রণাম করে দক্ষ প্রভৃতি ঋষিরা পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকটে বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য জানতে চেয়েছিলেন। ব্রহ্মা যা বলেছিলেন, ঋষিরা তা নর্মদাতটে রাজা পুরুকুৎসকে বলেছিলেন। পুরুকুৎস বলেছিলেন সারস্বতকে, আর আমি শুনেছি সারস্বতের নিকটে।

প্রলয় কালে দিবা রাত্রি আকাশ ভূমি আলো অন্ধকার বা অন্য কিছুই ছিল না। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অজেয় একমাত্র প্রকৃতি পুরুষ ও ব্রহ্ম বর্তমান ছিলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ বিষ্ণুর স্বরূপ থেকে পৃথক। কাল নামে বিষ্ণুর অপর এক রূপের দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টিকালে পরস্পর সংযুক্ত ও প্রলয়কালে বিযুক্ত হন। তখন এই জগৎকে একটি সমুদ্রে পরিণত করে পরমেশ্বর নাগপর্যঙ্কশয়নে শয়ন করেন। তারপর জাগ্রত হয়ে ব্রহ্ম রূপে পুনরায় সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য তাঁরই তিন নাম—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব। তিনি স্রষ্টা হয়ে আপনাকে সৃজন করেন, পালক ও পাল্য হয়ে আপনাকে পালন

করেন, তারপর সংহর্তা ও সংহার্য হয়ে নিজেই সংহৃত হন। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই পালক ও সংহারক।

মৈত্রেয় প্রশ্ন করলেন, ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই ধারণা আমরা কেন স্বীকার করব ?

পরাশর বললেন, ব্রহ্মের এই শক্তি অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ। এই জ্ঞানে তর্ক চলে না বলে একে অচিন্ত্যজ্ঞান বলে। ভগবান সৃষ্টিকার্যের জন্য লোকপিতামহ ব্রহ্মা রূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর আয়ু শত বৎসর। পৃথিবীর ছয় মাসে এক অয়ন, দুই অয়নে দেবতাদের এক দিন। পৃথিবীর উত্তরায়ণে দেবতাদের দিবা এবং দক্ষিণায়নে তাঁদের রাত্রি। দেবতাদের বারো হাজার বছরে পৃথিবীর সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি যুগ। এই রকম চার হাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিন। এই হিসাবেই ব্রহ্মার আয়ু শত বৎসর। এর পরে তিনি শেষ শয্যায় শয়ন করে নিজের হিসাবে এক রাত্রি যাপন করেন। তারপরে একই নিয়মে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করেন।

নার বা জলে অয়ন বা আশ্রয় করে থাকেন বলে ভগবানের নাম নারায়ণ। তিনি বরাহ রূপে পাতাল থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেন। দেহের বিস্তৃতির জন্য পৃথিবী জলে নিমগ্ন না হয়ে সমুদ্রের উপর নৌকার ন্যায় ভাসতে লাগলেন। তারপর নারায়ণ পৃথিবীকে সমান করে তার উপরে পর্বত স্থাপন করে সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত করলেন।

মৈত্রেয় বললেন, এইবারে আপনি দেবাদি সৃষ্টির কথা বলুন।

পরাশর বললেন, ব্রহ্মার জঘন থেকে অসুরদের উৎপত্তি হল। তিনি সেই তমোমাত্রাত্মিকা তনু ত্যাগ করলে তা রাত্রি হল। দেবতাদের জন্ম ব্রহ্মার মুখ থেকে। তিনি সেই সত্ত্বমাত্রাত্মিকা তনু ত্যাগ করলে দিন হল। এই জন্যই অসুররা রাত্রে ও দেবতারা দিনের বেলায় বলশালী হন। পিতৃগণ ব্রহ্মার পার্শ্বদেশ থেকে জন্ম নিলেন। সেই সত্ত্বপ্রায় তনু ত্যাগ করলে সন্ধ্যা হয়। এর পরে ব্রহ্মা রজোমাত্রাত্মিকা তনু গ্রহণ করে মানুষ সৃষ্টি করলেন। সেই তনু

ত্যাগ করলে তা জ্যোৎস্না বা প্রত্যুষ হয়ে গেল। এই জন্য পিতৃগণ সন্ধ্যায় ও মানুষ প্রত্যুষে বলশালী হয়। দিন রাত্রি সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্না ব্রহ্মারই ত্রিগুণাশ্রিত দেহ।

তারপর রজোমাত্রাপ্রধান অন্য দেহ ধারণ করতেই ব্রহ্মার ক্ষুধা ও কোপ জন্মাল। এই সময়ে যাদের উৎপত্তি হল, তারা ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করতে চাইল। যারা তাঁকে 'রক্ষা কর' বলল, তারা হল রাক্ষস; আর যারা 'ভক্ষণ করব' বলল, তারা হল যক্ষ। এই ভাবেই গন্ধর্ব, অপ্সর, পিশাচ, কিন্নর, পশু, পক্ষী, মৃগ ও উরগ সৃষ্টি হল।

ব্রহ্মার মুখ, বক্ষ, উরু ও পদদ্বয় থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। যজ্ঞ নিষ্পত্তির জন্য ব্রহ্মা এই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। যজ্ঞে আপ্যায়িত হয়ে দেবতারা বারিবর্ষণ করেন। কল্যাণের জন্যই যজ্ঞ। যজ্ঞ থেকেই মানুষ স্বর্গ ও মুক্তি লাভ করে। মন শুদ্ধ হলে শুদ্ধ জ্ঞান জন্মে ও বিষ্ণুপদ দর্শন হয়। অধর্ম বীজ থেকে তমোগুণ ও লোভ থেকে পাপ উৎপন্ন হয়। রাগ বা বিষয়াসক্তি এই পাপের মূল এবং এর ফলেই জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এর পর মানুষ বৃক্ষবেষ্টিত স্থানে, পর্বতে বা জলাশয়ের নিকটে, কিংবা কৃত্রিম দুর্গ, পুর বা গ্রাম স্থাপন করে শীতাতপ নিবারণের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করল। তারপর কৃষির উপায় ও হস্তশিল্পের জীবিকার সৃষ্টি করল।

ক্রিয়াবান ব্রাহ্মণদের জন্য প্রাজাপত্যলোক নির্দিষ্ট হল, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ক্ষত্রিয়দের জন্য ঐন্দ্রলোক, স্বধর্মানুবর্তী বৈশ্যদের জন্য দেবলোক এবং পরিচর্যানুবর্তী শূদ্রজাতির জন্য গন্ধর্বলোক স্মৃত হল। ঊর্ধ্বরেতা মুনিদের জন্য যে মরুৎস্থান বা জনলোক, গুরুবাসী ব্রহ্মচারীদের জন্য সেই স্থানই নিরূপিত হল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের তপোলোক হল বানপ্রস্থাবলম্বীদের স্থান। গৃহস্থদের জন্য প্রাজাপত্যলোক, ন্যাসীদের জন্য ব্রহ্মলোক এবং একান্ত ও সদা ব্রহ্মধ্যায়ী যোগীদের

জন্য বিষ্ণুর পরমপদ অমৃতলোক। চন্দ্র-সূর্য সেখানে যাতায়াত করে, কিন্তু যাঁরা 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তাঁদের পুনরাবৃত্তি নেই। কিন্তু যাঁরা স্বধর্ম ত্যাগ করে বেদের নিন্দা ও যজ্ঞের ব্যাঘাত করেন, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আছে তামিস্র, অন্ধ তামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, অসি-পত্রবন, ঘোর, কালসূত্র ও অবীচিমৎ নামের নরক।

ব্রহ্মা ধ্যানে যে মানস প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন, তার বংশ বৃদ্ধি না হওয়াতে তিনি ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্ঠ নামে নয় জন মানসপুত্রের সৃষ্টি করলেন। এর আগে তিনি যে সনন্দনাদি ঋষি সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের লোকসৃষ্টিতে নিরাসক্ত দেখে তাঁর ক্রোধ জন্মাল। তাঁর ক্রোধ-দীপ্ত ভ্রূকুটি-কুটিল ললাট থেকে মধ্যাহ্ন সূর্যের সমান প্রভার অর্ধনারী-নর-বপু প্রচণ্ড রুদ্র উৎপন্ন হলেন। ব্রহ্মা তাঁকে 'আত্মাকে বিভাগ কর' বলে অন্তর্ধান হলেন। ব্রহ্মার আদেশে রুদ্র প্রথমে স্ত্রী পুরুষ রূপে দ্বিধা বিভক্ত হলেন, পরে সৌম্যাসৌম্য ও শান্তাশান্ত রূপে পুরুষকে একাদশ ভাগে ও স্ত্রীকে সিত ও অসিত স্বরূপে বহুধা বিভক্ত করলেন। তারপর ব্রহ্মা প্রজাপালনের জন্য নিজে আত্মসম্ভূত মনু হয়ে তপস্যায় নিষ্পাপ সেই শতরূপা নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। তাঁদের প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকূতি নামে দুই কন্যা হল। দক্ষ প্রসূতিকে ও রুচি আকুতিকে গ্রহণ করেন। আকুতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে দাম্পত্য মিথুনের জন্ম হয়। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের যে দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়, তারা যাম নামে খ্যাত দেবতা।

দক্ষের চব্বিশটি কন্যা জন্মে। প্রভু ধর্ম প্রথম ত্রয়োদশটি কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এই কন্যারাও এক একটি পুত্রের জন্ম দেন। শ্রদ্ধার পুত্রের নাম কাম, নন্দাকে বিবাহ করে তাঁর হর্ষ নামে এক পুত্র হয়। লক্ষ্মীর পুত্র দর্প, ধৃতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র

সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র লোভ, মেধার পুত্র শ্রুত, ক্রিয়ার পুত্র দণ্ড, বুদ্ধির পুত্র বোধ, লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবসায়, শান্তির পুত্র ক্ষেম, সিদ্ধির পুত্র সুখ, কীর্তির পুত্র যশ।

অধর্মের পত্নীর নাম হিংসা। তাঁদের অমৃত ও নিকৃতি নামে পুত্র কন্যা জন্মে। এঁদের মিলনে ভয় ও নরক ও তাঁদের পত্নী মায়া ও বেদনার জন্ম হয়। মায়া মৃত্যুকে ও বেদনা দুঃখকে প্রসব করে। মৃত্যু থেকে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধের জন্ম। এঁদের কোন পত্নী বা পুত্র নেই।

দক্ষের বাকি একাদশ কন্যাকে ঋষিরা গ্রহণ করেন—ভৃগু খ্যাতিকে, ভব সতীকে, মরীচি সম্ভূতিকে, অঙ্গিরা স্মৃতিকে, পুলস্ত্য প্রীতিকে, পুলহ ক্ষমাকে, ক্রতু সন্নীতিকে, অত্রি অনসূয়াকে, বসিষ্ঠ ঊর্জাকে, বহ্নি স্বাহাকে এবং পিতৃগণ স্বধাকে গ্রহণ করেন।

মৈত্রেয় বললেন, এই যে নিত্যস্থিতি, নিত্যসর্গ ও নিত্য বিনাশের কথা বললেন, এবারে তার স্বরূপ আমাকে বলুন।

পরাশর বললেন, ভগবান মন্বাদি রূপ ধারণ করে অব্যাহত ভাবে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ করে থাকেন। সর্বভূতের প্রলয় চতুর্বিধ। তাদের নাম নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক ও নিত্য। যে ব্রহ্ম প্রলয়ে জগৎপতি শয়ন করেন, তার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে লয় হয়। যোগীদের জ্ঞানে পরমাত্মায় লয়ের নাম আত্যন্তিক প্রলয় এবং জাতদের দিবানিশি বিনাশকে নিত্য প্রলয় বলে। বিষ্ণুর এই সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের শক্তি সর্বদেহীর মধ্যে সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে।

সমুদ্র মন্থন

পরাশর বললেন, কল্পের আদিতে নিজের মতো পুত্রের চিন্তার সময় প্রভুর অঙ্গে কুমার নীললোহিতের প্রাদুর্ভাব হল। তিনি রোদন ও দ্রবণ অর্থাৎ অনুতাপ করতে করতে জন্মেছেন দেখে ব্রহ্মা

বললেন, কেন রোদন করছ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার নাম দাও। ব্রহ্মা বললেন, হে দেব, তোমার নাম হল রুদ্র। তুমি রোদন কোরো না, ধৈর্য ধর। এই রুদ্র সতীকে পত্নীরূপে পেয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষের কোপে তিনি দেহত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মেছিলেন। রুদ্র পুনর্বার এই অনন্যা উমাকে বিবাহ করেন।

ভৃগুর পত্নী খ্যাতি ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ও লক্ষ্মী নামে এক কন্যাকে প্রসব করেন। এই লক্ষ্মী নারায়ণের পত্নী।

মৈত্রেয় বললেন, শোনা যায়, অমৃত মন্থনের সময় ক্ষীর সমুদ্র থেকে লক্ষ্মী উৎপন্ন হয়েছিলেন। আপনি কেন তাঁকে ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা বলছেন?

পরাশর বললেন, বিষ্ণুর মতো লক্ষ্মীও নিত্য ও সর্বগত। বিষ্ণু অর্থ, লক্ষ্মী বাণী; বিষ্ণু বোধ, লক্ষ্মী বুদ্ধি; বিষ্ণু ধর্ম, লক্ষ্মী সৎক্রিয়া; বিষ্ণু স্রষ্টা, লক্ষ্মী সৃষ্টি; বিষ্ণু সন্তোষ, লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি; বিষ্ণু যজ্ঞ, লক্ষ্মী দক্ষিণা। লক্ষ্মীর সম্বন্ধে আমি মরীচির নিকট যা শুনেছি এইবারে তা বলছি।

একদা শঙ্করাংশ দুর্বাসা পৃথিবী ভ্রমণের সময় এক বিদ্যাধরীর হাতে একটি সন্তানক ফুলের সুগন্ধী মালা দেখতে পেলেন এবং মালাটি অতি শোভন দেখে তিনি সেটি চাইলেন। তন্বঙ্গী বিশালাক্ষী বিদ্যাধরী প্রণিপাত করে সেই মালাটি তাঁর হাতে দিল। বিপ্র সেটি মাথায় নিয়ে মেদিনী ভ্রমণ করতে লাগলেন। এমন সময়ে তিনি দেবতাদের সঙ্গে ত্রিলোকের অধিপতি ইন্দ্রকে দেখলেন ঐরাবতের উপরে। তিনি সেই মালাটি নিজের মাথা থেকে নিয়ে তাঁকে দিলেন নিক্ষেপ করে। ইন্দ্র ঐরাবতের মাথায় রাখলেন সেই মালা আর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঐরাবত তার শুঁড় দিয়ে আঘ্রাণ করে মালাটি মাটিতে ফেলে দিল। মালার দুর্দশা দেখে ক্রোধাবিষ্ট দুর্বাসা দেবরাজকে বললেন, ঐশ্বর্যমত্ত দুরাত্মা বাসব, আমার দেওয়া মালা

তুমি গর্বে মাথায় ধারণ না করে এই অবমাননা করলে! তোমার ত্রৈলোক্য-শ্রী বিনষ্ট হবে।

ইন্দ্র তখনই হাতির উপর থেকে নেমে দুর্বাসাকে প্রণাম করে অনুনয় করতে লাগলেন। দুর্বাসা বললেন, অন্যান্য ঋষির স্তবে তুমি গর্বিত হয়েছ। কিন্তু আমি দুর্বাসা, তাদের মতো কৃপালু-হৃদয় নই। আমি ক্ষমা করি না। বলে তিনি চলে গেলেন। আর দেবরাজও ঐরাবতে আরোহণ করে অমরাবতী ফিরে গেলেন।

তার পরেই ত্রিভুবন শ্রীহীন ও পরিত্যক্ত হল, ক্ষীণ হল ওষধি ও লতা। যজ্ঞ বন্ধ হল, তাপসেরা তপস্যা করেন না, দানধর্মে মনোযোগ রইল না মানুষের, আর লোভ বৃদ্ধি পেল। তারপর দৈত্যরা এল দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে দৈত্যদের নিকট পরাজিত হয়ে দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে এলেন অগ্নিকে পুরোবর্তী করে। দেবতাদের বিবরণ শুনে ব্রহ্মা বললেন, বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে তিনি তোমাদের শ্রেয়ো বিধান করবেন। এই বলে তিনি দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে গিয়ে বিষ্ণুর স্তব করে বললেন, হে বিষ্ণু, প্রসন্ন হও। আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও। ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারাও প্রণাম করে বললেন, প্রসন্ন হও, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও। তারপরে বৃহস্পতি প্রমুখ দেবর্ষিরাও বললেন, তুমি প্রসন্ন হয়ে প্রণতদের দর্শন দাও।

দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট শঙ্খচক্রধর বিষ্ণু তাঁদের দেখা দিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে বললেন, আমি তোমাদের তেজের পুষ্টি-সাধন করব। এইবারে আমি যা বলি, তাই কর। তোমরা দৈত্যদের সঙ্গে ক্ষীর সমুদ্রে সমস্ত ওষধি ফেলে মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে অমৃত মন্থন কর। দৈত্যদের সাহায্যের জন্য মিষ্ট ভাবে তাদের বল যে তারা সমান ফলভাগী হবে এবং সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠবে তা পানে তোমরা ও আমরা বলবান হব। তারপরে আমি ব্যবস্থা করব যে দেবদ্বেষীরা অমৃত না পেয়ে শুধু ক্লেশভাগী হবে।

বিষ্ণুর এই কথা শুনে দেবতারা অসুরদের সঙ্গে সন্ধি করে অমৃতের জন্য যত্নবান হলেন। দেবতা ও অসুরেরা নানা ওষধি এনে শরতের মেঘের মতো নির্মল ক্ষীর সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে অমৃত মন্থন আরম্ভ করলেন, মন্দরকে করলেন মন্থনদণ্ড ও রজ্জু হলেন বাসুকি। তাঁর পুচ্ছের দিকে দেবতাদের এবং মুখের দিকে অসুরদের নিযুক্ত করলেন বিষ্ণু। সেই ফণীর নিঃশ্বাস বহ্নিতে অসুররা নষ্টকান্তি ও নিস্তেজ হয়ে পড়লেন, এবং তার নিঃশ্বাস-বায়ু থেকে উৎক্ষিপ্ত মেঘ পুচ্ছের দিকে বর্ষণ করার জন্য দেবতারা আপ্যায়িত হলেন। বিষ্ণু নিজে কূর্ম রূপ ধারণ করে ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান মন্থনাদ্রির অধিষ্ঠান হলেন। এক রূপে দেবতাদের মধ্যে এবং অন্য রূপে দৈত্যদের মধ্যে থেকেও সর্পরাজকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। আবার অন্য এক বৃহৎ রূপে তিনি শৈলের উপরিভাগ আক্রমণ করে রইলেন। নিজের তেজে নাগরাজকে আপ্যায়িত ও দেবতাদের পুষ্ট করতে লাগলেন।

তারপরে ক্ষীর সমুদ্র থেকে প্রথমে সুর-পূজিতা সুরভি উৎপন্ন হলেন। তাই দেখে দেবাসুর সুরভি লাভের জন্য আনন্দে ব্যাক্ষিপ্ত-চেতা হলেন। স্বর্গে সিদ্ধরা যখন চিন্তা করছিলেন 'এ কী', তখনই জন্ম নিলেন মদোঘূর্ণিত-লোচন বারুণী দেবী। তারপর মন্থনে আলোড়িত ক্ষীর সমুদ্র থেকে সুগন্ধে জগৎ আমোদিত করে উত্থিত হল দেবস্ত্রীনন্দন তরু পারিজাত এবং রূপৌদার্যগুণযুক্ত পরমাশ্চর্য অপ্সরাগণ। শীতাংশু উত্থিত হলে মহাদেব তাঁকে গ্রহণ করলেন, আর নাগরা গ্রহণ করল বিষ। তারপর শ্বেতাম্বরধর দেব ধন্বন্তরি অমৃত কমণ্ডলু নিয়ে সমুত্থিত হলেন। দৈত্য ও দানবরা তাতে সুস্থ-মন ও মুনিদের সঙ্গে আনন্দিত হলেন। এইবারে উত্থিত হলেন বিকশিত কমলে স্থিতা ধৃতপঙ্কজা কান্তিমতী শ্রী দেবী।

মহর্ষিরা আনন্দিত হয়ে শ্রীসূক্তে তাঁর স্তব করলেন। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বরা তাঁর সামনে গান ও ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরারা নৃত্য

আরম্ভ করল। গঙ্গাদি সরিৎ তাঁর স্নানার্থ উপস্থিত হল এবং দিগ্‌গজরা হেমপাত্রস্থ বিমল জলে দেবীকে স্নান করাল। ক্ষীরোদ রূপ ধারণ করে তাঁকে অম্লান পঙ্কজের মালা দিলেন এবং বিশ্বকর্মা তাঁর অঙ্গে দিলেন ভূষণ। লক্ষ্মী স্নানের পর বসনভূষণভূষিতা হয়ে দিব্যমালা ধারণ করে সব দেবতার সামনে হরির বক্ষস্থল আশ্রয় করলেন।

লক্ষ্মী পরিত্যাগ করলেন দেখে বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দৈত্যদের পরম উদ্বেগ হল। তারপর তারা ধন্বন্তরির হাতের অমৃত-কমণ্ডলু গ্রহণ করল এবং বিষ্ণু স্ত্রীরূপ ধারণ করে মায়ায় প্রলোভিত করে অমৃতের সেই ভাণ্ড তাদের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে দেবতাদের প্রদান করলেন। ইন্দ্রাদি দেবতারা সেই অমৃত পান করবার পরে অস্ত্র উদ্যত করে দৈত্যদের আক্রমণ করলেন। অমৃত পানে বলশালী দেবতাদের আক্রমণে দৈত্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন ও পাতালে প্রবেশ করল। প্রসন্ন দেবতারা শঙ্খচক্রগদাধরকে প্রণাম করে পূর্বের মতো স্বর্গ রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। সূর্য প্রসন্ন হয়ে নিজ পথে এবং নক্ষত্ররাও নিজ নিজ পথে গমন শুরু করলেন। বিভাবসু চারু দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন এবং ধর্মে সকলের মতি ফিরে এল। ত্রৈলোক্য শ্রীযুক্ত হল এবং পুনরায় শ্রীমান হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। ত্রিদিব ফিরে পেয়ে তিনি লক্ষ্মীর স্তব করে বললেন, আমাকে আর কখনও তুমি পরিত্যাগ কোরো না।

স্তবে তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মী সমস্ত দেবতাদের সামনে ইন্দ্রকে বললেন, হে দেবেশ, তোমার স্তবে তুষ্ট হয়ে আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি, তুমি বর নাও।

ইন্দ্র বললেন, যদি আমি বরের যোগ্য হই তো তুমি আর কখনও ত্রৈলোক্য ত্যাগ করবে না; আর যে ব্যক্তি আমার এই স্তোত্রে তোমার স্তব করবে, তাকেও তুমি পরিত্যাগ করবে না।

লক্ষ্মী বললেন, তথাস্তু।

তারপর পরাশর মৈত্রেয়কে বললেন, ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা শ্রী দেব-দানবের যত্নে অমৃত মন্থনে পুনরায় প্রসূত হন। বিষ্ণু যেমন অবতার হন, লক্ষ্মীও তেমন তাঁর সহায়িনী হন। বিষ্ণু যখন বামন হয়েছিলেন, লক্ষ্মী তখন পদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। যখন তিনি পরশুরাম হয়েছিলেন, তখন ইনি ধরণী হয়েছিলেন। রাম জন্মে সীতা, কৃষ্ণ জন্মে রুক্মিণী এবং অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী হয়েছিলেন। দেবত্বে ইনি দেবদেহ এবং মনুষ্যত্বে ইনি মনুষ্যদেহ, অর্থাৎ ইনি বিষ্ণুর দেহানুরূপ নিজ দেহ পরিগ্রহ করে থাকেন। পৃথিবীতে যাঁরা এই লক্ষ্মীস্তব অনুদিন পাঠ করেন, তাঁদের কদাচ অলক্ষ্মী থাকে না।

মৈত্রেয় বললেন, এইবারে আপনি দক্ষ-কন্যাদের বিষয়ে বলুন।

পরাশর বললেন, ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে যেমন লক্ষ্মীর জন্ম, তেমনি ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্রও জন্ম গ্রহণ করে। তারা বিবাহ করে মেরুর দুই কন্যা আয়তি ও নিয়তিকে। তাদের পুত্র প্রাণ ও মৃকণ্ডু। প্রাণের দুই পুত্র বেদশিরা ও রাজবান। এবং মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয়। এর পরে ভার্গব বংশ বিস্তৃত হয়ে ওঠে।

মরীচির পত্নী সম্ভূতি পৌর্ণমাসকে প্রসব করেন। পৌর্ণমাসের বিরজা ও সর্বগ নামে দুই পুত্র। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি অনেক কন্যার জন্ম দেন। তাদের নাম সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি। অত্রির পত্নী অনসূয়ার তিন পুত্র সোম, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয়। পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতির পুত্র দত্তোলি, পূর্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইনিই অগস্ত্য নামে স্মৃত। পুলহের পত্নী ক্ষমার তিন পুত্র কর্দম, অবরীয়াণ ও সহিষ্ণু। ক্রতুর পত্নী সন্নীতি বালখিল্যদের মাতা, সেই অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্র মুনিদের সংখ্যা ষাট হাজার। ঊর্জার গর্ভে বাসষ্ঠের সাত পুত্র জন্মে। তাদের নাম রজ, গাত্র, ঊর্ধ্ববাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র। তৃতীয় মন্বন্তরে তারা সপ্তর্ষি। ব্রহ্মার প্রথম পুত্র অগ্নির ঔরসে স্বাহার তিন পুত্র জন্মে, তাদের নাম পাবক, পবমান ও জলাশী শুচি। তাদের পঁয়তাল্লিশটি সন্ততি নিয়ে উনপঞ্চাশ বহ্নি হয়েছে। পিতৃগণের নিকট

স্বধা মেনা ও বৈধারিণী নামে দুই কন্যা লাভ করেন। তাঁরা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী। দক্ষ-কন্যাদের এই অপত্য-সন্ততির কথা শুনলে নিঃসন্তান হতে হয় না।

ধ্রুবের উপাখ্যান

পরাশর বললেন, স্বয়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্রেব কথা তোমাকে বলছি। এদের মধ্যে উত্তানপাদের অভীষ্ট রাণী সুরুচির গর্ভে পিতার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র উত্তমের জন্ম হয়। সুনীতি নামের অন্য রাণীর প্রতি তিনি প্রীতিমান ছিলেন না। সুনীতির পুত্রের নাম ধ্রুব। একদিন রাজাসনে পিতার কোলে তার ভাই উত্তমকে দেখতে পেয়ে ধ্রুবেরও তাঁর কোলে উঠতে ইচ্ছা হল। কিন্তু সুরুচির সামনে রাজা তাঁর কোলে উঠবার জন্য ধ্রুবের এই আগ্রহকে অভিনন্দন করলেন না। সুরুচি সপত্নীতনয়কে রূঢ় ভাবে বললেন, তোমার জন্ম তো আমার পেটে নয়, তবে বৃথা তোমার এই উচ্চাভিলাষ! এই রাজাসন আমার পুত্রেরই যোগ্য।

সৎ মায়ের এই কথা শুনে বালক কুপিত হয়ে পিতাকে পরিত্যাগ করে নিজের মায়ের কাছে গেল। পুত্রকে কোলে নিয়ে মা বললেন, তুমি কুপিত কেন বৎস? কে তোমার অনাদর করেছে?

রাজার সামনে সুরুচি যা বলেছিলেন, ধ্রুব তার মাকে তাই বলল। পুত্রের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে দুঃখিত হয়ে সুনীতি বললেন, সুরুচি ঠিকই বলেছেন। তুমি স্বল্পভাগ্য। পূর্ব জন্মে যা করেছ, এ জন্মে তারই ফল পাবে। যা সঞ্চয় কর নি, তা কে তোমাকে দিতে পারে! সুরুচির কথায় যদি তোমার অত্যন্ত দুঃখ হয়ে থাকে তো পুণ্যের অর্জনে যত্ন কর।

ধ্রুব বলল, মা, পিতার রাজাসন আমার ভাই পাক, আমি অন্যের স্থান চাই না। নিজের কর্ম দিয়ে আমি সেই স্থান পেতে চাই যা আমার পিতাও পান নি। বলে ধ্রুব গৃহ থেকে নির্গত হয়ে পুরের

বাহিরে এক উপবনে উপস্থিত হল। সেখানে কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় পরিহিত সাতজন মুনিকে কুশাসনে উপবিষ্ট দেখতে পেল। বিনয়ে অবনত রাজপুত্র তাঁদের প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, নির্বেদের জন্য আমি আপনাদের নিকটে এসেছি।

ঋষিরা বললেন, তুমি চার-পাঁচ বছর বয়সের বালক। তোমার দুঃখ কী? তোমার পিতা রাজা এবং তিনি জীবিত। তোমার কোন ইষ্ট বিয়োগ হয় নি, তোমার শরীরেও কোন পীড়া দেখছি না। তবু তোমার নির্বেদের কারণ যদি থাকে তো বল।

এই প্রশ্নের উত্তরে ধ্রুব সুরুচির কথা বলল। তাই শুনে মুনিরা পরস্পর বললেন, ক্ষত্রিয় তেজ কী রকম দেখ, এই বালকের হৃদয় থেকে বিমাতার কথার তাপ দূর হচ্ছে না। তারপরে ধ্রুবকে বললেন, তুমি কিছু বলতে চাও মনে হচ্ছে। আমাদের কাছে কী সাহায্য চাও বল।

ধ্রুব বলল, অর্থ বা রাজ্য আমি চাই না। আমি এমন একটি স্থান চাই যা এর আগে আর কেউ ভোগ করে নি।

মরীচি বললেন, বিষ্ণুর আরাধনা না করলে শ্রেষ্ঠ স্থান পাওয়া যায় না। অত্রি বললেন, বিষ্ণু তুষ্ট হলেই অক্ষয় স্থান পাওয়া যায়। অঙ্গিরা বললেন, শ্রেষ্ঠ স্থান পেতে হলে বিষ্ণুর আরাধনা কর। পুলস্ত্য বললেন, হরির আরাধনা করে লোকে অতি দুর্লভ মুক্তিও পায়। ক্রতু বললেন, বিষ্ণু তুষ্ট হলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। পুলহ বললেন, ইন্দ্র যাঁকে আরাধনা করে ইন্দ্রত্ব লাভ করেছেন, সেই বিষ্ণুর আরাধনা কর। বশিষ্ঠ বললেন, বিষ্ণুর আরাধনায় ত্রৈলোক্যের যে কোন উত্তম স্থান পাওয়া যায়।

ধ্রুব বলল, বিষ্ণুর পরিতোষের জন্য আমাকে কী জপ করতে হবে বলুন, আর যে ভাবে আরাধনা করতে হবে তাও বলুন।

ঋষিরা বললেন, প্রথমে চিত্তকে বাহিরের বিষয় ত্যাগ করাবে,

তারপর বিষ্ণুর প্রতি নিশ্চল করবে। এইরূপে সংযত ও তন্ময় হয়ে একাগ্র চিত্তে জপ করবে :

হিরণ্যগর্ভপুরুষ প্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞান স্বভাবিনে॥

ঋষিরা আরও বললেন, তোমার পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু পুরাকালে এই মন্ত্র জপ করে বিষ্ণুকে তুষ্ট করে যথাভিলষিত ঋদ্ধি লাভ করেছিলেন। তুমিও সদা এই মন্ত্র জপ করে বিষ্ণুকে তুষ্ট কর।

ধ্রুব এই উপদেশ পেয়ে ঋষিদের প্রণাম করে সেই বন থেকে নির্গত হয়ে মধু নামের যমুনাতটে এসে উপস্থিত হল। মধু নামের দৈত্যদ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল বলে মহীতলে এই স্থান মধুবন নামে খ্যাত। শত্রুঘ্ন মধুর পুত্র লবণ রাক্ষসকে বধ করে সেখানে মথুরা নামের পুরী নির্মাণ করেন। ধ্রুব এই সর্বপাপহর তীর্থে তপস্যা করে। ঋষিরা যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেইভাবেই সে বিষ্ণুকে আপনাতে স্থিত বিবেচনা করে। অনন্যচেতা হয়ে ধ্যান করতে হরি তার বিশ্বরূপ গত হলেন।

ধ্রুবের তপস্যায় অলোড়িত হয়ে দেবতারা ইন্দ্রের সঙ্গে মন্ত্রণা করে তার ধ্যান ভঙ্গের উপক্রম করতে লাগলেন। এক সময়ে মায়াময়ী মাতা সুনীতি যেন সামনে এসে সাশ্রু নয়নে বললেন, এখন তোমার খেলা করবার বয়স, তারপরে তুমি অধ্যয়ন করবে। তোমার তপস্যার সময় আসবে সমস্ত ভোগের পরে। এখন যদি তুমি তপস্যা ত্যাগ না কর তো তোমার সামনেই আমি প্রাণত্যাগ করব।

কিন্তু বিষ্ণুতে সমাহিত-মন ধ্রুব বাষ্পাবিল নয়নে মায়ের বিলাপ দেখেও দেখতে পেল না। সুনীতি বললেন, এই ভীষণ বনে রাক্ষসরা অস্ত্র উদ্যত করে এই দিকেই আসছে, তুমি পালাও। বলে তিনি চলে গেলেন। তারপরেই এল সেই রাক্ষসরা। কেউ বলল, একে বধ কর, ছেদন কর; কেউ বলল, খেয়ে ফেল একে। নানাভাবে

তারা ভয় দেখাল, কিন্তু তাদের কথা বা শৃগালের চিৎকার কিছুই ধ্রুবের ইন্দ্রিয়গোচর হল না। দেবতারা পরাভূত হচ্ছেন আশঙ্কা করে তাঁরা হরির শরণ নিলেন। হরি বললেন, ধ্রুব ইন্দ্রত্ব, সূর্যত্ব, বরুণত্ব বা কুবেরত্ব চায় না; তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্থানে যাও। আমি এই তপস্যারত বালককে নিবর্তিত করে তার প্রার্থনা পূরণ করব।

বিষ্ণুর এই কথা শুনে ইন্দ্রাদি দেবতারা তাঁকে প্রণাম করে ফিরে গেলেন। আর চতুর্ভুজ দেহধারী বিষ্ণু ধ্রুবের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তোমাকে বর দিতে এসেছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। বালক চোখ মেলে তার ধ্যানদৃষ্ট হরিকে দেখতে পেল। সহসা ভীত ও রোমাঞ্চিত হয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বলল, আমি তোমার স্তব করতে চাই, প্রভু তার জন্যে আমাকে প্রজ্ঞা দান কর। শঙ্খপ্রান্তে বিষ্ণু তাকে স্পর্শ করতেই ধ্রুব প্রসন্ন হয়ে তাঁর স্তব করে বলল, আমার তপস্যা সফল হয়েছে, আমি তোমার দর্শন পেয়েছি। বিষ্ণু বললেন, এইবারে বর নাও।

উত্তরে ধ্রুব বলল, তুমি তো সকলের হৃদয়ে আছ, আমার মনের বাসনা তোমার অজ্ঞাত নয়। আমার সৎ মা আমাকে বলেছেন যে তাঁর পেটে আমার জন্ম হয়নি বলে রাজাসন আমার জন্য নয়। এই জন্য আমি তোমার প্রসাদে জগতের সবচেয়ে উত্তম অব্যয় স্থান পেতে চাই।

বিষ্ণু বললেন, তোমার প্রার্থিত স্থান তুমি নিশ্চয়ই পাবে। পূর্বজন্মে তুমি নিজ ধর্মানুপালক ব্রাহ্মণ ছিলে। যৌবনে এক রাজপুত্রের মিত্র হয়ে তুমিও রাজপুত্র হতে চেয়েছিলে। তাই তুমি উত্তানপাদের গৃহে রাজপুত্র হয়ে জন্মেছ। এইবারে তুমি আমার প্রসাদে ত্রৈলোক্যের চেয়েও উত্তম স্থান সমস্ত তারা-গ্রহের আশ্রয় হবে। সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি সমস্ত নক্ষত্র সপ্তর্ষি ও বিমানচারী দেবতাদের উপরিভাগে তোমাকে

ধ্রুব স্থান দিলাম। কোন দেবতা চতুর্যুগ, কেউ বা মন্বন্তর থাকেন আমি তোমাকে কল্প স্থিতি দিলাম। তোমার মা সুনীতিও বিমানে তারকা হয়ে তাবৎকাল তোমার নিকটে বাস করবেন। যে মানুষেরা সুসমাহিত হয়ে সকাল সন্ধ্যায় তোমার নাম কীর্তন করবে, তাদের মহা পুণ্য হবে।

বিষ্ণুর নিকট এই শ্রেষ্ঠ স্থান বর পেয়ে ধ্রুব এখন সেখানেই বাস করছেন। তাঁর মান বৃদ্ধি ও মহিমা দেখে দৈত্য-গুরু শুক্র বলেছিলেন, আহা, তপস্যার কী বল! আর তপস্যার কী ফল!

বেণরাজা ও পৃথুরাজার উপাখ্যান

পরাশর বললেন, ধ্রুবের বংশে চতুর্থ পুরুষে মনুর জন্ম। ইনি ষষ্ঠ মন্বন্তর পতি। মনুর পৌত্র অঙ্গের একমাত্র পুত্রের নাম বেণ। প্রজার জন্য ঋষিরা বেণের দক্ষিণ কর মন্থন করেন। তাতেই পৃথুর জন্ম। প্রজার হিতের জন্য পৃথু পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।

মৈত্রেয় প্রশ্ন করলেন, ঋষিরা কী জন্য বেণ রাজার হাত মন্থন করেছিলেন, আর কী ভাবে পৃথুর জন্ম হয়েছিল।

পরাশর বললেন, মৃত্যুর সুনীথা নামে যে কন্যা প্রথমে জন্মে, তাঁকেই অঙ্গের পত্নীরূপে দেওয়া হয়। বেণ তাঁদেরই পুত্র। মাতামহ দোষে বেণ স্বভাবত দুষ্ট হয়েছিলেন। ঋষিরা তাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবার পরেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে পৃথিবীতে কেউ যজ্ঞ করতে পারবে না, হোম করতে পারবে না এবং দান করা চলবে না। নিজেকেই তিনি যজ্ঞপতি প্রভু বলে প্রচার করলেন।

ঋষিরা এসে রাজাকে সসম্মানে বললেন, আমরা হরিকে দীর্ঘ সূত্রে পূজা করব, তাতে তোমার অংশ থাকবে। যাঁর রাজ্যে হরি যজ্ঞে সম্পূজিত হন, সেই রাজাকে তিনি সর্বেপ্সিত দান করেন। বেণ বললেন, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আরাধ্য আছে! হরি কে যে তাকে তোমরা যজ্ঞেশ্বর বলছ? সমস্ত দেবতাই রাজার

শরীরস্থ, তার কারণ রাজা হলেন সর্বদেবময়। স্বামীর সেবা যেমন স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম, তেমনি আমার আজ্ঞা পালন করাই তোমাদের ধর্ম। ঋষিরা বললেন, মহারাজ, ধর্মক্ষয় না হয়, এই আজ্ঞা কর। এই অখিল জগৎ তো হরির পরিণাম।

কিন্তু বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও রাজা যখন ঋষিদের অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন তাঁরা কুপিত হয়ে বললেন, হত্যা কর, এই পাপকে হত্যা কর। যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর যে নিন্দা করে, সে রাজা হবার যোগ্য নয়। এই বলে মন্ত্রপূত কুশ দিয়ে তাঁরা রাজাকে হত্যা করলেন। তারপর চারি দিকে রেণু দেখতে পেয়ে তাঁরা লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, এ কী? তারা দুঃখ করে বলল, অরাজক রাজ্যে চোর পরস্বাপহরণ শুরু করেছে। আপনারা চোরের পদরেণু দেখতে পাচ্ছেন।

এই কথা শুনে মুনিরা মন্ত্রণা করে পুত্রের জন্য নিঃসন্তান বেণ রাজার উরু মন্থন করলেন। সেই উরু থেকে একটি দগ্ধ স্তম্ভের মতো খর্বমুখ হ্রস্বকায় পুরুষ উত্থিত হয়ে বলল, আমি কী করব? মুনিরা বললেন, নিষীদ, মানে উপবেশন কর। এই জন্য সে নিষাদ হল, তার সন্তানেরা হল বিন্ধ্যপর্বতবাসী নিষাদ। নিষাদ রূপেই বেণ রাজার পাপ নির্গত হয়ে গেল।

তারপর ঋষিরা বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করলে অগ্নির মতো দীপ্তি নিয়ে পৃথু জন্মগ্রহণ করলেন। তখন ধনু, শর ও কবচ আকাশ থেকে পতিত হল। সকলে হৃষ্ট হল এবং এই সৎ পুত্রের জন্মে বেণও পুন্নাম নরক থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ত্রিদিবে গমন করলেন। পিতামহ আঙ্গিরস দেবগণ ও স্থাবর-জঙ্গমের সঙ্গে সমাগত হয়ে পৃথুকে স্নান করালেন। তার দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন দেখে পৃথুকে বিষ্ণুর অংশ জেনে পরিতুষ্ট হলেন। চক্রবর্তী রাজাদের মধ্যে যাঁর প্রভাব দেবতারাও খর্ব করতে পারেন না, তাঁদের হাতেই বিষ্ণুচিহ্ন চক্র থাকে।

পৃথু জন্ম মাত্রেই পৈতামহ যজ্ঞ করেন। তাতে সেই দিনই সোম-যজ্ঞভূমিতে মহামতি সূত ও ঐ মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ সমুৎপন্ন হলেন। মুনিরা বললেন, তোমরা পৃথু রাজার স্তব কর। সূত ও মাগধ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আজ এই রাজার জন্ম হয়েছে, এঁর গুণ কর্ম বা যশ এখনও জানা যায় নি। আমরা কী ভাবে এঁর স্তব করব? ঋষিরা বললেন, এই মহাবল চক্রবর্তী রাজার যে গুণ হবে এবং যে কর্ম করবেন, তাই দিয়ে স্তব কর।

পৃথু এ কথা শুনে খুশী হয়ে বিবেচনা করলেন, সৎগুণেই যদি লোকের শ্লাঘা হয় তো আজ এঁরা স্তোত্রে আমার সব গুণ বর্ণনা করবেন, আমি সমাহিত হয়ে তাই করব এবং যা বর্ণনীয় বলবেন, তা বর্ণন করব।

এর পরে সূত ও মাগধ পৃথুর ভবিষ্য কর্ম নিয়ে সুস্বরে স্তব করলেন। বললেন, এই রাজা সত্যবাক্, দানশীল, সত্যসন্ধ, মৈত্র, লজ্জাশীল, ক্ষমাশীল, বিক্রান্ত, দুষ্টশাসন, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান, প্রিয়ভাষী, মান্যের মানদ, যজ্ঞরত, ব্রহ্মণ্য, সাধুসম্মত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী ও ব্যবহারে স্থিত।

পৃথু এই সব গুণের কথা মনে রেখে কর্ম করেছিলেন। অরাজক কালে সমস্ত ওষধি প্রনষ্ট হয়েছিল বলে ক্ষুধা-পীড়িত প্রজারা রাজার নিকট এসে বলেছিলেন, ধরিত্রী সমস্ত ওষধি গ্রাস করেছে, তাতে প্রজারা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। আপনি প্রজাপালক, ক্ষুধার্ত প্রজাদের আপনি জীবনৌষধি দান করুন।

এই কথায় কুপিত হয়ে রাজা ধনুর্বাণ নিয়ে বসুন্ধরার অনুধাবন করলেন। ত্রাসে বসুন্ধরা গোরূপ ধারণ করে নানা স্থানে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু সর্বত্রই উদ্যতশস্ত্র পৃথুকে দেখতে পেলেন। শেষে ভয়ে কম্পিত হয়ে বললেন, স্ত্রীবধে কি তোমার মহাপাপ হবে না? পৃথু বললেন, একজনের নিধন হলে যদি অনেকে রক্ষা পায় তো সে ক্ষেত্রে একের বধই পুণ্যের কাজ। বসুন্ধরা বললেন, প্রজাদের

উপকারের জন্যই যদি আমাকে বধ কর তো তাদের আধার হবে কে ? পৃথু বললেন, আত্মযোগবলে আমিই তাদের আধার হব। বসুন্ধরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজাকে বললেন, উপায় অনুসারে কাজ করলে সব কাজেই সিদ্ধিলাভ হয়। আমি তোমাকে একটি উপায় বলছি। সমস্ত ওষধি আমি জীর্ণ করে ফেলেছি, এখন আমি ক্ষীর পরিণামিনী ওষধি দিচ্ছি। প্রজার হিতার্থে তুমি আমাকে বৎস দাও, বৎসলা হয়ে আমি ক্ষরণ করব। আমাকে সর্বত্র সমতল কর, তাহলেই আমি বনৌষধির বীজভূত ক্ষীর ক্ষরণ করব।

পৃথু এই কথা শুনে শত সহস্র শৈল অপসারণ করলেন। পূর্ব সৃষ্টিতে বিষম বসুন্ধরায় পুরের প্রবিভাগ, শস্য, গোরক্ষা ও কৃষি ও বণিক পথ ছিল না। পৃথুর জন্যই তা সম্ভব হল, ভূমির সমতল স্থলেই প্রজাদের নিবাস হল। ওষধি বিনষ্ট হবার পর শুধু ফল ও মূল মাত্র প্রজাদের কষ্টের আহার হয়েছিল। পৃথু সায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করে স্বহস্তে বসুন্ধরাকে দোহন করলেন। তাতেই শস্য জন্মাল। প্রজারা আজও সেই অন্নে জীবন ধারণ করছে। প্রাণ প্রদানের জন্য পৃথু বসুন্ধরার পিতা হয়েছিলেন। এর জন্যেই বসুন্ধরার নাম হয় পৃথিবী।

প্রচেতাদের তপস্যা, কণ্ডু মুনির চরিত ও দক্ষের প্রজা সৃষ্টি

পরাশর বললেন, পৃথুর পৌত্র হবির্ধান অগ্নির কন্যাকে বিবাহ করে ছয় পুত্র লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রাচীনবর্হিঃ মহাবল বলে বিখ্যাত ছিলেন। তপস্যার পরে তিনি সমুদ্রতনয়া সবর্ণাকে বিবাহ করেন। প্রচেতা নামে তাঁদের ধনুর্বেদপারগ দশ পুত্রের জন্ম হয়। এই প্রচেতারা পৃথক ধর্মাচরণ না করে সমুদ্রসলিলবাসী হয়ে দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেন।

মৈত্রেয় প্রশ্ন করলেন, প্রচেতারা কেন সমুদ্রের জলে তপস্যা করেছিলেন ?

পরাশর উত্তর দিলেন, প্রচেতাদের পিতা তাঁদের বলেছিলেন, প্রজাপতি আমাকে 'প্রজা সংবর্ধন কর' এই আদেশ দিলে আমি 'তথাস্তু' বলেছি। তাই তোমরা আমার প্রীতির জন্য অতন্দ্রিত হয়ে প্রজাবৃদ্ধি কর। প্রচেতারাও 'তথাস্তু' বলে প্রশ্ন করল, কী ভাবে আমরা প্রজাবৃদ্ধি করব? পিতা বললেন, যাঁর আরাধনা করে আদিকালে প্রজাপতি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই বিষ্ণুর আরাধনা করে তোমাদের প্রজা বৃদ্ধি হবে। এই কথা শুনেই প্রচেতা নামে তাঁর দশ পুত্র সমুদ্রের জলে মগ্ন হয়ে সমাহিত অবস্থায় বিষ্ণুর প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেছিলেন। তারপর প্রস্ফুটিত নীলোৎপলদলের মতো কান্তিতে বিষ্ণু তাঁদের দর্শন দিলেন। প্রচেতারা তাঁকে প্রণাম করলে বললেন, তোমাদের বর দেবার জন্য আমি সমুপস্থিত হয়েছি. তোমরা ঈপ্সিত বর নাও। প্রচেতারা পিতার সমাদিষ্ট প্রজা বৃদ্ধির বর চাইলে সেই বর দান করে বিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন। প্রচেতারাও জল থেকে উঠে এলেন।

পরাশর বললেন, প্রচেতারা যখন তপস্যা করছিলেন, তখন মহীরুহ অরক্ষিতা পৃথিবীকে আবৃত করে এবং তাতে প্রজাক্ষয় হয়। আকাশ গাছে ঢেকে গিয়েছিল, বাতাস বইতে পারে নি, প্রজারা অক্ষম হয়েছিল কাজে। প্রচেতারা এই দেখে ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁদের মুখ থেকে বায়ু ও অগ্নির সৃষ্টি হল। বায়ু সমস্ত গাছ উন্মুলিত ও শোষিত করল এবং অগ্নি দগ্ধ করল সেই সব। তাই দেখে বৃক্ষের রাজা সোম কিছু বৃক্ষ অবশিষ্ট থাকতেই প্রচেতাদের নিকটে এসে বললেন, তোমরা ক্রোধ সংবরণ কর, বৃক্ষদের সঙ্গে আমি তোমাদের সন্ধি করে দেব। ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই আমি তাদের বরবর্ণিনী কন্যাকে আমার সুধাকিরণে বর্ধিত করেছিলাম। মারিষা নামের সেই বৃক্ষ-কন্যা বংশ বৃদ্ধির জন্য তোমাদের ভার্যা হোক। তোমাদের ও আমার অর্ধতেজে এঁর গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হবেন। তিনি আমার সৌম্যাংশে ও তোমাদের তেজে অগ্নিসম হয়ে প্রজা বর্ধন করবেন।

এই প্রসঙ্গে সোম কণ্ডু মুনির কাহিনী শোনালেন। বললেন, পুরাকালে বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই কণ্ডু মুনি সুরম্য গোমতী তীরে পরম তপস্যা করছিলেন। তাঁর তপস্যায় ক্ষোভ সঞ্চারের জন্য ইন্দ্র প্রম্লোচা নামের এক সুন্দরী অপ্সরাকে নিযুক্ত করেন। সে ঋষির চিত্তবিকারে সমর্থ হয়। বিষয়াসক্ত হয়ে ঋষি তার সঙ্গে মন্দর পর্বতের উপত্যকায় শত বৎসরেরও বেশি সময় বাস করেন। তার পরে অপ্সরা তাঁকে বলল, আমি স্বর্গে ফিরে যেতে চাই, প্রসন্ন মনে আপনি অনুজ্ঞা দিন। আসক্ত চিত্তে মুনি বললেন, আর কিছু দিন থাক। এই কথায় প্রম্লোচা তাঁর সঙ্গে কিছু অধিক শত বৎসর বিষয় ভোগ করল। তারপরে আবার বলল, আপনি অনুজ্ঞা দিন, আমি ত্রিদিবালয়ে যাই। মুনি এবারেও বললেন, থাক। পুনরায় কিছু অধিক শত বৎসর যাপন করবার পরে সেই শুভাননা অপ্সরা প্রণয়ের স্মিত হাস্যে বলল, এইবারে আমি স্বর্গে যাই। কিন্তু মুনি এই কথা শুনে আয়তনয়নাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি তো চিরকালের জন্য যাবে, আর কিছুক্ষণ থাক। মুনির শাপের ভয়ে প্রম্লোচা তাঁর সঙ্গে আরও প্রায় দুশো বছর কাটাল।

এই ভাবে অপ্সরা যতবার স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি চাইল, ততবারই ঋষি তাকে 'থাক, থাক' বলতে লাগলেন এবং শাপের ভয়ে প্রম্লোচা কণ্ডু মুনিকে পরিত্যাগ করে যেতে সাহস পেল না। একদিন ত্বরান্বিত হয়ে ঋষি তাঁর পর্ণশালা থেকে নির্গত হতেই অপ্সরা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছেন? ঋষি বললেন, দিন শেষ হল, আমি সন্ধ্যা-উপাসনা করব, তা না হলে ক্রিয়া লোপ হবে। অপ্সরা আনন্দে হেসে বলল, আজ আপনার দিন শেষ হল! এত বছরের পর আপনার দিন শেষ হল শুনে কার না বিস্ময় হয়! মুনি বললেন, ভদ্রে, তুমি তো আজই প্রাতে এই নদীতীরে আমার আশ্রমে এসে প্রবেশ করেছ, আর এখন সন্ধ্যা উপস্থিত! তবে তুমি উপহাস করছ কেন? প্রম্লোচা বলল, আমি আজ প্রত্যূষে এসেছি, এ

কথা সত্য নয়। আমার আসার পরে কয়েক শত বৎসর গত হয়েছে।

সোম বলতে লাগলেন, এই কথা শুনে মুনি ভীত হয়ে আয়তনয়না প্রম্লোচাকে প্রশ্ন করলেন, আমি তোমার সঙ্গে কতকাল আনন্দ করলাম? প্রম্লোচা বললেন, নশো সাতাশি বছর ছ মাস তিন দিন গত হয়েছে। মুনি বললেন, তুমি সত্য বলছ, না উপহাস করছ? আমার তো মনে হচ্ছে, আমি এখানে তোমার সঙ্গে এক দিন আছি। প্রম্লোচা বলল, আপনাকে কি আমি মিথ্যা বলতে পারি! মুনি এই কথা শুনে বললেন, ধিক, আমাকে ধিক। আমার সব তপস্যা নষ্ট হল। ব্রহ্মবিদের ধন হৃত হল, বিবেকও গেল। মোহের জন্য কে এই নারীকে নির্মাণ করেছিল! বুদ্ধিহরণকারী কামকে ধিক। এই ভাবে নিজের নিন্দা করে উপবিষ্ট অপ্সরাকে বললেন, তোমার যেখানে ইচ্ছা যাও। তুমি চেষ্টা করে আমার বিকার জন্মে দেবরাজের কাজ করেছ, কিন্তু তোমাকে আমি ক্রোধের আগুনে ভস্ম করব না। সপ্তপদী মৈত্রী অবলম্বন করে তোমার সঙ্গে আমি বাস করেছি। তোমার দোষ নেই, কেন আমি তোমার উপরে রাগ করব! দোষ আমার, আমি জিতেন্দ্রিয় নই। তাই তুমি ইন্দ্রের কথায় আমার তপস্যা নষ্ট করেছ। তুমি মোহের আধার ও ঘৃণিত। তাই তোমাকে ধিক।

সোম বললেন, কণ্ডু মুনির কথায় প্রম্লোচা কম্পিত ও ঘর্মাক্ত হচ্ছিল। কণ্ডু মুনি ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, তুমি যাও, চলে যাও। প্রম্লোচা তখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে আকাশপথে যেতে যেতে তরুপল্লবে তার গায়ের ঘাম মার্জনা করল। এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষের উপরিভাগের অরুণ পল্লবে তার দেহের স্বেদজল মুছতে মুছতে চলে গেল। মুনি তার দেহে যে গর্ভ সঞ্চার করেছিলেন, রোমকূপ দিয়ে তা ঘাম হয়ে বেরিয়ে গেল। বৃক্ষরা সেই গর্ভ ধারণ করল। বায়ু তা একত্রিত করে দিয়েছিল, আর আমি আমার সুধা কিরণে তা আপ্যায়িত

করেছিলাম। ধীরে ধীরে ঐ গর্ভ বর্ধিত হয়ে বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে উৎপন্ন হল মারিষা। যে কণ্ডুর অপত্য, বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন প্রম্নোচার কন্যা, সে আমার ও বায়ুরও সন্তান, বৃক্ষরা এই কন্যাই তোমাদের প্রদান করবেন। তোমরা কোপ প্রশমিত কর।

তারপরে সোম বললেন, তপস্যা ক্ষীণ হবার পরে কণ্ডু বিষ্ণুর পুরুষোত্তম নামক ধামে গিয়ে তাঁর আরাধনা করেছিলেন। প্রচেতারা বললেন, কণ্ডু মুনি বিষ্ণুর যে স্তব করেছিলেন, আমরা তা শুনতে চাই। সোম সেই স্তব শুনিয়ে বললেন, মারিষার পূর্ব জন্মের কথাও তোমাদের বলছি। পতির মৃত্যুর পরে এক রাজমহিষী ভক্তিতে বিষ্ণুকে তুষ্ট করেছিলেন। বিষ্ণু তাঁর প্রত্যক্ষ হয়ে বলেছিলেন, বর নাও। সেই রাজমহিষী বলেছিলেন, বালবৈধব্যের জন্য আমি মন্দ-ভাগ্য ও বিফলা, আমার জন্ম বৃথা হয়েছে। পরজন্মে আমি যেন অযোনিজা ও প্রিয়দর্শনা হই, জন্মে জন্মে আমি যেন শ্লাঘ্য পতি লাভ করি এবং প্রজাপতির মতো একটি পুত্রের জননী হই। বিষ্ণু সেই প্রণাম-নম্র নারীকে তুলে বললেন, তুমি অযোনিজা ও রূপগুণান্বিতা হয়ে জন্মাবে, তোমার উদারকর্মা দশ পতি হবে এবং প্রজাপতির গুণযুক্ত পুত্র লাভ করবে। সেই রাজমহিষী এই জন্মে মারিষা নামে তোমাদের পত্নী হচ্ছেন।

পরাশর বললেন, সোমের কথায় প্রচেতারা কোপ সম্বরণ করে বৃক্ষদের নিকট থেকে মারিষাকে ধর্মানুসারে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। এঁদের দক্ষ প্রজাপতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইনিই পূর্বে ব্রহ্মার পুত্র হয়েছিলেন। সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য তিনি বহু পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি মনের দ্বারা চর, অচর, দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি সৃষ্টি করবার পর ষাট কন্যা সৃজন করেন। এই কন্যাদের দশটি ধর্মকে, তেরোটি কশ্যপকে ও সাতাশটি সোমকে দিয়েছিলেন। এই কন্যারাই দেব, দৈত্য, নাগ, গো, পক্ষী, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও দানবাদির জননী। এর পর থেকেই প্রজারা মৈথুন-সম্ভব

হল। এর আগে সংকল্প, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং তপস্বীদের তপো-বিশেষে প্রজা সৃষ্টি হত।

মৈত্রেয় বললেন, আমি শুনেছিলাম যে ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের জন্ম হয়। তিনি আবার প্রচেতাদের পুত্র হলেন কী রূপে? আমার আর এক সংশয় হল, যিনি সোমের দৌহিত্র, তিনিই আবার তাঁর শ্বশুর হলেন কী ভাবে!

পরাশর বললেন, প্রাণীদের মধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ নিত্য, মানে প্রবাহ রূপে অবিচ্ছিন্ন। তাই দিব্যচক্ষু ঋষিরা এ বিষয়ে মোহিত হন না। দক্ষাদি ঋষিরা যুগে যুগে উৎপন্ন হন ও পুনরায় লীন হন। কে বড় আর ছোট কে, এ বিচার পুরাকালে ছিল না। তপস্যার প্রভাবেই লোকে বড় হত।

মৈত্রেয় বললেন, এইবারে আমাকে দেব, দানব, গন্ধর্ব, নাগ ও যক্ষদের উৎপত্তি বিষয়ে সবিস্তারে বলুন।

পরাশর বললেন, পুরাকালে স্বয়ম্ভু দক্ষকে প্রজা সৃষ্টির আদেশ দিয়েছিলেন। তারই জন্য দক্ষ প্রথমে মন থেকে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, অসুর ও নাগ সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেই মানসী প্রজা বংশবৃদ্ধি করল না দেখে তিনি মৈথুন ধর্মে প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন এবং বীরণ প্রজাপতির তপস্বী কন্যা অসিক্লীকে বিবাহ করলেন। অসিক্লীর গর্ভে দক্ষর পাঁচ হাজার পুত্র জন্মাল। প্রজা বৃদ্ধি বিষয়ে তাদের উৎসুক দেখে প্রিয় সংবাদবিপ্র দেবর্ষি নারদ বললেন, তোমরা এই পৃথিবীর কিছু জানো না। এই পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত না জেনে তোমরা কী রূপে প্রজা সৃষ্টি করবে?

এই কথা শুনেই তারা চারিদিকে চলে গেল। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে আর ফেরে না, তেমনি তারাও আর ফিরে এল না। হর্যশ্ব নামের এই পুত্ররা নিরুদ্দেশ হলে দক্ষ আরও হাজার হাজার পুত্রের জন্ম দিলেন। তাদের নাম শবলাশ্ব। দেবর্ষি নারদ তাদেরও সন্তান বৃদ্ধিতে ইচ্ছুক দেখে আগের মতো বোঝালেন। তারা পরস্পরকে

বলল, মহামুনি ঠিক বলেছেন। ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই যে আমাদের উচিত, তাতে সংশয় নেই। পৃথিবীর প্রমাণ জেনে অথবা তার পরিমাণ নিরূপণ করেই আমরা প্রজা সৃষ্টি করব, এই স্থির করে তারাও সেই মার্গের দিকে চলে গেল, আর ফিরল না। সেই থেকে ভ্রাতার অন্বেষণে গেলে নিরুদ্দেশ হয়, এইজন্য জ্ঞানীদের তা করা উচিত নয়।

এই পুত্ররাও নষ্ট হয়েছে জেনে দক্ষ প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে শাপ দেন। তারপর ষাট কন্যার জন্ম দেন। এদের দশটি ধর্মকে, তেরোটি কশ্যপকে ও সাতাশটি সোমকে দান করেন। বাকি দশটি কন্যার চারটি অরিষ্টনেমিকে এবং বহুপুত্র, আঙ্গিরস ও কৃশাশ্বকে দুটি করে কন্যা দান করেন। ধর্মের দশ পত্নীর নাম অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা। বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেবগণ, সাধ্যার পুত্র সাধ্যগণ, মরুত্বতীর পুত্র মরুত্বৎগণ, বসুর পুত্র বসুগণ, ভানুর পুত্র ভানুগণ, মুহূর্তার পুত্র মুহূর্তগণ, লম্বার পুত্র ঘোষ, যামীর পুত্র নাগবীথী, সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্প এবং সমস্ত পৃথিবী বিষয় অরুন্ধতীতে জন্মগ্রহণ করে। যে দেবতারা অষ্টবসু নামে খ্যাত, তাদের নাম আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত ও ধ্বনি। ধ্রুবের পুত্র লোকসংহর্তা কাল। সোমের পুত্র বর্চাঃ। ধরের পাঁচ পুত্রের নাম দ্রবিণ, হুতহব্যাহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ। অনিলের দুই পুত্র মনোজব ও অবিজ্ঞাত গতি। অগ্নিপুত্র কুমারের জন্ম শরস্তম্ভে, কৃত্তিকাদের অপত্য বলে তিনি কার্তিকেয় নামে স্মৃত। শাখ বিশাখ ও নৈগমেয় এঁর অনুজ। প্রত্যূষের পুত্র দেবল, দেবলের দুই পুত্র। বৃহস্পতির ভগিনী যোগ-সিদ্ধা অনাসক্ত ব্রহ্মচারিণী হয়ে পৃথিবী বিচরণ করেন। তিনি হয়েছিলেন অষ্টম বসু প্রভাসের পত্নী। সহস্র শিল্পের কর্তা, ত্রিদশদের সূত্রধর, ভূষণ নির্মাতা, শিল্পীশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা তাঁদের পুত্র। ইনি দেবতাদের বিমানগুলি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর শিল্প আজও

মানুষের উপজীবিকা। বিশ্বকর্মার চার পুত্রের নাম অজৈকপাদ, আহির্বুধ্ন, ত্বষ্টা ও রুদ্র। ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ। হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব ও কপালী একাদশ রুদ্র নামে পরিচিত।

কশ্যপের পত্নী অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা, সুরমা, সুরভি, বিস্তা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি। পূর্বের মন্বন্তরে তুষিত নামে দ্বাদশ শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁরা স্থির করলেন যে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন, এবং তাই করলেন। অদিতির এই দ্বাদশ পুত্রের নাম বিষ্ণু, শক্র, অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভব। এঁরা দ্বাদশ আদিত্য নামে স্মৃত।

সোমের সাতাশটি পত্নী নক্ষত্র যোগিনী এবং নক্ষত্রের নামেই তাঁদের নাম। তাঁদের অনেক অমিততেজ ও দীপ্তিমান অপত্য জন্মেছিল। অরিষ্টনেমির ষোলটি পুত্র। বহুপুত্রের পত্নীদের নাম বিদ্যুৎ। শ্রেষ্ঠ ঋক্‌গুলি প্রত্যঙ্গিরস জাত এবং কৃশাশ্বের পুত্ররা দেব প্রহরণ নামে স্মৃত। এঁরা সহস্র যুগ পরে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা ছন্দজ অর্থাৎ স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করতে সক্ষম। সংসারে সূর্যের উদয়াস্তের মতো এই দেবতারা যুগে যুগে সম্ভূত হন।

প্রহ্লাদ-চরিত

পরাশর বললেন, কশ্যপের পত্নী দিতির গর্ভে দুই দুর্জয় পুত্র হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়, সিংহিকা নামে এক কন্যাও জন্মে। হিরণ্যকশিপুর চার পুত্রের নাম অনুহ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ। এদের মধ্যে প্রহ্লাদ সর্বত্র সমদৃষ্টি, জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণুভক্ত। তার হৃদয়ে বিষ্ণু অবস্থিত ছিলেন বলে হিরণ্যকশিপুর দীপিত বহ্নি সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়েও তাকে দগ্ধ করতে পারে নি। পাশবদ্ধ অবস্থায় তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে পৃথিবী বিচলিত হয়েছিল, দৈত্যরাজের

কোন শস্ত্রে তার পাহাড়ের মতো কঠিন শরীর ছিন্নভিন্ন হয় নি, বিষাগ্নিতে উজ্জ্বল মুখের সর্পরাও তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে নি, পর্বতের নিচে চাপা পড়েও তার মৃত্যু হয় নি, উপর থেকে নিক্ষেপ করা হলে পৃথিবী তাকে ধারণ করেছিল, সংশোধক বায়ু তার দেহে ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল, তার বুকে লেগে উন্মত্ত হাতীর দাঁত ভেঙে যায়, রাজ-পুরোহিত যে কৃত্যা উৎপন্ন করেছিলেন সেও তার মৃত্যু ঘটাতে পারে নি, শম্বরাসুরের সহস্র মায়া বিষ্ণুর চক্রে বিফল হয়, দৈত্যরাজের পাচক যে হলাহল বিষ দিয়েছিল তাও সে জীর্ণ করে ফেলে।

মৈত্রেয় বললেন, দৈত্যরা কেন তাকে বধ করতে পারে নি, তা জানবার কৌতূহল আমার নেই; কেননা বিষ্ণুর প্রতি অনন্যমনার বিনাশ সম্ভব নয়। দৈত্যরা প্রহ্লাদের সবংশপ্রভব হয়ে এই ধর্মাত্মাকে কেন নানাভাবে প্রহার করেছিল, তাই আমাকে বলুন।

পরাশর বললেন, পুরাকালে দিতির মহাবীর্য পুত্র হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বর দর্পিত হয়ে ত্রৈলোক্য বশ করেন। সেই দৈত্য ইন্দ্রত্ব করেন এবং স্বয়ং সবিতা, পবন, অগ্নি, বরুণ, সোম, কুবের ও যম হয়েছিলেন। তিনি নিজেই অশেষ যজ্ঞভাগ ভোগ করতেন। ত্রিভুবন জয় করে তিনি ত্রিলোকের ঐশ্বর্যে দর্পিত হয়ে বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। গন্ধর্বরা তাঁর স্তুতি করত, সিদ্ধ গন্ধর্ব ও সর্পরা এই পানাসক্ত হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করত, অনেকে তাঁর সামনে বাজনা বাজিয়ে গান করত, আর জয় শব্দ করত আনন্দিত সিদ্ধরা। যে স্ফটিকাভ্রময় মনোহর প্রাসাদে অপ্সরারা নৃত্য করত, সেখানেই এই অসুর হৃষ্ট মনে মদিরা পান করতেন।

তাঁর শিশু-পুত্র প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থেকে পাঠ করত। একদিন সে গুরুর সঙ্গে পানাসক্ত পিতার নিকটে গিয়েছিল। পাদদেশে প্রণামাবনত পুত্রকে তুলে পিতা বললেন, বৎস, এত দিন যা শিখেছ তার সার সুভাষিত পাঠ কর। প্রহ্লাদ বলল, তাত, আমার মনে যা আছে, সেই কথা আমি বলছি। যাঁর আদি মধ্য অন্ত নেই, যিনি

অজ, যাঁর ক্ষয় বৃদ্ধি নেই, যিনি সব কারণের কারণ, সেই অচ্যুত মহাত্মাকে আমি প্রণাম করি।

এ কথা শুনেই দৈত্যেন্দ্র ক্রোধে আরক্তলোচন হয়ে গুরুর দিকে চেয়ে স্ফুরিতাধরে বললেন, আপনি আমাকে অবজ্ঞা করে বালককে আমার বিপক্ষের অসার স্তুতি শিখিয়েছেন! গুরু বললেন, কোপের বশ হবেন না। আপনার পুত্র আমার উপদিষ্ট বিষয় বলছে না। হিরণ্যকশিপু তখন প্রহ্লাদকে বললেন, কে তোমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে? প্রহ্লাদ বলল, হৃদিস্থিত বিষ্ণুই অশেষ জগতের শাসক, তিনি ছাড়া আর কে এই শিক্ষা দেবেন! হিরণ্যকশিপু বললেন, আমার সামনে নিঃশঙ্কায় যাকে তুমি বার বার জগতের ঈশ্বর বলছ, কে সেই বিষ্ণু? প্রহ্লাদ বলল, যাঁর থেকে বিশ্ব এবং যিনি স্বয়ং বিশ্ব, তিনিই বিষ্ণু। হিরণ্যকশিপু বললেন, এই দুষ্টকে দূর কর, গুরুগৃহে এর শাসন করা হোক। দৈত্যরা প্রহ্লাদকে আবার গুরুগৃহে নিয়ে গেল। প্রহ্লাদও গুরুর শুশ্রূষায় উদ্যোগী হয়ে সর্বদা বিদ্যাধ্যয়ন করতে লাগল।

অনেক দিন গত হবার পর হিরণ্যকশিপু আবার প্রহ্লাদকে ডেকে বললেন, বৎস, কোন গাথা পাঠ কর। প্রহ্লাদ বলল, যাঁর থেকে প্রধান ও পুরুষ এবং চরাচর সমস্ত জগতের কারণ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। এ কথা শুনেই হিরণ্যকশিপু বললেন, এই ছেলে সপক্ষের হানিকর কুলাঙ্গার হয়েছে, এর জীবিত থেকে কোন ফল নেই। বধ কর এই দুরাত্মাকে।

এই আদেশ পেয়েই শত সহস্র দৈত্য অস্ত্র নিয়ে তার বিনাশের জন্য উদ্যত হল। কিন্তু তাদের অস্ত্রাঘাতে প্রহ্লাদের বিন্দুমাত্র বেদনা-বোধ হল না। হিরণ্যকশিপু বললেন, তোমাকে আমি অভয় দিচ্ছি, তুমি মূঢ়মতি হয়ো না। শত্রুপক্ষের স্তব থেকে নিবৃত্ত হও। প্রহ্লাদ বলল, যাঁকে স্মরণ করলে জন্ম জরা ও শমনের ভয় দূর হয়, তিনি হৃদয়ে থাকতে আমার ভয় কিসের।

হিরণ্যকশিপু সর্পদের বললেন, তোমরা বিষজ্বালাকুল মুখে এই দুর্মতি দুরাচারকে দংশন করে বিনাশ কর। রাজার আদেশে কুলক, অন্ধক ও তক্ষক প্রভৃতি বিষধর সর্পেরা তার সারা গায়ে দংশন করতে লাগল। কিন্তু প্রহ্লাদের কিছু হল না দেখে হিরণ্যকশিপু হাতীদের বললেন, তোমরা দাঁত দিয়ে একে হনন কর। হাতীরা তখনই প্রহ্লাদকে মাটিতে ফেলে তাদের দাঁত দিয়ে তাকে নিপীড়িত করতে লাগল। কিন্তু তার বুকে ঠেকে হাতীদের দাঁতই ভেঙে গেল। তাই দেখে হিরণ্যকশিপু অসুরদের বললেন, তোমরা আগুন জ্বালো। আর বায়ু, তুমি অগ্নিকে বর্ধিত করে এই পাপীকে দগ্ধ কর। অসুররা প্রহ্লাদকে কাঠ দিয়ে আচ্ছন্ন করে আগুন জ্বেলে দাহ করতে লাগল। কিন্তু প্রহ্লাদ বলল, আমার দেহ তো দগ্ধ হচ্ছে না, আমার চারিদিক পদ্মময় আবরণের মতো শীতল মনে হচ্ছে।

এই সব দেখে ভার্গবাত্মজ ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা দৈত্যরাজকে সামবাক্যে স্তব করে বললেন, আপনার নিজের পুত্র এই বালকের প্রতি কোপ সংবরণ করুন। দেবতাদের উপরে আপনার কোপ সফল হবে। এই বালককে আমরা শাসন করব, আপনার বিপক্ষ নাশের জন্য এ বিনীত হবে। যদি না হয় তো এর বধের জন্য আমরা অভিচার ক্রিয়ায় অনিবর্তিনী কৃত্যা উৎপন্ন করব। পুরোহিতদের কথায় দৈত্যরাজ পুত্রকে আগুন থেকে বার করালেন। কিন্তু বালক প্রহ্লাদ গুরুগৃহে ফিরে গিয়েও গুরুর উপদেশের মাঝে মাঝে দানব শিশুদের নিজে অধ্যয়ন করাতে লাগল। বলতে লাগল, সমভাবই বিষ্ণুর আরাধনা। তিনি প্রসন্ন হলে জগতে অলভ্য কিছুই থাকে না।

দানবরা প্রহ্লাদের এই চেষ্টা দেখে দৈত্যপতির ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা বলল। হিরণ্যকশিপু পাচকদের ডেকে বললেন, আমার এই দুর্মতি পুত্র অন্য বালকদের উপদেশক হয়েছে। তোমরা একে হত্যা কর। তার অজ্ঞাতে সমস্ত খাদ্যে হলাহল বিষ মিশিয়ে পাপিষ্ঠকে মেরে ফেলতে কোন দ্বিধা করো না। পাচকেরা তাই করল। আর

প্রহ্লাদও অন্নের সঙ্গে সেই বিষ খেয়ে বিনা বিকারে তা জীর্ণ করে ফেলল। তাই দেখে পাচকেরা ভয়ে ত্রস্ত হয়ে দৈত্যপতির কাছে গিয়ে সব কথা জানাল। হিরণ্যকশিপু তখন পুরোহিতদের ডেকে বললেন, আপনারা সত্বর হোন, তার বিনাশের জন্য অচিরে কৃত্যা উৎপাদন করুন।

পুরোহিতেরা তখনই বিস্ময়ান্বিত প্রহ্লাদের নিকটে এসে বলল, ব্রহ্মার ত্রৈলোক্যবিখ্যাত কুলে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র হয়ে তুমি জন্মেছ। বিষ্ণু বা অন্য কোন দেবতার আশ্রয়ে তোমার কি প্রয়োজন। তোমার পিতা সর্বলোকের আশ্রয়। কাজেই বিপক্ষের স্তব পরিত্যাগ কর। আর সমস্ত গুরুর মধ্যে পিতাই তো পরম গুরু। প্রহ্লাদ বলল, আপনারা যা বলছেন, তাতে কোনই ভ্রান্তি নেই। পিতার নিকট কোন অপরাধ করব না। আমার মনেও এই ইচ্ছা। কিন্তু বিষ্ণুর সম্বন্ধে যা বললেন, তা যথার্থ নয়। পুরোহিতরা বললেন, এ রকম কথা আর বোলো না। আমরাই তো তোমাকে আগুন থেকে রক্ষা করলাম। আমাদের কথা যদি না শোন তবে তোমার বিনাশের জন্য আমরা কৃত্যা সৃষ্টি করব। প্রহ্লাদ বলল, কে কাকে হত্যা বা রক্ষা করে। সৎ ও অসৎ আচরণে আত্মাই আত্মাকে রক্ষা ও সংহার করে।

এই কথা শুনে দৈত্যরাজের পুরোহিতেরা অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আকৃতির কৃত্যা সৃজন করলেন। ঐ ভয়ঙ্কর কৃত্যা পাদন্যাসে ক্ষিতিকে ক্ষতবিক্ষত করে ক্রোধভরে প্রহ্লাদের বুকে শূলের আঘাত করল। কিন্তু ঐ দীপ্ত শূল তার বুকে ঠেকে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। পাপী পুরোহিতেরা অপাপের প্রতি কৃত্যা প্রয়োগ করায় সে তাঁদেরই সংহার করে নিজে বিনষ্ট হল। পুরোহিতদের দগ্ধ হতে দেখে প্রহ্লাদ তাঁদের রক্ষার জন্য সেই দিকে ধাবিত হয়ে বলল, হে জনার্দন, এই দুঃসহ মন্ত্রপাবক থেকে বিপ্রদের রক্ষা কর। যারা আমাকে বধ করার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করছে, আম

তাদের কারও অনিষ্ট চিন্তা করি না। এঁরা আবার জীবিত হয়ে উঠুন, বলে পুরোহিতদের স্পর্শ করতেই তাঁরা নিরাময় হয়ে উঠলেন। তার পরে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন, বৎস, তুমি উত্তম, দীর্ঘায়ু, অপ্রতিহত বলবীর্য সমন্বিত, পুত্র-পৌত্র, ধন ও ঐশ্বর্যযুক্ত হও। তারপরে তাঁরা দৈত্যরাজের নিকটে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করলেন।

কৃত্যা বিফল হয়েছে জেনে হিরণ্যকশিপু পুত্রকে ডেকে এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। প্রহ্লাদ তাঁকে প্রণিপাত করে বলল, আমার এই প্রভাব নৈসর্গিক নয়, মন্ত্রাদিকৃতও নয়। বিষ্ণু যার হৃদয়ে বাস করেন, এ তার সামান্য প্রভাব। এই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে মুখ অন্ধকার করে কিঙ্করদের বললেন, এই দুরাত্মাকে প্রাসাদ শিখর থেকে নিক্ষেপ কর। গিরিপৃষ্ঠে পড়ে শিলায় এর দেহের সব অঙ্গসন্ধি ভেঙে যাক। দৈত্যরা তখনই তাকে সবলে নিক্ষেপ করল। কিন্তু জগদ্ধাত্রী পৃথিবী প্রহ্লাদকে ধারণ করলেন। তার অস্থি পঞ্জর অভগ্ন দেখে হিরণ্যকশিপু শ্রেষ্ঠ মায়াবী শম্বরকে বললেন, আমরা এই দুর্বুদ্ধি বালককে বধ করতে পারছি না। তুমি মায়া জান। মায়ায় তুমি একে বিনষ্ট কর।

এই কথায় শম্বরাসুর প্রহ্লাদের প্রতি মায়া সৃষ্টি করল। কিন্তু প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে স্মরণ করতেই তাঁর সুদর্শন চক্র এসে উপস্থিত হল তাকে রক্ষার জন্য। আর সেই চক্রে শম্বরের সহস্র মায়া একে একে বিনষ্ট হয়ে গেল। এইবারে দৈত্যপতি সংশোধক বায়ুকে বললেন, তুমি এই দুরাত্মাকে ক্ষয় কর। যথাজ্ঞা বলে সেই শীতল রুক্ষ ও দুঃসহ পবন দেহ শোষণের জন্য ধীরে ধীরে প্রহ্লাদের শরীরে প্রবেশ করল। প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে স্মরণ করতেই তার হৃদয়স্থ বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হয়ে সেই বায়ু পান করে ফেললেন। তারপরে প্রহ্লাদও পুনরায় গুরু গৃহে ফিরে গেলেন।

আচার্য তখন তাকে রাজ্যফলপ্রদ নীতি শিক্ষা দিতে লাগলেন। যখন তাকে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ও বিনীত মনে করলেন, তখন তার

পিতাকে এই কথা জানালেন। বললেন, শুক্রাচার্য যা বলেছেন, প্রহ্লাদ তা যথাযথ শিখেছে। হিরণ্যকশিপু প্রশ্ন করলেন, ক্ষয় বৃদ্ধি ও সাধারণ সময়—এই তিন কালে রাজা তাঁর শত্রু মিত্র ও মধ্যস্থের প্রতি কী রূপ ব্যবহার করবেন ? প্রহ্লাদ সবিনয়ে পিতাকে প্রণিপাত করে কৃতাঞ্জলিপুটে বলল, গুরু আমাকে এ সব বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন এবং আমিও তা গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার বিবেচনায় সে নীতি ভাল নয়। আপনি রাগ করবেন না। ভগবান বিষ্ণু আপনাতে আমাতে এবং সর্বত্র বিদ্যমান। সর্বত্রই তো তিনি আমার মিত্র, শত্রু আবার কোথায় ?

এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠে পুত্রের বুকে পদাঘাত করে দৈত্যদের বললেন, তোমরা একে নাগপাশে বদ্ধ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। তা না হলে সমস্ত লোক ও দৈত্য দানব এই দুরাত্মার মত গ্রহণ করবে। রাজার আদেশে দৈত্যরা প্রহ্লাদকে নাগবন্ধনে বদ্ধ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। প্রহ্লাদ বিচলিত হলে সমুদ্র চঞ্চল ও উদ্বেল হয়ে উঠল। পৃথিবী জলপ্লাবিত হচ্ছে দেখে হিরণ্যকশিপু দৈত্যদের বললেন, তোমরা পর্বত নিক্ষেপ করে ঐ দুর্মতিকে সম্পূর্ণ চাপা দাও। এতেই ওর প্রাণ যাবে। এই কথায় দৈত্য দানবেরা সহস্র যোজন স্থান পর্বতে আচ্ছন্ন করে দিল। কিন্তু প্রহ্লাদ আহ্নিক বেলায় একাগ্র চিত্তে বিষ্ণুর স্তব করতে লাগল।—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

যাঁর থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, যিনি সব এবং সমস্ত যাঁতে লীন হয়, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। সব কিছুর মধ্যে তাঁর ব্যাপ্তির জন্য তিনিই আমি, আমার থেকেই সব উৎপন্ন হয়েছে; আমিও সব রূপে বর্তমান এবং আমাতেই সব লয় হবে। সৃষ্টির আগে আমিই অক্ষয় নিত্য ও সমস্ত জীবাত্মার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম নামের পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরমপুরুষ।

এই ভাবে প্রহ্লাদ নিজেকে বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং বিষ্ণু ছাড়া আর কিছুই জানতে পারেন নি। যোগ প্রভাবে বিষ্ণুময় হয়ে উঠলে প্রহ্লাদের নাগবন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। সমুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠল ও পৃথিবী কম্পিত হতে লাগল। প্রহ্লাদ তখন উপরের শৈল সরিয়ে সমুদ্রের জল থেকে উঠে পড়ল। তারপর মাথার উপরে আকাশ ও নিচে পৃথিবী দেখে নিজেকে প্রহ্লাদ বুঝতে পেরে পুনরায় বিষ্ণুর স্তব করতে লাগল। বলল, হে বিষ্ণু, আর একবার দর্শন দিয়ে তুমি আমাকে পবিত্র কর। ভগবান বললেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। প্রহ্লাদ বলল, তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন ঐকান্তিক হয়। ভগবান বললেন, আমার প্রতি তোমার ভক্তি তো আছেই, জন্মান্তরেও থাকবে। এখন যা ইচ্ছা করে, সেই বর নাও। প্রহ্লাদ বলল, তোমাকে স্তব করার জন্য আমার পিতা আমাকে যত শাস্তি দিয়েছেন, সেই পাপ থেকে তিনি মুক্ত হোন। ভগবান বললেন, তথাস্তু। আমি তোমাকে আরও একটি বর দিতে চাই, তুমি প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ বলল, তুমি আমাকে যে বর দিয়েছ, তাতেই আমি কৃতার্থ। ধর্ম অর্থ কামের আর কী প্রয়োজন! ভগবান বললেন, আমার অনুগ্রহে তুমি পরম নির্বাণ লাভ করবে। বলে বিষ্ণু অন্তর্ধান হলেন।

প্রহ্লাদ তার পিতার নিকটে গিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করল। পিতা তার মস্তক আঘ্রাণ করে বাষ্পার্দ্র নয়নে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি জীবিত আছ বৎস! এর পরেই তিনি প্রহ্লাদের প্রতি প্রীতিমান হলেন এবং নিজের অসদ্ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করতে লাগলেন। প্রহ্লাদও তার গুরুর ও পিতার শুশ্রূষা করতে লাগল।

তারপর বিষ্ণু নৃসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করলে প্রহ্লাদ দৈত্যদের অধিপতি হয়েছিলেন। এই রাজ্যশ্রী লাভে তাঁর কর্মশুদ্ধি হল, পুত্র পৌত্র ও ঐশ্বর্য পেয়ে ভোগের অধিকার ক্ষীণ হওয়ায় পাপপুণ্য বর্জিত হলেন। তারপর তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হলেন।

এই বংশে সংহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান, শিবি ও বাস্কল। প্রহ্লাদের পুত্রের নাম বিরোচন, বলি বিরোচনের পুত্র। বলির এক শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাণ। হিরণ্যাক্ষের পুত্রদের নাম উৎকুর, শকুনি, ভূত সন্তাপন, মহালাভ, মহাবাহু ও কালনাভ। এরা সকলেই মহাবল। দনুর পুত্রদের নাম দ্বিমূর্ধা, শম্বর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, শম্বর, একচক্র, মহাবাহু, তারক, মহাবল, স্বর্ভানু, বৃষপর্বা, পুলোমা ও বিপ্রচিত্তি। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা ও বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা, উপদানবী ও হয়শিরা। এই কন্যারা পরম রূপবতী বলে বিখ্যাত ছিলেন।

বৈশ্বানরের দুই কন্যা পুলোমা ও কালকা কশ্যপের ভার্যা ছিলেন। এঁদের গর্ভে ষাট হাজার সন্তান জন্মে। কশ্যপের এই দানব পুত্রেরা পৌলমা ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির কয়েকটি নিষ্ঠুর পুত্রের জন্ম হয়। তাদের নাম ব্যংশ, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, অঞ্জক, নবক, কালনাভ, স্বর্ভানু ও চক্রযোধী। এদেব শত সহস্র পুত্র পৌত্রাদি জন্মে। প্রহ্লাদের বংশে নিবাত কবচরা উৎপন্ন হয়।

তাম্র থেকে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রী নামে ছয় কন্যা জন্মে। শুকী শুক কাক ও পেচকদের প্রসব করেন। শ্যেনী শ্যেনদের, ভাসী ভাসদের, গৃধ্রী গৃধ্রদের, শুচি জলচর পক্ষীদের এবং সুগ্রীবী অশ্ব উষ্ট্র ও গর্দভদের মাতা। বিনতার দুই পুত্র বিখ্যাত গরুড় ও অরুণ। সুপর্ণ গরুড় পক্ষাদের শ্রেষ্ঠ ও সর্পভোজী। সুরসার গর্ভে খেচর ও সর্পদের জন্ম হয়। কদ্রুর গর্ভেও অনেক সর্প উৎপন্ন হয়। তাদের মধ্যে প্রধান শেষ, বাসুকী, তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, নাগ, কর্কোটক ও ধনঞ্জয়। ক্রোধ বশার বংশ ক্রোধবশ। তারা দংষ্ট্রাযুক্ত, দারুণ ও মাংসাশী। স্থলজ ও জলজ পক্ষীরাও এই বংশে উৎপন্ন হয়েছে। ক্রোধা পিশাচদের প্রসব করেন, সুরভী গো মহিষদের, ইরা বৃক্ষলতা বল্লী ও তৃণ জাতিকে, খসা যক্ষ রক্ষদের, মুনি অপ্সরাদের এবং অরিষ্টা গন্ধর্বদের

প্রসব করেন। এই স্থাবর জঙ্গম কশ্যপের বংশ বলে কীর্তিত। এই সৃষ্টি স্বারোচিষ মন্বন্তরের।

বৈবস্বত মন্বন্তরে বারুণ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর ব্রহ্মা হোম করেছিলেন, তারপর প্রজা সৃষ্টি করেন। পূর্বে যে সপ্ত ঋষিকে মন থেকে উৎপন্ন করেন, এবারে তাঁদের মানস পুত্র রূপে কল্পনা করেন। গন্ধর্ব সর্প দেব ও দানবদের বিবাদে অনেক সন্তান বিনষ্ট হলে দিতি কশ্যপের আরাধনা করলেন। তুষ্ট হয়ে কশ্যপ তাঁকে বর গ্রহণে প্রলোভিত করেন। ইন্দ্রকে বধ করতে সক্ষম, এমন একটি অমিততেজ পুত্র দিতি প্রার্থনা করলেন এবং কশ্যপ তাঁর ভার্যাকে এই বর দিয়ে বললেন, শত বৎসর পবিত্রভাবে যদি গর্ভ ধারণ করতে পার, তবেই তোমার পুত্র ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে। ইন্দ্র এই কথা জানতে পেরে বিনীত ও শুশ্রূষাপরায়ণ হয়ে দিতির নিকটে এলেন এবং ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হয়ে বাস করতে লাগলেন। নিরানব্বই বৎসর পূর্ণ হবার পর দেখতে পেলেন যে পাদ প্রক্ষালন না করেই দিতি শয়ন করেছেন। দিতি নিদ্রিত হবার পরে ইন্দ্র তাঁর বজ্র নিয়ে উদরে প্রবেশ করে সেই গর্ভ সপ্তধা ছেদন করলেন। গর্ভস্থ সন্তান রোদন করছে দেখে বললেন, রোদন কোরো না। এবং কুপিত হয়ে প্রতি খণ্ডকে আরও সাত খণ্ড করলেন। ইন্দ্র 'মা রোদীঃ' বলেছিলেন বলে এই ঊনপঞ্চাশ দেব মরুৎ নামে ইন্দ্রের সহায় হলেন।

পুরাকালে মহর্ষিরা পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তারপর লোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে সকলকেই রাজ্য দান করেন। চন্দ্রকে গ্রহ, নক্ষত্র, বিপ্র, নানাবিধ লতা, যজ্ঞ ও তপস্যার রাজ্য দেন। কুবেরকে রাজাদের, বরুণকে জলের, বিষ্ণুকে আদিত্যদের এবং পাবককে বসুদের রাজ্য প্রদান করেন। দক্ষকে প্রজাপতিদের, ইন্দ্রকে মরুৎগণের ও প্রহ্লাদকে দৈত্য দানবদের অধিপতি করেন এবং ধর্মরাজ যমকে পিতৃগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ঐরাবতকে হাতীদের, গরুড়কে পক্ষীদের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বদের, বৃষভকে

গরুদের, শেষকে নাগদের, সিংহকে পশুদের, বটবৃক্ষকে বনস্পতিদের আধিপত্য দেন এবং ইন্দ্রকে করেন দেবতাদের রাজা। এই ভাবে রাজ্য বিভাগ করে দিকপালদের সব দিকে স্থাপন করেন। বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র সুধন্বাকে পূর্ব দিকে, কর্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদ রাজাকে দক্ষিণ দিকে, রজের পুত্র কেতুমান রাজাকে পশ্চিম দিকে এবং পর্জন্য প্রজাপতির পুত্র দুর্ধর্ষ রাজা হিরণ্যরোমাকে উত্তর দিকে অভিষিক্ত করেন। আজও তাঁরা এই সপ্তদ্বীপ নগর পূর্ণ পৃথিবীকে ধর্মানুসারে পরিপালন করছেন। এঁরা এবং অন্য যে সব রাজারা পালন কার্যে প্রবৃত্ত আছেন, তাঁরা সকলেই বিষ্ণুর বিভূতি স্বরূপ এবং বিষ্ণুর অংশ বা অংশসম্ভূত। পালন কার্যে প্রবৃত্ত হরি ভিন্ন অন্য কারও পালনের সামর্থ্য নেই। বিষ্ণুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে আশ্রয় করে সৃষ্টি বিষয়ে সৃজন, স্থিতি বিষয়ে পালন ও প্রলয়কালে সংহার করেন।

তারপরে পরাশর বিষ্ণুর চার প্রকার বিভূতির বর্ণনা করেন।

প্রথমাংশ সমাপ্ত

দ্বিতীয়াংশ

প্রিয়ব্রতের বংশ ও সপ্তদ্বীপের বর্ণনা

মৈত্রেয় বললেন, স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্রের মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের কথা আপনি বলেছেন, প্রিয়ব্রতের সন্তানদের কথাও আপনি বলুন।

পরাশর বললেন, প্রিয়ব্রত কর্দমের কন্যাকে বিবাহ করেন তাঁদের দুটি কন্যা ও দশটি পুত্র জন্মে। কন্যাদের নাম সম্রাট ও কুক্ষী এবং পুত্রদের নাম অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান, দ্যুতিমান, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবল, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান। মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র জাতিস্মর ছিলেন এবং রাজ্যভোগে মনোযোগ না দিয়ে যোগপরায় হন। বাকি সাত পুত্রকে প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপ বিভাগ করে দেন অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ, মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপ, বপুষ্মানকে শাল্মলী দ্বীপ, জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপ, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ভব্যকে শাকদ্বী এবং সবলকে পুষ্কর দ্বীপ দিয়েছিলেন। জম্বুদ্বীপের রাজা অগ্নীধ্রের নয় পুত্র হয়। তাদের নাম নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, যষ্ঠ, হিরণ্বান, কুরু ও ভদ্রাশ্ব। পরে কেতুমান নামে আর একজন রাজাও জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নীধ্র নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ বা হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ দান করেন, কিম্পুরুষকে দেন হেমকুটবর্ষ হরিবর্ষকে নৈষধবর্ষ, ইলাবৃতকে মেরুর চতুর্দিকে ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকে নীলাচলের আশ্রিতবর্ষ, হিরণ্বানকে তার উত্তরে শ্বেতবর্ষ, কুরুকে শৃঙ্গবান পর্বতের উত্তরস্থ শৃঙ্গবদবর্ষ, ভদ্রাশ্বকে মেরুর পূর্বভাগের বর্ষ এবং কেতুমানকে গন্ধমাদনবর্ষ দান করেন। এই ভাবে পুত্রদে সকল বর্ষে অভিষিক্ত করে রাজা অগ্নীধ্র শালগ্রাম তীর্থে গমন করেন

ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য আটটি বর্ষে বিপর্যয় ও জরা মৃত্যু ভয় নেই সেখানে ধর্ম অধর্ম এবং উত্তম মধ্যম ও অধম নেই। বিনা যত্নেই সেখানে সুখ ভোগ হয়। হিমবর্ষে নাভির পুত্রেব নাম ছিল ঋষভ

ঋষভের শতপুত্র জন্মে, ভরত তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। ঋষভ জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বাণপ্রস্থের বিধানে পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়ে তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় শুষ্ক ও কৃশ হয়ে নগ্ন অবস্থায় মুখে এক খণ্ড পাথর নিয়ে মহাপ্রস্থানে গমন করেন। ঋষভ বাণপ্রস্থে যাবার সময়ে তাঁর রাজ্য ভরতকে দিয়ে যান বলে হিমবর্ষের নাম ভারতবর্ষ হয়।

এর পরে পরাশর ভরত বংশের ।ববরণ দিয়ে বললেন, বরাহ কল্পে স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরে প্রিয়ব্রতের বংশধরেরা রাজা হয়েছিলেন। তারপর স্বারোচিষ মন্বন্তর থেকে উত্তানপাদের বংশধরেরা আধিপত্য করেন।

মৈত্রেয় বললেন, আপনি তো স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বর্ণনা করলেন, এইবারে আমি সমস্ত ভূমণ্ডলের কথা শুনতে চাই। যত সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, নদী, পর্বত, বন বা দেবতাদের পুরী আছে তাদের কথা এবং ভূমণ্ডলের পরিমাণ, তার আধার, উপাদান ও আকার এবং স্থিতির পরিমাণ আমাকে যথাযথ ভাবে বলুন।

পরাশর বললেন, এ সবের বিস্তৃত বিবরণ তো শত বৎসরেও বলা সম্ভব নয়, তাই আমি সংক্ষেপে বলছি। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্ত দ্বীপ লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্রে সমভাবে পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপ এ সবের মধ্যে সংস্থিত এবং তার মধ্যস্থলে কনক পর্বত মেরু। শৈলেশ মেরু যেন পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকা। তার দক্ষিণে হিমবান, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী ভারতের সীমায় বর্ষপর্বত। মেরুর দক্ষিণে প্রথম বর্ষ ভারত, তারপর কিম্পুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষ। উত্তরে রম্যক, হিরণ্ময় ও ভারতের ন্যায় উত্তর কুরুবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষ মেরুর চতুর্দিকে বিস্তৃত। তাকে বেষ্টন করে আছে চারটি পর্বত—পূর্বে মন্দর, পশ্চিমে বিপুল, উত্তরে সুপার্শ্ব ও দক্ষিণে গন্ধমাদন। এই সব পর্বতে পিপ্পল, বট, কদম ও জম্বু বৃক্ষ আছে। জম্বু বৃক্ষ বা জাম

গাছ থেকেই জম্বুদ্বীপ নাম হয়েছে। জম্বু ফলের রসেই জম্বু নদীর উৎপত্তি হয়েছে গন্ধমাদন পর্বতে। এই নদীর জলপানে জরা ও ইন্দ্রিয় ক্ষয় হয় না, মন হয় স্বচ্ছ। মেরুর পূর্বে ভদ্রাশ্ব ও পশ্চিমে কেতুমানবর্ষ, মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ।

সুমেরুর পূর্বে চৈত্ররথ বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ বন, উত্তরে নন্দন বন ও দক্ষিণে গন্ধমাদন বন। অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ ও মানস এই চারিটি সরোবর মেরুর চতুর্দিকে অবস্থিত। মেরুর উপরে ব্রহ্মার পুরী, তার চারি দিকে ও চারি কোণে ইন্দ্রাদি লোকপালদের পুরী। বিষ্ণুপাদোৎপন্না গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করে অন্তরীক্ষ থেকে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হয়েছেন, তারপর চতুর্দিকে বিভক্ত হয়েছেন। এই চারি ধারার নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। সীতা পূর্ববাহিনী হয়ে ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে, দক্ষিণবাহিনী অলকনন্দা ভারতবর্ষে এসে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়েছে, চক্ষু পশ্চিম দিকের পর্বত অতিক্রম করে কেতুমান-বর্ষের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে এবং ভদ্রা উত্তর গিরি ও উত্তর কুরু অতিক্রম করে উত্তর সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্বত উত্তর দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। মেরু তাদের মধ্যে কর্ণিকার আকারে অবস্থিত। মর্যাদা শৈলের মধ্যবর্তী ভারতবর্ষ, কেতুমানবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কুরুবর্ষ এই পদ্মের পত্র স্বরূপ। জঠর ও দেবকুট মর্যাদা পর্বত, তারা উত্তর দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। গন্ধমাদন ও কৈলাস নামের মর্যাদা পর্বত দুটি সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অবস্থিত। মেরুর পশ্চিমে নিষধ ও পারিপাত্র নামের আর দুটি মর্যাদা পর্বত পূর্ব দিকের পর্বতের ন্যায় অবস্থিত। মেরুর উত্তর দিকে ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি নামের দুই বর্ষ পর্বত পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করেছে। মেরুর চতুর্দিকে কেশর পর্বতের মধ্যে মনোরম সন্ধিস্থলে সুরম্য কানন ও পুরী আছে। সিদ্ধ চারণগণ সেখানে বাস করেন। এই সকল

স্থানেই কিন্নরদের দ্বারা সেবিত লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি ও সূর্যাদি দেবগণের আয়তন বর্ষ আছে। গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, দৈতেয় ও দানবরা এই সব পর্বত সন্ধিতে অহর্নিশ ক্রীড়া করেন। এই স্থান ভৌম বা পৃথিবীর স্বর্গ বলে পরিগণিত। এখানে ধার্মিকদেরই বাস, পাপীরা শত জন্মেও এখানে আসতে পারে না। বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিরা রূপে, কেতুমান-বর্ষে বরাহ রূপে, ভারতবর্ষে কূর্ম রূপে এবং কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে অবস্থিত আছেন। সর্বেশ্বর হরি বিশ্ব রূপে সর্বত্রই বিরাজমান।

কিম্পুরুষাদি আটটি বর্ষে শোক, শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয় নেই। প্রজারা সুস্থ, নিরাতঙ্ক, সর্বদুঃখ বিবর্জিত ও দশ বারো হাজার বছর স্থিরায়ু হয়ে জীবিত থাকে। সেখানে বারি বর্ষণের প্রয়োজন নেই। পার্থিব জলই প্রচুর আছে। সাতটি করে কুলাচল থেকে শত শত নদী প্রবাহিত হয়েছে। সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের কল্পনা সেখানে নেই।

তারপরে পরাশর ভারতবর্ষের বর্ণনা দিলেন ; বললেন, যে ভূখণ্ড সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে তার নাম ভারতবর্ষ। ভরতের সন্তানরা এখানে বাস করেন। এর বিস্তার ন হাজার যোজন। এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র নামে সাতটি কুল পর্বত আছে। এই স্থান স্বর্গ ও মোক্ষগামী পুরুষদের কর্মভূমি। এখান থেকেই তারা স্বীয় কর্মানুসারে নরকে যায় বা পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এখান থেকেই স্বর্গ, মোক্ষ, অন্তরীক্ষ ও পাতালে যাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের নটি ভাগ আছে। তাদের নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম, গন্ধর্ব, বারুণ ও একটি সমুদ্র পরিবৃত দ্বীপ। এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে এক হাজার যোজন দীর্ঘ। ইহার পূর্ব দিকে কিরাত, পশ্চিমে যবন ও মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের বাস। এই চতুর্বর্ণ যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্যাদি কর্মে নিরত।

শতদ্রু ও চন্দ্রভাগাদি নদী হিমালয়ের মূলদেশ থেকে, বেদ-স্মৃতি প্রভৃতি কতগুলি নদী পারিপাত্র পর্বত থেকে, নর্মদা ও সুরসাদি নদী বিন্ধ্যাচল থেকে, তাপী পয়োষতী নির্বিন্ধ্যা প্রভৃতি নদী ঋক্ষ পর্বত থেকে, গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদী সহ্য পর্বত থেকে, কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী প্রভৃতি নদী মলয় পর্বত থেকে, ত্রিসামা আচার্য কুল্যাদি নদী মহেন্দ্র পর্বত থেকে এবং ঋষিকুল্যা ও কুমারী প্রভৃতি নদী শুক্তিমান পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এদের বহু শাখা নদী ও উপনদী আছে। কুরু পাঞ্চালবাসী, মধ্যদেশ ও পূর্ব দেশবাসী, কামরূপবাসী, পুণ্ড্র কলিঙ্গ মগধ ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী, অপরান্ত সৌরাষ্ট্র শূর আভীর অর্বুদ কারূষ মালব ও পারিপাত্রবাসী, সৌবীর সৈন্ধব হূণ শাল্ব ও শাকলবাসী, মদ্র আরাম অম্বষ্ঠ ও পারসীকরা এই সমস্ত নদীর তীরে বাস করে।

এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ আছে; আর কোথাও ধর্মের এমন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। মুনিরা এখানে তপস্যা করেন, যাজ্ঞিকরা যজ্ঞ করেন এবং এখানকার মানুষ পরলোকের জন্য সাদরে দান করে। শুধু জম্বুদ্বীপেই মানুষ বিষ্ণুর পূজা করে। অন্য দ্বীপে চন্দ্র সূর্যের পূজা। আবার এই জম্বু দ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, তার কারণ এটি কর্মভূমি ও অন্য স্থান ভোগভূমি। বহু সহস্র বর্ষের পুণ্য বলে জীব ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। দেবতারাও বলেন যে যারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে তারা ধন্য, তারা দেবতাদেরও অধিক।

পরাশর বললেন, লক্ষ যোজন বিস্তৃত লবণ সমুদ্র জম্বুদ্বীপকে বলয়াকারে বেষ্টন করে আছে। এর বিস্তার লক্ষ যোজন। প্লক্ষ দ্বীপ এর দ্বিগুণ এবং এই দ্বীপও বেষ্টন করে আছে লবণ সমুদ্র। এই দ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির সাত পুত্র। তাদের নামানুসারে সেখানে শান্তভয়বর্ষ, শিশিরবর্ষ, সুখোদয়বর্ষ, আনন্দবর্ষ, শিববর্ষ, ক্ষেমকবর্ষ ও ধ্রুববর্ষ নামে সাতটি বর্ষ। সাতটি বর্ষ পর্বত ও সাতটি সমুদ্র-

গামিনী নদী আছে। পর্বতোপরি জনপদে দেবতা ও গন্ধর্বদের সঙ্গে নিষ্পাপ প্রজাদের বাস। সেখানে আধিব্যাধি নেই এবং সর্বদাই সুখ। লোকের আয়ু সেখানে পাঁচ হাজার বছর। সর্বদাই ত্রেতা যুগের ন্যায় অবস্থা। সেখানে একটি প্লক্ষ বা পাকুড় গাছ আছে, তার থেকেই দ্বীপের নাম প্লক্ষদ্বীপ হয়েছে। ইক্ষু সমুদ্রে এই দ্বীপ সমাবৃত।

শাল্মল দ্বীপের রাজা বপুষ্মান। তাঁর সাতটি পুত্রের নামে সাতটি বর্ষ আছে। সেখানেও সাতটি বর্ষ পর্বত ও সাতটি নদী আছে। এই দ্বীপে কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ লোকের বাস। দেবতারা নিকটে থাকেন এবং যাজ্ঞিকরা বিষ্ণুর পূজা করেন। সেখানে একটি শাল্মলী বা শিমুল গাছ আছে। এই বৃক্ষের নামেই দ্বীপের নাম। দ্বীপটি সুরা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত।

কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্রের নামে সাতটি বর্ষ আছে। সেখানে দৈতেয় ও দানবদের সঙ্গে মানুষ এবং দেব গন্ধর্ব যক্ষ ও কিম্পুরুষাদি বাস করে। সেখানেও সাতটি বর্ষ পর্বত ও সাতটি নদী আছে, ক্ষুদ্র পর্বত ও নদী আরও অনেক আছে। এই দ্বীপে একটি কুশস্তম্ব বা কুশের গুচ্ছ আছে বলে দ্বীপের নাম হয়েছে কুশদ্বীপ। এই দ্বীপ ঘৃত সমুদ্রে সমাবৃত।

ক্রৌঞ্চ দ্বীপে দ্যুতিমানের সাতটি পুত্রের নামে সাতটি বর্ষ। সেখানেও সাতটি বর্ষ পর্বত, সাতটি নদী ও অনেক ক্ষুদ্র নদী আছে। সেই সব বর্ষ ও পর্বতে প্রজারা দেবতাদের সঙ্গে বাস করে ও বিষ্ণুর পূজা করে। এই দ্বীপ দধি-মণ্ডোদক সমুদ্রে আবৃত।

শাকদ্বীপের রাজা ভব্যের সাত পুত্রের নামে সাতটি বর্ষ ও বর্ষ বিভাগকারী সাতটি পর্বত আছে। একটি শাক বৃক্ষ বা সেগুন গাছের নামে এই দ্বীপের নাম। সাতটি প্রধান নদী ও আরও অনেক ক্ষুদ্র নদী ও পর্বত আছে। এখানে ধর্মহানি ও পরস্পর কলহ নেই। লোকে বিষ্ণুর পূজা করে। এই দ্বীপ ক্ষার সমুদ্রে বেষ্টিত।

পুষ্কর দ্বীপে সবলের দুই পুত্রের নামে মহাবীরবর্ষ ও ধাতকীখণ্ড একটি মাত্র বর্ষ পর্বতে বিভক্ত। এখানে উত্তম অধম নেই, বধ্য ও ঘাতক নেই, ঈর্ষা ভয় লোভ নেই। মানুষের আয়ু এখানে দশ হাজার বছর! দেবতা ও মানুষ এখানে তুল্যবেশ ও এক রূপ। এই স্থান ভৌম স্বর্গ। এখানে ব্রহ্মার একটি বটবৃক্ষ আছে, তাতে তিনি সুরাসুরের পূজা পান। স্বাদূদক সমুদ্র এই দ্বীপ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করে আছে।

পরাশর বললেন, এই ভাবেই সপ্ত দ্বীপ সপ্ত সমুদ্রে বেষ্টিত। দ্বীপ ও তার পরবর্তী সমুদ্র সমান এবং পরবর্তী দ্বীপ ও সমুদ্র পূর্বের দ্বিগুণ। সমুদ্রের জল সর্বদা সমান থাকে। স্থালী স্থিত জল আগুনের উত্তাপে যেমন স্ফীত হয়, তেমনি চন্দ্রের বৃদ্ধিতে সমুদ্রের জলও উদ্রিক্ত হয়। স্বাদূদক সমুদ্রের পরে দ্বিগুণ পরিমিত অলোক-সংস্থিতি এবং সর্বজন্তু বিবর্জিত কাঞ্চনী ভূমি দেখতে পাওয়া যায়। তার পরেই লোকালোক পর্বত। গাঢ় অন্ধকার সেই পর্বতকে আবৃত করে আছে। অন্ধকারও অণ্ড কটাহে পরিবেষ্টিত। তার মধ্যবর্তী দ্বীপ সমুদ্র ও পর্বত নিয়ে এই পৃথিবী পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত। এই পৃথিবীই জগতের ধাত্রী, বিধাত্রী ও আধারভূতা।

সপ্ত পাতালের বিবরণ

পরাশর বললেন, অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও সপ্তম পাতাল নামে পাতালের সংখ্যা সাতটি। এখানে দৈতেয়, দানব, যক্ষ ও নাগেরা বাস করে। দেবর্ষি নারদ সমস্ত পাতাল ভ্রমণ করে এসে দেবতাদের বলেছিলেন যে তা স্বর্গের চেয়েও রমণীয়। সেখানে অনেক মণি আছে, নাগেরা সেই মণি ধারণ করে। দৈত্য ও দানব কন্যাদের দেখে বিরাগী ব্যক্তিরও আনন্দ হয়। সেখানে সূর্যের রশ্মির প্রভা আছে, নেই উত্তাপ। চন্দ্রের কিরণে আলো আছে, কিন্তু শীত নেই। পান ভোজনে আনন্দিত থেকে

কালের গতি বোঝা যায় না। নদী বন সরোবর ও কোকিলের আলাপের মতো অনেক মনোজ্ঞ আকর্ষণ আছে। রমণীয় ভূষণ, সুগন্ধ অনুলেপন, বীণা বেণু মৃদঙ্গ ও তূর্যের স্বর, পাতালবাসীরা এই সব ভোগ করে।

এই সমস্ত পাতালের অধোভাগে বিষ্ণুর তামসী তনু শেষ আছেন। তিনি সহস্র শির, জগতের হিতের জন্য তিনি সহস্র ফণা বিস্তার করে মুকুটের ন্যায় এই ক্ষিতিমণ্ডলকে মাথায় ধারণ করে আছেন। তাঁর গুণের অন্ত জানা যায় না বলে এই নাগশ্রেষ্ঠ শেষ অনন্ত নামে খ্যাত।

নরকের বর্ণনা

পরাশর বললেন, পৃথিবী ও জলের নিম্ন ভাগে যে নরক আছে, পাপীরা তাতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সব নরকের নাম রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্ত কুম্ভ, শ্বসন, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরিণী, ক্রিমীশ, ক্রিমি-ভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ, দারুণ, পাপ, পূয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তম, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ, অপর, অবীচি ইত্যাদি। এই সব ঘোর নরকে যমের অধিকার। কূটসাক্ষী, পক্ষপাত দোষ ও মিথ্যা ভাষণের জন্য লোক রৌরব নরকে যায়। ভ্রূণহত্যাকারী, পুরহরণকারী ও গোঘাতকরা যায় রোধ নরকে, এখানে শ্বাসরোধ হয়। সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণচোর ও এদের সঙ্গে সংসর্গকারীরা শূকর নরকে যায়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হন্তা তাল নরকে এবং গুরুপত্নীগামী তপ্ত কুণ্ড নরকে গমন করে। তপ্ত লৌহ নরকে যায় ভগিনীগামী, স্ত্রী-বিক্রয়ী, রাজদূত হত্যাকারী, কারারক্ষক ও অশ্ব বিক্রেতা। পুত্রবধূ ও কন্যা গমনে মহাজ্বাল নরকে স্থান। এ ছাড়া অগম্যা গমন, গুরুজনের অবমাননা, বেদ নিন্দা ও বেদ বিক্রয়ের জন্য লবণ নরকে যেতে হয়। চোরের জন্য বিমোহন নরক। শিষ্টাচার নিন্দক, বেদ

ব্রাহ্মণ ও পিতৃদ্বেষ্টা ও যে রত্ন দূষিত করে, তারা যায় কৃমিভক্ষ নরকে এবং ক্রিমীশ নরকে যায় অভিচারকারী। পিতা দেবতা ও অতিথির আগে নিজে আহার করলে লালভক্ষ নরকে যেতে হয়। বাণ নির্মাণকারী যায় বেধক নরকে এবং কর্ণি ও খড়গ নির্মাণকারী বিশসন নরকে যায়। অসৎ প্রতিগ্রাহী, অযাজ্যযাজক ও নক্ষত্রগণকদের জন্য অধোমুখ নরক। মিষ্টান্নভুক ও লাক্ষা, মাংস, রস, তিল ও লবণ বিক্রেতা ব্রাহ্মণ এবং বিড়াল, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর, বরাহ ও পক্ষী পালনকারী ব্রাহ্মণ পূয়বহ নরকে গমন করে। রঙ্গোপজীবী ব্রাহ্মণ, ধীবর, উপপতির ঔরসজাত ব্যক্তির অন্নভোজী, খল, বিষদাতা, স্ত্রীর অসৎ বৃত্তিভোগী, অপর্বে পর্বকারী, গৃহদাহী, মিত্রহন্তা, শাকুনিক, গ্রাম যাজক ও সোমবিক্রেতা রুধিরান্ধ নরকে গমন করে। মধু আহরণকারী ও গ্রামহন্তা মানুষ বৈতরিণী নরকে যায়। যারা বীর্যপাত করে, ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে, সর্বদা অশুচি ও কুহকজীবী, তারা কৃষ্ণ নরকে যায়। বৃথা বনচ্ছেদনে অসিপত্রবন নরকে যেতে হয়। মেষোপজীবী ও মৃগব্যাধ এবং মৃৎভাণ্ডে অগ্নিপ্রদানকারী বহ্নিজ্বাল নরকে যায়। অন্যান্য নরক ভোগের পরেও যদি কোন পাপীর পাপ অবশিষ্ট থাকে, তবে তাকেও এই নরকে যেতে হয়। ব্রত লোপ করলে বা আশ্রয়-ভ্রষ্ট হলে তার সন্দংশ নরক ভোগ। যে ব্রহ্মচারীর দিবানিদ্রায় বীর্যপাত হয় বা যে পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, তার জন্য শ্বভোজন নরক।

এই রকম আরও অনেক নরক আছে এবং পাপও আরও বহু রকমের আছে। সেই সব নরকে মানুষ পাপের ফল ভোগ করে। নরকের পাপীরা অধোমস্তকে স্বর্গের দেবতাদের দেখতে পায় এবং স্বর্গের দেবতারাও নরকের অধোমুখ পাপীদের দেখতে পান। নরক ভোগের পর পাপীরা যথাক্রমে স্থাবর, তরুলতা গুল্ম, কৃমি, জলজ, পক্ষী, পশু, মানুষ, ধার্মিক, দেবতা এবং পুণ্য বিশেষে মুমুক্ষু হয়ে জন্মগ্রহণ করে। পাপীরা যেমন নরক ভোগের পর পাপক্ষয়ে দেবত্ব

লাভ করে, তেমনি স্বর্গবাসীও পুণ্যক্ষয়ে পাপ বশত নরকস্থ হন। পাপীর মধ্যেও প্রায়শ্চিত্তবিমুখ লোকই নরকে যায়। মনু প্রভৃতি অনেকেই পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছেন। প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে বিষ্ণুর অনুসরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। পাপ কার্যের পর যার মনে অনুতাপ জন্মে, মন্বাদির বিধানে তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত থাকলেও হরিকে স্মরণই পরম প্রায়শ্চিত্ত। অনুতপ্ত না হলেও হরির স্মরণে পাপ বিনষ্ট হয়।

সূর্যাদি গ্রহ ও সপ্তলোকের সংস্থান

মৈত্রেয় বললেন, আপনি আমাকে অখিল ভূতলের কথা বললেন, এবারে আমি ভুবর্লোকাদি সমস্ত লোকের কথা শুনতে চাই।

পরাশর বললেন, চন্দ্র সূর্যের কিরণে যত দূর আলোকিত হয়, তত দূর স্থানের নাম পৃথিবী। ভুবর্লোকের পরিমণ্ডল পৃথিবীর সমান। ভূমি থেকে লক্ষ যোজন দূরে সূর্যমণ্ডল। সেখান থেকে লক্ষ যোজন ব্যবধানে চন্দ্রমণ্ডল। আরও লক্ষ যোজন উপরিভাগে নক্ষত্র মণ্ডল। সেখান থেকে প্রতি দু লক্ষ যোজন উপরে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। সেখান থেকে প্রতি এক লক্ষ যোজন দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও জ্যোতিশ্চক্রের নাভিস্বরূপ ধ্রুব। ভারতবর্ষে যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, এই ত্রৈলোক্য সেই যজ্ঞের ফল ভোগের ভূমি। ভৃগু প্রভৃতি কল্পবাসীগণ যেখানে বাস করেন, সেই মহর্লোক ধ্রুবলোক থেকে এক কোটি যোজন ঊর্ধ্বে। দু কোটি যোজন ঊর্ধ্বে জনলোক, সেখানে বাস করেন ব্রহ্মার সনন্দনাদি পুত্ররা। এই জনলোক থেকে আট কোটি যোজন ঊর্ধ্বে তপোলোক। সেখানে বৈরাজ নামে দেবতাদের বাস। সত্যলোক জনলোক থেকে বারো কোটি যোজন ঊর্ধ্বে। সেই লোকই ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠ নামে পরিচিত। সেখানে মৃত্যু নেই।

পরাশর বললেন, যত দূর পাদগম্য অর্থাৎ যে পর্যন্ত পদ সঞ্চার

সম্ভব, তত দূর পর্যন্ত ভূর্লোক। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী স্থান ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক সূর্য ও ধ্রুবের মধ্যবর্তী স্থানের নাম। ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোক কৃতক এবং এর পরের জন তপঃ ও সত্য এই তিন লোক অকৃতক নামে অভিহিত। প্রথম তিনটির প্রতি কল্পে সৃষ্টি হয়। কৃতক ও অকৃতকের মধ্যবর্তী মহর্লোককে বলে কৃত্যাকৃতক। কারণ কল্পান্তে এই লোক জ্ঞানশূন্য হয়, কিন্তু বিনষ্ট হয় না।

সূর্যের রথচক্রে পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই ত্রিনাভি, সংবৎসর পরিবৎসরাদি পাঁচ অর এবং বসন্তাদি ছয় নেমি। এই অক্ষয় সংবৎসরময় চক্রে কালচক্র ও জ্যোতিশ্চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ ও পংক্তি, এই সাতটি ছন্দ রথের সপ্তাশ্ব রূপে কথিত। মানসোত্তর শৈলে পূর্ব দিকে ইন্দ্রের পুরী বস্বোকসারা, দক্ষিণে যমের পুরী সংযমণী, পশ্চিমে বরুণের পুরী সুখা এবং উত্তরে সোমের পুরী বিভাবরী। সূর্য দক্ষিণায়নে এই সব পুরীতে প্রবিষ্ট হয়ে ক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় ত্বরায় গমন করেন। সূর্যই অহোরাত্র ব্যবস্থার কারণ। তাঁর উদয়-অস্ত নেই, তাঁর দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত। সুমেরুর উপরিভাগে ব্রহ্মসভা ভিন্ন অন্য সকল স্থান তিনি আলোকিত করেন। এই সুমেরু সমস্ত দিক ও সমস্ত বর্ষের উত্তরে এবং লোকালোক পর্বতের দক্ষিণে। তাই মেরুর উত্তরে নিরন্তর রাত্রি ও দক্ষিণে দিন। সূর্য উত্তরায়নে মকর রাশি থেকে কুম্ভ ও মীন রাশিতে যান। তখন অহোরাত্র সমান হয়। তারপর প্রত্যহ রাত্রি ক্ষয় হয় ও দিন বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে মেষ বৃষ অতিক্রম করে মিথুন রাশির অন্তে উত্তরায়নের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। কর্কট রাশিতে গিয়ে দক্ষিণায়ন করতে থাকেন। ত্রিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র, পনর অহোরাত্রে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই সৌর মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর। সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নক্ষত্র, এই চতুর্বিধ

মাসানুসারে বিবিধ রূপে কল্পিত সংবৎসরাদি পঞ্চক, সকল কালের অর্থাৎ মল মাসাদি নির্ণয়ের কারণ এবং এই সময় যুগ নামে সংজ্ঞা পেয়েছে। প্রথম সংবৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর ও পঞ্চম বৎসর ; এই কালের নাম এক যুগ।

সূর্য যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে, চন্দ্র তখন বিশাখার চতুর্থ ভাগে অবস্থান করেন এবং সূর্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশে, চন্দ্র তখন কৃত্তিকার প্রথম পাদে। এই কালের নাম বিষুব কাল। এই সময়ে দেবাদির মুখ দান গ্রহণের জন্য বিবৃত হয় বলে মানুষ দান করে কৃতার্থ হয়। যাগাদি কালের নির্ণয়ের জন্য অহোরাত্র, অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা ও ক্ষণাদির বিষয় জানা দরকার। পৌর্ণমাসী দুই প্রকার—রাকা ও অনুমতি ; অমাবস্যাও দুই প্রকার—সিনীবালী ও কুহু। মাঘ থেকে আষাঢ় এই ছ মাস উত্তরায়ন ও শ্রাবণ থেকে পৌষ এই ছ মাস দক্ষিণায়ন।

ধ্রুব যেখানে অবস্থিত, সেই দীপ্তিময় স্থানকে তৃতীয় বিষ্ণুপদ বলে। ধ্রুব এখানে মেধরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্য সব নক্ষত্রকে আকৃষ্ট করছে, নক্ষত্ররা মেঘ আকৃষ্ট করে, মেঘ থেকে নিবিড় বর্ষণ হয়। বর্ষণ থেকে জল। সেই বৃষ্টিতে সমস্ত লোক পুষ্ট ও তৃপ্ত হয়, দেবতাও তৃপ্ত হন। এই কারণেই এই স্থান বিষ্ণুর পরম পদ। এই বিষ্ণুপদ থেকেই সর্বপাপহরা গঙ্গার উৎপত্তি।

জগতের একমাত্র আধার হলেন সূর্য। তিনি আট মাস তাঁর কিরণ দিয়ে ষড়্‌রসাত্মক জল গ্রহণ করে পরবর্তী চার মাসে তা বর্ষণ করেন। সেই বৃষ্টিতে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নেই জগৎ রক্ষিত।

একশো আশি মণ্ডল ব্যাপী সূর্যের গন্তব্য পথে প্রতি মাসে তাঁর রথে ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ ও রাক্ষসরা অধিষ্ঠান করে থাকেন। ঋষিরা সূর্যের স্তব করেন, গন্ধর্বরা গান ও অপ্সরারা নৃত্য করেন এবং যক্ষরা অশ্বের রজ্জু ধারণ করেন।

জগতের স্থিতি ও পালনের জন্য বিষ্ণু তাঁর ঋক্-যজুঃ-সাম এই

ত্রয়ী রূপা শক্তিতে সূর্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করছেন। ঋক পূর্বাহ্ণে, যজুঃ মধ্যাহ্ণে ও সাম সায়াহ্ণে তাপ প্রদান করেন।

পরাশর বললেন, চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র, তার দক্ষিণে ও বামে কুন্দ ফুলের মতো শুভ্র দশটি অশ্ব যুক্ত। চন্দ্র এই রথে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রে বিচরণ করেন। কৃষ্ণ প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে অর্ধ মাসে দেবতারা চন্দ্রের সুধা পান করেন। তারপর শুক্ল প্রতিপদ থেকে দীপ্তিমান সূর্য তাঁর নিজের রশ্মিতে আপূরিত করেন।

এই রকম বুধের রথ বায়ু-অগ্নি সম্পাদিত আট অশ্বযুক্ত, শুক্র ও মঙ্গলের রথ অতি প্রকাণ্ড। আট অশ্বযুক্ত কাঞ্চন রথে বৃহস্পতি অবস্থান করেন। বিচিত্র বর্ণের অশ্বযুক্ত রথে মন্দগামী শনি ধীরে ধীরে গমন করেন। রাহুর ধূসর বর্ণ রথে আটটি অশ্ব। চন্দ্র পর্বে তিনি সূর্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চন্দ্রে যান এবং সৌর পর্বে চন্দ্র থেকে বেরিয়ে সূর্যে গমন করেন। বায়ুবেগশালী আটটি অশ্ব কেতুর রথ বহন করছে। তারা ধূম্রবর্ণ, মাঝে মাঝে লাক্ষারসের ন্যায় অরুণাভ। এই সব রথ বায়ুর রজ্জুতে ধ্রুব নক্ষত্রে আবদ্ধ। সকলেই অতি বেগে পরিভ্রমণ করছে।

জড় ভরতের উপাখ্যান

মৈত্রেয় বললেন, আমি শুনেছি যে রাজা ভরত শালগ্রাম নামে পুণ্য দেশে অবিরত হরি ধ্যানে যোগযুক্ত থেকেও মুক্তিলাভ করেনি, তার কারণ আমার জানতে ইচ্ছা করে।

পরাশর বললেন, সাত্যই, রাজার বিষ্ণু চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ছিল না এবং পূজার জন্য কুশ সমিধ ও পুষ্প আহরণ ভিন্ন অন্য কর্ম ছিল না। :একদিন রাজা নদীতে স্নানান্তে কর্তব্যকর্ম করছিলেন, এমন সময়ে একটি আসন্নপ্রসবা হরিণী তৃষ্ণার্ত হয়ে বন থেকে জলপান করতে এল। এই সময়ে একটি সিংহের ডাক শুনে হরিণী ভয়ার্ত হয়ে এক লাফে উঁচু তীরে উঠবার চেষ্টা করতেই পড়ে গিয়ে তার

গর্ভপাত হল। মৃগশিশুটি নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে দেখে রাজা তাকে তুলে নিলেন এবং হরিণী প্রাণত্যাগ করেছে দেখে মৃগশিশুটি তিনি নিজের আশ্রমে এনে পালন করতে লাগলেন। ক্রমে এই মৃগশিশুটির প্রতি মমতায় রাজা অন্য সব চিন্তা ভুলে গেলেন। আশ্রমের বাহিরে গিয়ে ফিরতে দেরী হলে তাঁর নানা দুশ্চিন্তা হত। রাজা ভরত তাঁর রাজ্য পুত্র ও বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করেও এই মৃগশিশুর আসক্তিতে সমাধিচ্যুত হলেন এবং পুত্র যেমন সাশ্রুনয়নে তাকিয়ে থাকে তেমনি করে তাকিয়ে থাকা মৃগশিশুর দিকে চেয়েই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অন্য কোন চিন্তা তাঁর মনে আসে নি।

তারপর কালঞ্জর পর্বতের জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগ রূপে তাঁর পুনর্জন্ম হল। কিন্তু পূর্বজন্মের বিষয়ে তাঁর সমস্ত জানা ছিল বলে ভরত মৃগ মাতাকে পরিত্যাগ করে শালগ্রামে গিয়ে শুষ্ক তৃণ-পত্রে জীবনধারণ করে যথাসময়ে মুক্তি পেলেন। তারপর ব্রাহ্মণ কুলে আবার জাতিস্মর হয়ে জন্মালেন। সকল শাস্ত্রের অর্থ তিনি জানতেন, প্রকৃতির চেয়ে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। ব্রাহ্মণ ও দেবাদিকে নিজের থেকে অভিন্ন দেখতে লাগলেন। কিন্তু উপনয়নের পরেও তিনি বেদ পাঠ করলেন না, কোন শাস্ত্র গ্রহণ ও কর্ম দর্শন করতেন না। অনেক প্রশ্ন করলে তিনি জড়ের মতো অস্পষ্ট ভাবে অল্প কথায় উত্তর দিতেন, সে কথাও গ্রাম্য ও ব্যাকরণদুষ্ট হত। তাঁর দেহ ও বস্ত্র সর্বদা মলিন ও দন্ত অমার্জিত দেখে নগরবাসীরা তাঁকে অপমান করত। সম্মান যোগের বিঘ্ন এবং মানুষ যাতে অবমাননা করে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে না আসে, এই সার বাক্য স্মরণ করে তিনি সর্বদা নিজেকে জড় ও উন্মত্তের মতো আচরণ করতেন। কোন রকমে কাল কাটাবার জন্য যা সামনে পেতেন তাই খেতেন। এই ভাবে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে ভাই ভ্রাতুষ্পুত্র ও বান্ধবেরা তাঁকে কদন্ন দিয়ে কৃষিকর্মাদি করাতে লাগল। তাঁর শরীর ছিল বৃষভের মতো স্থূল এবং কাজকর্মে জড়ের ন্যায় আচরণ করতেন। লোকে

তাই আহারমাত্র দিয়ে তাঁকে দিয়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয় কর্ম করিয়ে নিত।

তাঁকে এই রকম দেখে সৌবীর রাজ্যের সারথি ভাবল যে এই পাত্রকে দিয়ে বিনা মূল্যে কাজ করানো যাবে। একদিন সৌবীর রাজ্যের শিবিকায় আরোহণ করে ইক্ষুমতী নদীর তীরে কপিল ঋষির আশ্রমে যাবার ইচ্ছে হল। এই দুঃখের সংসারে মানুষের কী শ্রেয়. মোক্ষ-ধর্মজ্ঞ ঋষি কপিলের কাছে তাই তিনি জানতে চাইছিলেন। সারথির কথায় ভরতও অন্যান্য শিবিকা-বহনকারীর সঙ্গে বিনা মূল্যে শিবিকা বহন করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর জড় গতির জন্য শিবিকার বিষম গতি লক্ষ্য করে সৌবীর রাজ বললেন, এ কী হচ্ছে? তোমরা সবাই সমান ভাবে চল। কিন্তু সে কথায় কোন ফল না হলে শিবিকা-বাহকরা ভরতকে দেখিয়ে বলল, এই লোকটি ধীরে চলছে বলে এই রকম হচ্ছে। এই কথা শুনে রাজা বললেন, তুমি তো অল্প পথ আমার শিবিকা বহন করেছ! তবে কেন এ রকম শ্রান্ত হলে? তোমাকে তো বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখছি, তুমি কি আয়াস সহ্য করতে পার না? ভরত বললেন, আমি তো স্থূল নই, আর আপনার শিবিকাও বহন করছি না যে শ্রান্ত হব। রাজা বললেন, কী আশ্চর্য! আমি তোমাকে স্থূল দেখছি, আর আমার শিবিকা তোমার স্কন্ধেই আছে। ভার বহনে শ্রম তো হবেই। তবে তুমি বিপরীত কথা বলছ কেন? ভরত বললেন, আপনি যে বললেন আমি শিবিকা বহন করছি এবং আপনি শিবিকার উপরে আছেন, এ কথা মিথ্যা। আমার পা দুটো আছে মাটিতে, তার উপরে জঙ্ঘা উরু ও উদর, উদরের উপরে বক্ষ বাহু ও স্কন্ধ। শিবিকা আছে স্কন্ধের উপরে। তবে আপনি আমার উপরে ভার দিচ্ছেন কেমন করে! আর আপনার শরীরই শিবিকায় আছে, আপনি তো নেই। আপনার কথা তাহলে মিথ্যা হল না কি? আসলে আপনি আমি এবং সকল জীবকেই বহন করছে পঞ্চভূত। আর এই পঞ্চভূতও ত্রিগুণ প্রবাহে পড়ে কালসাগরে

বয়ে যাচ্ছে। গুণত্রয়ও আবার কর্মের অধীন, সেই কর্ম সঞ্চিত ও সকল জীবে বর্তমান। তারপরে ভরত আত্মা ও শরীর বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে মৌনী হতেই রাজা শিবিকা থেকে নেমে ভরতের পা ধরে বললেন, আপনি শিবিকা ছেড়ে আপনার নিজের পরিচয় দিন। কিন্তু ভরত আত্মতত্ত্ব বুঝিয়ে বললেন যে আমি শব্দটি অন্যের থেকে পৃথক নয়।

রাজা বললেন, আমি শ্রেয় ও পরমার্থ কী তা জানবার জন্য কপিল মুনির কাছে যাচ্ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে যে আপনিই সেই মহর্ষি। আমি আপনাকে প্রণাম করছি। যা শ্রেয় তা আমাকে বলুন। ভরত বললেন, শ্রেয় ও পরমার্থ অশেষ প্রকার। যে মানুষ দেবতার আরাধনা করে ধন পুত্র বা রাজ্য চায়, তার কাছে তাই শ্রেয়। কেউ সঙ্কল্পরহিত যজ্ঞাদি কর্ম, কেউ বা যজ্ঞাদির ফল স্বর্গাদিকে শ্রেয় ভাবে। আবার কেউ আত্মধ্যানই পরম শ্রেয় ভাবেন, পরমাত্মার সংযোগই পরম শ্রেয়। কিন্তু ধনাদি পরমার্থ হলে কামের জন্য লোকে ধনক্ষয় করে কেন! এই ভাবে দেখা যায় যে পুত্র বা রাজ্যও পরমার্থ নয়। যজ্ঞাদি কর্ম, স্বর্গাদি ফল অথবা আত্মধ্যানও পরমার্থ নয়। এই সব আপেক্ষিক শ্রেয় হতে পারে, কিন্তু পরমার্থ অন্য জিনিস। আত্মা অদ্বিতীয়, সর্বকালে এক রূপ, শুদ্ধ, নির্গুণ, সর্বগত, অব্যয়, জন্মবৃদ্ধি রহিত এবং প্রকৃতি থেকে পৃথক। অবিদ্যা-প্রপঞ্চ নাম-জাতি প্রভৃতির সঙ্গে তার যোগ হয় নি, হচ্ছে না, হবেও না। তিনি আত্মদেহে ও পরদেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান। এই বিশেষ জ্ঞানই পরমার্থ। দ্বৈতবাদীরা তত্ত্বদর্শী নয়। অভিন্ন ও ব্যাপক বায়ু যেমন বেণুর রন্ধ্র ভেদে ষড়্‌জাদি সংজ্ঞা পায়, তেমনি পরমাত্মাও এক এবং ভিন্ন দেহে তাঁর ভিন্ন নাম। আত্মার রূপভেদ দেহীর কর্মপ্রবৃত্তি থেকে উৎপন্ন এবং দেহাদি ভেদ অপধ্বস্ত হলে আর বহুরূপ থাকে না।

ভরত বললেন, এবারে আমি আপনাকে ঋভু ও নিদাঘের কথা

বলি। ঋভু ব্রহ্মার এক তত্ত্বজ্ঞানী পুত্র, পুলস্ত্যের পুত্র নিদাঘকে তিনি অশেষবিধ জ্ঞান দিয়েছিলেন। পরে জানতে পারেন যে তাঁর অদ্বৈত বাসনা হয় নি। পুলস্ত্য দেবিকা নদীর তীরে বীরনগর নামে যে মনোহর নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নিদাঘ তারই প্রান্তের উপবনে বাস করতেন। বহুদিন পরে ঋভু সেখানে শিষ্যকে দেখতে এলেন। নিদাঘ তাঁকে দেখতে পেয়ে অর্ঘ দিয়ে ঘরে আনলেন। ঋভু হাত পা ধুয়ে আসন গ্রহণ করলে নিদাঘ বললেন, এইবারে আহার করুন। কিন্তু ঘরে যা প্রস্তুত ছিল, ঋভুর তা পছন্দ হল না। তাঁর ইচ্ছায় নতুন করে আহার প্রস্তুত হল। তাঁর আহারের পর নিদাঘ বললেন, এইবারে আপনি তৃপ্ত হয়েছেন তো! ঋভু বললেন, ক্ষুধা থাকলেই আহারের তৃপ্তি হয়, আমার ক্ষুধা ছিল না বলে তৃপ্তি হয় নি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো দেহের ধর্ম, আমার ক্ষুধা না থাকায় আমি সর্বদাই তৃপ্ত থাকি। নিদাঘ প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার নিবাস কোথায়, এখন কোথায় যাচ্ছেন এবং এখানেই বা কেন এসেছেন? এ কথার উত্তরে ঋভু বললেন, আমি কোন স্থানে থেকে আসছি না, কোথাও যাচ্ছিও না, কোন নির্দিষ্ট স্থানে আমার স্থিতি নয়। তোমার কাছে যে মধুর অন্ন প্রার্থনা করেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে তা তোমার উত্তর শোনবার জন্য, মধুর অন্নের আস্বাদের জন্য নয়। এ কথা বুঝিয়ে বলতেই নিদাঘ ঋভুকে প্রণাম করে বললেন, আপনি যে আমার মঙ্গলের জন্য এসেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। আপনি কে তাই বলুন। ঋভু নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি তোমার আচার্য, তোমাকে প্রজ্ঞা দানের জন্য এখানে এসেছি। এই জগৎ এক এবং পরমাত্মারই স্বরূপ। এখানে কোন ভেদ জ্ঞান কোরো না। নিদাঘ তাঁর আদেশ শিরোধার্য করতেই ঋভু প্রস্থান করলেন।

ভরত বললেন, রাজা, এক হাজার বছর পর ঋভু আবার নিদাঘকে জ্ঞান দানের জন্য সেই নগরে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে বহু সেনার সঙ্গে রাজা নগরে প্রবেশ করছেন, কিন্তু নিদাঘ নগরের

বাহিরেই আছেন। ঋভু নিদাঘের নিকটে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কেন একান্তে অবস্থান করছ? নিদাঘ বললেন, রাজা নগরে প্রবেশ করছেন বলে আমি এইখানে আছি। ঋভু বললেন, এদের মধ্যে রাজা কে? নিদাঘ বললেন, যিনি হাতীর উপরে আরূঢ় তিনিই রাজা। ঋভু বললেন, এই দুই-এর মধ্যে আমি তো কোন পার্থক্য দেখছি না, এদের মধ্যে কে হাতী আর কে রাজা? নিদাঘ বললেন, যে নিচে সে হাতী আর যিনি উপরে তিনিই রাজা। ঋভু বললেন, উপরে ও নিচে শব্দে কী বোঝায় আমি তা বুঝি না, আমি যাতে বুঝতে সক্ষম হই সেই ভাবে আমাকে বোঝাও। ঋভু এই কথা বলতেই নিদাঘ সহসা তাঁর উপরে আরোহণ করে বললেন, এই উপরে আমি যেন রাজা, আর নিচে আপনি যেন হাতী। আপনাকে বোঝাবার জন্যই আমি এই দৃষ্টান্ত দেখালাম। ঋভু বললেন, তুমি যদি রাজার মতো হলে আর আমি হাতীর মতো, তাহলে বল তুমিই বা কে, আর আমিই বা কে? ঋভুর এই কথা শুনে নিদাঘ অবতীর্ণ হয়ে তাঁর পা ধরে বললেন. আপনি নিশ্চয়ই আমার আচার্য ঋভু। কেননা অদ্বৈত সংস্কারে তাঁর মন যেমন সংস্কৃত, তেমন আর কারও নয়। ঋভু বললেন, বাস্তবিকই আমি তোমার গুরু। তোমার সেবায় আদরে ছিলাম বলেই তোমাকে উপদেশ দিতে এসেছি। অদ্বৈত পরমাত্মার জ্ঞানই পরমার্থ ও সারভূত। ঋভু নিদাঘকে এই কথা বলেই প্রস্থান করলেন। আর নিদাঘ এই উপদেশের বলে অদ্বৈত ভাব প্রাপ্ত হলেন।

ভরত সৌবীর রাজকে বললেন, হে ধর্মজ্ঞ, আপনিও আত্মা রিপু ও বান্ধবে সমজ্ঞান করে সর্বগত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে মুক্ত হোন। এই উপদেশ পেয়ে রাজা পরমার্থ দর্শন করে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করলেন। ভরতও এই ব্রাহ্মণ জন্মে মোক্ষ লাভ করলেন।

দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত

তৃতীয়াংশ

মন্বন্তরের বিবরণ

মৈত্রেয় বললেন, গুরুদেব, এইবারে আপনি মন্বন্তর ও তাদের অধিপতিদের বিবরণ আমাকে বলুন।

পরাশর বললেন, বর্তমানে বৈবস্বত মনুর অধিকার। ইনি সপ্তম মনু। কল্পের আদিতে স্বায়ম্ভুব নামে প্রথম মনুর অধিকারের কথা তোমাকে বলেছি। এর পরে স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ মনুও অতীত হয়েছেন। এঁদের সময়ে যাঁরা দেবতা ইন্দ্র সপ্তর্ষি ও তাঁর বংশধর ছিলেন, তাঁদের কথাও তোমাকে বলছি। স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত নামে চারজন মনু রাজা প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তপস্যায় বিষ্ণুর আরাধনা করে নিজের বংশে এই মন্বন্তর অধিপতিদের লাভ করেন।

এর পরে পূর্বোক্ত পাঁচটি মন্বন্তরের অধিপতি, দেবতা ও সপ্তর্ষিদের নাম বলে পরাশর সপ্তম মন্বন্তরের কথা বললেন। বর্তমান মনু সূর্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব। এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা এবং পুরন্দর দেবরাজ। সপ্তর্ষি হলেন বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ। বৈবস্বত মনুর নটি পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভ, করূষ, পৃষধ্র ও বসুমান। সপ্ত মন্বন্তরে বিষ্ণু সাত মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে প্রজা রক্ষা করেছিলেন। এই মন্বন্তরে তিনি কশ্যপের পুত্র হয়ে অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর ত্রিপদে ত্রিভুবন জয় করে দেবরাজকে প্রদান করেন। প্রবেশার্থক বিশ্ ধাতু থেকে বিষ্ণু। নারায়ণের শক্তি থেকে বিশ্ব উৎপন্ন এবং সেই শক্তি বিশ্বেই প্রবিষ্ট বলে তিনি বিষ্ণু নামে অভিহিত। মনু, মনু-পুত্র, দেবতা, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি—এঁরা সকলেই বিষ্ণুর বিভূতি।

মৈত্রেয় বললেন, অতীতের সাত মন্বন্তরের কথা বলেছেন, এই বারে ভবিষ্য সাত মন্বন্তরের কথা বলুন।

পরাশর বললেন, বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞাকে সূর্য পত্নী রূপে গ্রহণ করেন। এঁদের মনু, যম ও যমী নামে তিনটি সন্তান হয়। তারপর স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা ছায়া নামে এক কন্যাকে তাঁর শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করে তপস্যার জন্য অরণ্যে যান। ছায়া দেখতে সংজ্ঞার অনুরূপ ছিলেন বলে সূর্য তাঁকে সংজ্ঞা ভাবতেন। তাঁদেরও দুটি পুত্র ও একটি কন্যা হল। তাদের নাম শনি, সাবর্ণি মনু ও তপতী। ছায়া এক দিন কুপিত হয়ে যমকে শাপ দেন। এই ঘটনায় যম ও সূর্য উভয়েই বুঝতে পারলেন যে ছায়া যমের জননী সংজ্ঞা নন, অন্য কোন নারী। ছায়া প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করলে সূর্য সমাধি দৃষ্টিতে জানতে পারলেন যে সংজ্ঞা অশ্বের রূপ ধারণ করে অরণ্যে তপস্যা করছেন। সূর্য তাই অশ্বের রূপ ধারণ করে সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়ে আরও তিনটি পুত্রের জন্ম দিলেন। তাঁদের মধ্যে দুটি অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত হল, আর তৃতীয় পুত্রের নাম হল রেবন্ত। তারপর সূর্য সংজ্ঞাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনলেন এবং বিশ্বকর্মা এসে সূর্যের তেজ প্রশমিত করলেন। তাঁকে ভ্রমি যন্ত্রে আরোপ করে তাঁর তেজ চেঁচে ফেললেন, আর সেই তেজে বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা, কার্তিকেয়র শক্তি ও অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্র নির্মাণ করে দিলেন।

ছায়ার পুত্র সাবর্ণি মনু হবেন অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি। তাঁর সময়ে দেবতা হবেন সুতপ, অমিতাভ ও মুখ্যগণ। এঁদের প্রত্যেক গণে একুশ জন দেবতা থাকবেন। আর সপ্তর্ষি হবেন দীপ্তিমান, গালব, রাম, কৃপ, অশ্বত্থামা, ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ। পাতালবাসী নিষ্পাপ অসুর বলি বিষ্ণুর কৃপায় ইন্দ্র হবেন। মনুর পুত্ররা হবেন রাজা।

পরাশর এর পরে নবম থেকে চতুর্দশ মনুর বিবরণ দিয়ে বললেন, মনুরা সত্য যুগে ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতা হন, এক মন্বন্তর দেবতারা যজ্ঞভুক হন, মনুর বংশধররা এক মন্বন্তর পৃথিবী পালন করেন। এই ভাবে চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়। তারপর এক কল্পের সমান এক রাত্রি।

সেই রাত্রিকালে ব্রহ্মারূপধর শেষ শয্যায় শয়ন করে থাকেন। জগতের রক্ষার জন্য বিষ্ণু সত্য যুগে কপিল প্রভৃতি ঋষির রূপে সত্য জ্ঞান প্রদান করেন, ত্রেতায় চক্রবর্তী স্বরূপে দুষ্টের নিগ্রহ করে ত্রিভুবন রক্ষা করেন, দ্বাপরে বেদব্যাস রূপে বেদ বিভাগ ও তাকে শত শাখায় বিস্তার করেন এবং কলির শেষে কল্কিরূপ ধারণ করে দুর্বৃত্তদের সৎ মার্গে আনয়ন করেন।

বেদব্যাস ও বেদ বিভাগ

পরাশর বললেন, অশেষ মন্বন্তরের কথা বলা হল, এই বারে আর কী বলব বল।

মৈত্রেয় বললেন, বিষ্ণু বেদব্যাস রূপে যুগে যুগে যে ভাবে বেদ বিভাগ করেছেন, এখন সেই কথা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

পরাশর বললেন, এই বৈবস্বত মন্বন্তরের সব দ্বাপর যুগেই ঋষিরা আটাশ বার বেদ বিভাগ করেছেন। এই মন্বন্তরের প্রথম দ্বাপরে স্বয়ম্ভূ স্বয়ং বেদ বিভাগ করেছিলেন। তারপর একে একে মনু, উশনা বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠাদি ঋষিরা এই কাজ করেন। বাল্মীকি নামে অভিহিত ভৃগু বংশের ঋক্ষ চব্বিশতম দ্বাপরে, তার পরবর্তী দ্বাপরে একে একে আমার পিতা শক্তি, আমি, জাতুকর্ণ এবং এই দ্বাপরে আমার পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করে বেদব্যাস হয়েছেন। ভবিষ্য দ্বাপরে দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা বেদব্যাস হবেন।

লক্ষ শ্লোক সমন্বিত চতুষ্পাদ বেদকে এক বেদ দেখে আমার পুত্র বেদব্যাস তাকে পুনরায় চার ভাগ করেন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি বেদপারগ চারজন শিষ্য গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে পৈল বৈশম্পায়ন ও জৈমিনিকে যথাক্রমে ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের শ্রাবক রূপে গ্রহণ করেন এবং চতুর্থ শিষ্য হল অথর্ব বেদজ্ঞ সুমন্ত। তারপর তিনি সূত জাতীয় রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের শিষ্য বলে গ্রহণ করেন। বেদব্যাস আবার যজুর্বেদকে চার ভাগে ভাগ করেন।

এই ভাবে বেদ উদ্ধার করে তিনি ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা ও সামবেদ সংহিতা সংকলন করেন। অথর্ব বেদে রাজাদের কর্ম ও যথারীতি ব্রহ্মত্বের ব্যবস্থা করেন। তারপর শিষ্যে প্রশিষ্যে বিস্তারিত হয়ে বহু প্রকারে বেদের সংহিতাগুলি প্রবর্তিত হয়েছে।

পরাশর বললেন, বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের সাতাশটি শাখা প্রণয়ন করেন এবং তা বহু শিষ্যকে দেন। এই শিষ্যদের মধ্যে ব্রহ্মরাত-পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য সর্বদা গুরুর সেবা করতেন। একদা ঋষিরা একত্র হয়ে নিয়ম করলেন যে তাঁদের মহামেরুস্থিত সমাজে সেদিন যে ঋষি আসবেন না, তিনি সাত রাত্রির পর ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হবেন। বৈশম্পায়ন ছাড়া আর সকলেই এই নিয়ম পালন করেন। আর সেই শাপে নিজের বালক ভাগনেকে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিহত করেন। তারপরে শিষ্যদের ডেকে বলেন, তোমরা আমার ব্রহ্মহত্যার পাপনাশক ব্রতের অনুষ্ঠান কর। এই কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, এই অল্প-তেজ ব্রাহ্মণদের ক্লেশ দেবেন কেন, আমি একাই এই ব্রত করব। গুরু বৈশম্পায়ন এই কথা শুনে রেগে বললেন, তুমি এই ব্রাহ্মণদের অবমাননা করছ! আমার আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে, সে রকম শিষ্যে আমার প্রয়োজন নেই। আমার নিকট তুমি যা অধ্যয়ন করেছ, তা পরিত্যাগ কর। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আপনাকে ভক্তি করি বলেই আমি এই কথা বলেছি। আমারও আপনার মতো গুরুর প্রয়োজন নেই। আপনার নিকট যা অধ্যয়ন করেছি তা গ্রহণ করুন। বলে যাজ্ঞবল্ক্য রুধিরাক্ত সরূপ যজুর্বেদ উদ্‌গিরণ করে দিলেন আর ব্রাহ্মণরা তিত্তিরপক্ষী রূপে তা গ্রহণ করলেন। এই জন্যই এই যজুর্বেদ শাখা তৈত্তিরীয় নামে অভিহিত।

এর পরে যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদ লাভের জন্য প্রাণায়ম পরায়ণ হয়ে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন। সূর্য অশ্বরূপে যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, তোমার বাঞ্ছিত বর চাও। যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যকে প্রণাম করে বললেন, আমার গুরুও জানেন না, এই রকম যজুর্বেদ আমাকে দিন। এই

কথা শুনে সূর্য অযাতযাম নামে যজুর্বেদ যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করেন। এরও পনরটি শাখা আছে।

পরাশর বললেন, জৈমিনির পুত্র সুমন্ত ও পৌত্র সুকর্মা সামবেদের এক এক শাখা তার কাছে অধ্যয়ন করেন। তাঁরা ঐ দুই শাখাকে নানা শাখায় বিভক্ত করে তাঁদের শিষ্যদের অধ্যয়ন করান। এই ভাবে অথর্ব বেদও সুমন্তর শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে নানা শাখায় বিভক্ত হয়।

পুরাণের নাম ও তার লক্ষণ নিরূপণ

পরাশর বললেন, পুরাণ বিশারদ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি নিয়ে পুরাণ সংহিতা রচনা করেন। সূত জাতীয় শিষ্য লোমহর্ষণকে তিনি এই পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করান। লোমহর্ষণের ছয়জন শিষ্য ছিল। তাদের নাম সুমতি, অগ্নিবর্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ণ, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ণ এঁরা তিনজন মূল সংহিতা অবলম্বন করে প্রত্যেকে একখানি করে পুরাণ সংহিতা রচনা করেন। এই তিনখানি ও মূল সংহিতার সার গ্রহণ করে আমি এই বিষ্ণুপুরাণ সংহিতা রচনা করেছি।

সকল পুরাণের আদি পুরাণের নাম ব্রাহ্মপুরাণ। পুরাণবিদ্‌রা বলেন যে পুরাণের সংখ্যা আঠারো। প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবত পুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয় পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নি পুরাণ, নবম ভবিষ্য পুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, একাদশ লিঙ্গ পুরাণ, দ্বাদশ বরাহ পুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দ পুরাণ, চতুর্দশ বামন পুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম পুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ ও অষ্টাদশ পুরাণের নাম ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। এই সমস্ত পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পাঁচটি বিষয় বর্ণিত আছে।

হে মৈত্রেয়, আমি তোমাকে যে পুরাণ বলছি, এর নাম বিষ্ণুপুরাণ।

পদ্মপুরাণের পরে এটি রচিত হয়েছে। এই পুরাণের সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তরাদিতে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র—বিদ্যা এই চতুর্দশ প্রকার। এর সঙ্গে আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ বা সঙ্গীত শাস্ত্র এবং অর্থ বা নীতিশাস্ত্র—এই চার বিদ্যা মিলিয়ে অষ্টাদশ বিদ্যা বলা হয়। ঋষিরা তিন প্রকার—ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষি। সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যা প্রকাশ করেন সেই প্রাজাপত্য শ্রুতিই নিত্য, এই সব শাখা ভেদ তার বিকল্পমাত্র।

যমগীতা

মৈত্রেয় বললেন, আয়ু শেষ হলে সকল জীব যমের বশ হয় এবং তাঁর আদেশে নরকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। কী করলে মানুষ যমের অধীন হয় না, এবারে আপনি তাই বলুন।

পরাশর বললেন, নকুল পিতামহ ভীষ্মের কাছে এই কথা জানতে চান। ভীষ্ম তাঁকে যা বলেছিলেন, তা আমার কাছে শোন। ভীষ্ম বলেছিলেন, কলিঙ্গবাসী আমার এক সখা একদিন আমার কাছে এসে বললেন যে কোন জাতিস্মর মুনিকে প্রশ্ন করে তিনি যম ও যম কিঙ্করের গোপন কথোপকথন জানতে পারেন। যম তাঁর নিজের পাশহস্ত দূতকে কানে কানে বলেছিলেন, বিষ্ণুর শরণাগতকে পরিত্যাগ কোরো। আমি বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য সব জীবের প্রভু। বিধাতা আমাকে যম নাম দিয়ে লোকের পাপ-পুণ্য বিচারের জন্য নিয়োগ করেছেন। কিন্তু আমি স্বাধীন নই; আমিও বিষ্ণুর অধীন, তিনি আমারও দণ্ড বিধানে সমর্থ। ধর্মরাজ যমের এই কথা শুনে যমদূত বলল, বিষ্ণুর ভক্ত কে, তা কীভাবে জানা যাবে? যম বললেন, যে নিজ বর্ণের ধর্ম থেকে বিচলিত হয় না, সুহৃদ ও বিপক্ষে যে সমমতি, যে হরণ ও হিংসা করে না, মন যার নির্মল, নির্জনে পরের সোনা দেখেও যে তৃণের মতো উপেক্ষা করে, আর অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করে যে

শুধু ভগবানেরই চিন্তা করে, তাকে বিষ্ণুভক্ত বলে জেনো। যার চিত্ত নির্মল, প্রশান্ত, মাৎসর্য অভিমান ও মায়ারহিত, যে বিশুদ্ধ চরিত্র, সকল জীবের মিত্র, প্রিয়বাদী ও হিতবাদী, তারই হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করেন। এ রকম মানুষ দেখলে দূর থেকেই পলায়ন কোরো। যে পরের ধন অপহরণ করে, প্রাণী হিংসা করে, মিথ্যা ও নিষ্ঠুর কথা বলে, মন যার কলুষ ও অমঙ্গল কাজে আসক্ত, পরের সম্পদ যে সইতে পারে না, সাধুর নিন্দা করে, দান বা যাগ করে না, বিষ্ণু তার হৃদয়ে বাস করেন না। যে ব্যক্তি বন্ধু, প্রিয় সুহৃদ, স্ত্রী পুত্র, কন্যা, পিতামাতা বা ভৃত্যের সঙ্গে শঠতা করে অর্থ তৃষ্ণা করে, সেই অধম কখনই বিষ্ণুভক্ত নয়। মন যার গর্হিত কাজে আসক্ত ও সর্বদা অসৎ কাজে প্রবৃত্ত, দীর্ঘকাল নীচ সংসর্গে মত্ত ও নিয়ত পাপে লিপ্ত, সেই পশু কখনও বিষ্ণুর ভক্ত নয়। কলিঙ্গবাসীর কাছে জাতিস্মর মুনির এই কাহিনী শুনে ভীষ্ম নকুলকে বলেছিলেন, এই সংসার সাগরে বিষ্ণু ভিন্ন আর কোন ত্রাণকর্তা নেই। বিষ্ণুকে যে অবলম্বন করে আছে, তার যম, যম কিঙ্কর, যম দণ্ড, যম পাশ বা যম যাতনার ভয় নেই।

পরাশর বললেন, এই যমগীতা আমি তোমাকে বললাম।

ঔর্ব-সগর সংবাদ—সদাচার বিধি

মৈত্রেয় বললেন, বিষ্ণুর আরাধনা করে মানুষ কোন্ ফল লাভ করে?

পরাশর বললেন, রাজা সগর ভৃগুবংশীয় ঋষি ঔর্বকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তোমাকে আমি তাই বলছি। বিষ্ণুর আরাধনায় ভূমি, স্বর্গ ও নির্বাণ লাভ হয়। সদাচারে স্ব-বর্ণোচিত ধর্মানুষ্ঠানকেই বিষ্ণুর আরাধনা বলে। যে পরের অপবাদ দেয় না, নিষ্ঠুর বা মিথ্যা কথা বলে না, জীবের উদ্বেগ সৃষ্টি করে না, পরপত্নী বা পরদ্রব্য হরণ এবং হিংসায় যার মতি নেই, যে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ তাড়না বা হত্যা করে না, যে দেব

দ্বিজ, ও গুরু সেবায় উদ্‌যোগী, যে নিজের পুত্রের ন্যায় সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যার মন রাগাদিদোষে দূষিত নয়, সেই বিশুদ্ধ চেতাই বিষ্ণুর আরাধনা করছে। আমাদের শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমের যে ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, তাতেই বিষ্ণুর আরাধনা হয়; অন্য প্রকারে হয় না।

সগর রাজা ঔর্বকে বলেছিলেন, আপনি আমাকে বর্ণ ধর্ম ও আশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে বলুন।

ঔর্ব বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম আমি একে একে বলছি। ব্রাহ্মণ দান যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন করবেন, নিত্য স্নান ও অগ্নি পরিগ্রহ করবেন, জীবিকার জন্য যাজন অধ্যাপনা এবং ন্যায়ত গুরুদক্ষিণা প্রতিগ্রহ করবেন। সকলের হিত সাধন ও সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে মৈত্রী ব্রাহ্মণের উত্তম ধন। পরের রত্ন তিনি প্রস্তর মনে করবেন। ক্ষত্রিয় অধ্যয়ন ও যজ্ঞ করবেন এবং ইচ্ছামতো ব্রাহ্মণকে দান করবেন। তাঁর প্রধান জীবিকা হল শস্ত্র ধারণ ও পৃথিবী রক্ষা, তার মধ্যে পৃথিবী পালনই প্রথম কল্প। রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবেন। বৈশ্য বাণিজ্য কৃষিকর্ম ও পশুপালন করবেন। অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান—এই তিনও বৈশ্যের প্রশস্ত ধর্ম। শূদ্রের কর্তব্য দ্বিজগণের সেবা। এতে আত্মপোষণ না হলে বাণিজ্য বা কারুকর্মের ব্যবসায়ে জীবিকা-নির্বাহ করা চলে। তাঁরাও যজ্ঞ এবং দান করবেন। ভৃত্যাদি ভরণের জন্য সকল বর্ণেরই অর্থ সংগ্রহ কর্তব্য। সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, ক্ষমা, নিরভিমান, শুচিতা, সত্য ও প্রিয়বাদিতা, মঙ্গল ও মৈত্রী স্পৃহা, অকার্পণ্য ও অনসূয়া—এই সমস্তই সকল বর্ণের সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু নিজ নিজ বৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ না হলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি এবং ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন; কিন্তু শূদ্রের দাস বৃত্তিতে রত হবেন না। শুধু বিপদে নিরুপায় হলেই এই বৃত্তি অবলম্বন করা যায়।

তারপর ঔর্ব সগরকে চার আশ্রমের কথা বলেছিলেন—উপনয়নের পর বালক ব্রহ্মচারী রূপে গুরুগৃহে সমাহিত চিত্তে বেদাধ্যয়ন করবে।

গুরুর শুশ্রূষা করবে, গুরুর জন্য কুশ জল ও পুষ্প আহরণ করবে, প্রাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য ও অগ্নির উপাসনা করবে এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণ করবে। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হলে সে গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবে। যথা বিধানে বিবাহ করে স্বকর্মে ধনার্জন করবে। পিণ্ডদানে পিতৃগণের, যজ্ঞে দেবতাদের, অন্নে অতিথির, স্বাধ্যায়ে মুনিদের, অপত্য দিয়ে প্রজাপতির, বলিতে সকল প্রাণীর এবং সত্য বাক্যে অখিল জগতের অর্চনা করে নিজ কর্মের দ্বারা উত্তম লোক অর্জন করবে। গৃহস্থ ভিক্ষাজীবী পরিব্রাজক ব্রহ্মচারীদের আশ্রয় বলে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণেরা বেদাহরণ, তীর্থস্নান ও পৃথিবী দর্শনের জন্য বিচরণ করেন। এঁদের অনেকেরই গৃহ বা আহারের সংস্থান নেই। সায়ং কালে তাঁরা যে গৃহে পৌছান, সে-ই তাঁদের গৃহ। গৃহস্থ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে মধুর বাক্যে আসন আহার ও শয্যার ব্যবস্থা করবেন। অতিথি ভগ্ন মনে ফিরে গেলে গৃহস্থের সঞ্চিত পুণ্য নিয়ে যান আর নিজের দুষ্কৃতির পাপ দিয়ে যান। গৃহাশ্রমে এই ভাবে কর্তব্য কর্ম করে গৃহস্থ পরিণত বয়সে পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে অথবা পুত্রের নিকটে রেখে বনে যাবেন। সেখানে কেশ-শ্মশ্রুজটাধারী হয়ে ভূমিশয্যায় শয়ন করে পর্ণমূল ফলাহার করবেন এবং চর্ম কাশ ও কুশ দিয়ে পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র প্রস্তুত করবেন। বনবাসীর ত্রিসন্ধ্যা স্নান, দেবার্চনা, হোম, অতিথিপূজা, ভিক্ষা ও বলি-প্রদান কর্তব্য। গায়ে বনজ তেল মেখে শীত গ্রীষ্ম সহ্য করে তপস্যা করতে হয়। এই ভাবে মুনিদের মতো যাঁরা বাস করেন, তাঁরা আত্ম-দোষ দগ্ধ হয়ে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। চতুর্থ আশ্রম ভিক্ষুর আশ্রম। গৃহস্থাশ্রমের পর স্ত্রী পুত্র ও সব কিছু পরিত্যাগ করে এই আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। ধর্ম অর্থ ও কামের সব অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে শত্রু মিত্র ও সকল প্রাণীর সমান মিত্র হবেন এবং সকলের সঙ্গ পবিত্যাগ করে সর্বদা যোগরত থাকবেন। গৃহস্থের আহার শেষ হবার পরে ভিক্ষাব জন্য উপস্থিত হবেন। ব্রহ্ম সত্য ও

জগৎ ব্রহ্মেরই সঙ্কল্পে রচিত—এই বিশ্বাস নিয়েই ব্রহ্মলোক জয় করবেন।

রাজা সগর মানুষের জাতকর্মাদি ক্রিয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে ঔর্ব বলেছিলেন, পুত্রের জন্ম হলে পিতৃগণকে নান্দীমুখ প্রদান করে দুজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়। দশম দিবসে নামকরণ। প্রথমে পুরুষবাচক দেবতার নাম, শেষে ব্রাহ্মণ শর্মা, ক্ষত্রিয় বর্মা, বৈশ্য গুপ্ত ও শূদ্র দাস যোগ করবে। নাম অর্থহীন, অপ্রশস্ত, অপশব্দযুক্ত, অমঙ্গলকর ও নিন্দিত হবে না; বেশি দীর্ঘ, বেশি হ্রস্ব বা বেশি যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট হবে না; সম ও মধুর অক্ষরের সুখে উচ্চার্য নাম হওয়া উচিত। তারপর পরবর্তী সংস্কার হলে গুরুগৃহে গিয়ে বিদ্যার্জনে রত হবে। পাঠ সমাপ্ত হলে গুরুদক্ষিণা দিয়ে বিবাহ করে গৃহস্থ হবে, কিংবা ব্রহ্মচারী হয়ে গুরুর সেবা অথবা বনবাসী হয়ে বা প্রব্রজ্যায় ভ্রমণ করে বেড়াবে। গৃহস্থ হতে হলে নিজের তৃতীয়াংশ বয়সের কন্যা বিবাহ করবে। যে কন্যার খুব বেশি বা খুব কম কেশ, যে খুব বেশি কৃষ্ণবর্ণ বা পিঙ্গল বর্ণ, স্বভাবত বিকলাঙ্গী বা অধিকাঙ্গী, রুগ্ন বা রোগপীড়িত, মন্দকুলজাত, দুষ্ট, কটুভাষী, বিকৃতাঙ্গী বা পুরুষাকার, যার মুখে শ্মশ্রুর চিহ্ন, গলায় ঘর্ঘর বা কাকস্বর অথবা অতি ক্ষীণস্বর, বৃত্তনয়না বা পক্ষ্মশূন্য-নেত্রা, যার জঙ্ঘা লোমশ, গুল্ফ উন্নত, হাসলে যার গালে টোল খায়, যার আকার অতি রুক্ষ, নখ পাণ্ডুবর্ণ ও চোখ রক্তবর্ণ, যার হাত-পা কিছু স্থূল, দেহ অতি খর্ব বা অতি দীর্ঘ, যার ভ্রূ-যুগল পরস্পর মিলিত, দাঁতে অনেক ছিদ্র ও মুখ করাল—এ রকম কন্যাকে বিবাহ করবে না। মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যাকেও বিবাহ করবে না। বিবাহ করবে যথা শাস্ত্র বিধি অনুসারে। এর জন্য আট প্রকার বিবাহ বিধি আছে। তাদের নাম ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্মসঙ্গত, সেই বিধি অনুসারেই বিবাহ করতে হয়।

পৈশাচিক বিবাহ অসঙ্গত। শাস্ত্র মতে বিবাহিতা সহধর্মিণী মহাফল প্রদান করেন।

রাজা সগর গৃহস্থের সদাচার সম্বন্ধে জানতে চাইলে ঔর্ব বলেছিলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্রাহ্মমুহূর্তে জাগ্রত হয়ে ধর্মের চিন্তা ও ধর্মের সঙ্গে অবিরোধী অর্থ ও কাম চিন্তা করবে। ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ; কিন্তু ধর্ম বিরুদ্ধ অর্থ ও কাম পরিত্যাজ্য। প্রত্যুষে উঠে গ্রামের নৈঋত কোণে শর-নিক্ষেপের সীমার বাহিরে মলমূত্র ত্যাগ করবে। তারপর শৌচান্তে স্নান ও তর্পণ করে গৃহদেবতা ও নিজের ইষ্টদেবতার পূজা করবে। অতিথি সেবার পর শিশু আর্ত ও আশ্রিতাদির ভোজনের পর নিজে আহার করবে। আলস্য ত্যাগ করে অনায়াসসাধ্য কাজ ও শাস্ত্রাদি আলোচনা করে দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত অতিবাহিত করবে। সূর্য অর্ধাস্তমিত হলে সায়ংসন্ধ্যা করবে। এর পর অতিথি ও সম্বলহীন ব্যক্তিকে অন্নদান করে নিজে আহার করবে। অতিথিকে শয্যা দিয়ে নিজে পা ধুয়ে পর্যঙ্কে শয়নের জন্য যাবে। স্ত্রীসঙ্গ করবে যথা নিয়মে।

অতঃপর ঔর্ব সগরকে গৃহস্থের আচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। গৃহস্থ প্রতি দিন দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধ আচার্যের পূজা করবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যাকে নমস্কার ও অগ্নিকে সেবা করবে। অচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করবে, ওষধি ও রত্ন ধারণ করবে, কেশ সুবিন্যস্ত রাখবে এবং সুগন্ধ চারু কেশের উপরে শুক্লপুষ্প ধারণ করবে। কখনও পরের জিনিস হরণ করবে না, অপ্রিয় কথা বলবে না, মিথ্যা প্রিয় কথাও বলবে না। অন্যের দোষ দেখবে না, পরের সম্পদে লোভ করবে না, কারও সঙ্গে শত্রুতাও করবে না। নিন্দিত, পতিত বা উন্মত্ত ব্যক্তি, যার অনেক শত্রু বা যে কুদেশের লোক, বেশ্যা বা বেশ্যাপতি, মিথ্যাবাদী, শঠ, অমিতব্যয়ী বা পরনিন্দাপরায়ণ মানুষ—এদের কারও সঙ্গে মিত্রতা করবে না। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করবে না, তাদের অবজ্ঞাও করবে না। তাদের

ঈর্ষা করবে না, আবার কোন বিষয়ে কর্তৃত্বও দেবে না। পাপীর প্রতি যে পাপ ব্যবহার করে না, নিষ্ঠুর কথার উত্তরে যে প্রিয় কথা বলে, যে সকল প্রাণীর বন্ধু, মুক্তি তার করতলগত। যে সর্বদা বীতরাগ ও সদাচারপরায়ণ, কাম ক্রোধ ও লোভকে যে জয় করেছে, তার অপরিসীম প্রভাব। সদা সত্য কথা বলবে, কেননা সত্য সবাব প্রীতিকর। কিন্তু সত্য বললে যদি কারও অনিষ্ট হয় তো মৌনী থাকবে। প্রিয়, যুক্তিযুক্ত ও হিতকর না হলে সত্য বলবে না। হিতবাক্য যদি নিতান্ত অপ্রিয় হয়, তবে তা বলাই শ্রেয়।

এর পরে ঔর্ব শবদাহ, সপিণ্ডীকরণ, শ্রাদ্ধফল ও পিতৃগীতার বর্ণনা করেছিলেন। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। এই জন্য সর্বপ্রকার বৃদ্ধি কার্যে, নূতন গৃহপ্রবেশ কালে, পুত্রমুখ দর্শনের সময়, তার নামকরণ, চূড়াকর্ম, সীমন্তোন্নয়ন, পুত্র কন্যার বিবাহ এবং অন্যান্য অভ্যুদয় কালে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। প্রেতকর্মের জন্য মৃত্যুর পরে মৃতদেহকে স্নান করিয়ে মালা পরিয়ে গ্রামের বাহিরে দাহ করতে হয়। অশৌচকালে প্রেতের উদ্দেশে প্রতিদিন একটি করে পিণ্ড ভূমিতে দিতে হয়। আর দিনের বেলায় একবার মাংসহীন আহার করতে হয়। মৃতের তৃপ্তির জন্য এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও সপিণ্ড জ্ঞাতিদের ভোজন করাতে হয়। অশৌচের চতুর্থ দিবসে ভস্ম ও অস্থি চয়নের নিয়ম। বালক, দেশান্তরিত বা পতিত ব্যক্তি ও মুনির মৃত্যু হলে, কিংবা কারও অপমৃত্যু বা ইচ্ছামৃত্যু হলে তা শোনার পরেই সদ্য শৌচ হওয়া যায়। অশৌচ ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়র বারো দিন, বৈশ্যের পনর দিন এবং শূদ্রের এক মাস। অশৌচান্তে আদ্য শ্রাদ্ধে অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয় এবং তাদের উচ্ছিষ্টের নিকটে কুশের উপরে মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে হয়। মৃত্যুর তিথিতে প্রতি মাসে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ করতে হয়।

কোন্ সময়ে শ্রাদ্ধ বিধেয় তা বলবার পরে ঔর্ব পিতৃগীতা বলেছিলেন। পিতৃগণ বলেছেন, বংশের কেউ যদি ধনী হয় তো সে

আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে ধনরত্ন বস্ত্র ভূমি দান ও সব রকম ভোগ্য দ্রব্য দান করবে। সে রকম ঐশ্বর্য না থাকলে ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। সে সামর্থ্যও না থাকলে ব্রাহ্মণকে আম ধান্য ও যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেবে। তাতেও অক্ষম হলে একজন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে কিছু তিল কিংবা তাদের উদ্দেশে সাত-আটটি তিল মিশ্রিত জলাঞ্জলি ভূমিতে দেবে। যদি তাও না পারে তো এক বেলার উপযোগী তৃণ গাভীকে দেবে। এতেও অসমর্থ হলে বনে গিয়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে উচ্চস্বরে পাঠ করবে, আমার ধন নেই, বিত্ত নেই, পিতৃশ্রাদ্ধের উপযোগী কোন দ্রব্য নেই, আমি পিতৃগণকে প্রণাম করছি, আমার ভক্তিতে তাঁরা তৃপ্ত হোন।

শ্রাদ্ধে এমন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে যিনি কিছু বেদাধ্যয়ন করেছেন, ঋত্বিক, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, সম্বন্ধী, পিতামাতার সেবাপরায়ণ, তপস্বী বা শিষ্য। বেদত্যাগী, গ্রাম যাজক, দেবল, বেতনভুক অধ্যাপক, মিত্রদ্রোহী, ক্লীব, কন্যাদূষক, সোমবিক্রয়ী বা পাতকী বলে সমাজে পরিচিত, চোর, খল, যে পিতামাতাকে পরিত্যাগ করেছে, বিবাহ করেছে শূদ্রাণী ও শূদ্র সন্তানের পরিপালক —শ্রাদ্ধে এই রকম ব্রাহ্মণ স্থান পেতে পারে না। শ্রাদ্ধ কালে শ্রেষ্ঠ যোগীকে নিয়োগ করা উচিত। সহস্র ব্রাহ্মণের আগে যদি একজন যোগী থাকেন, তাহলে তিনি সমস্ত ভোক্তা ও যজমানকে উদ্ধার করেন।

শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণকে হবিষ্য করালে পিতৃগণ এক মাস তৃপ্ত থাকেন, মৎস্য দিলে দু মাস, খরগোসের মাংসে তিন মাস, পাখির মাংসে চার মাস, শুয়োরের মাংসে পাঁচ মাস, ছাগ মাংসে ছ মাস, এন মৃগের মাংসে সাত মাস, রুরু মৃগের মাংসে আট মাস, গবয় মাংসে ন মাস, মেষ মাংসে দশ মাস, গো মাংসে এগার মাস তৃপ্ত থাকেন। আর বাধ্রীণস পক্ষীর মাংস দিলে তাঁরা চিরদিন পরিতৃপ্ত থাকেন। গণ্ডারের মাংস, কৃষ্ণ শাক ও মধু শ্রাদ্ধের কাজে অত্যন্ত প্রশস্ত।

গয়ায় শ্রাদ্ধ করলে জন্ম সফল হয়। এক খুর বিশিষ্ট জন্তুর দুধ, উট মৃগ মেষ ও মহিষের দুধ শ্রাদ্ধে পরিত্যাজ্য।

হিমালয়ের পাশে কলাপী উপবনে পিতৃগণ মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে গাথা গীতা বলেছিলেন। তাদের বংশে যেন এমন সন্তান জন্মে যে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করে, ভাদ্র মাসের মঘাযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে ঘৃত-মধুর পায়স প্রদান করে, যে গৌরীকন্যা বিবাহ বা বৃষোৎসর্গ করে অথবা যথাবিধি দক্ষিণা দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়।

বশিষ্ঠ-ভীষ্ম সংবাদ—নগ্ন লক্ষণ, বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ও শতধনু-শৈব্যার উপাখ্যান

মৈত্রেয় বললেন, নগ্ন কাদের বলে তা আমার জানতে ইচ্ছা করে।

পরাশর বললেন, ঋক্ যজুঃ সাম এই ত্রয়ী বেদ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের আবরণ স্বরূপ। মোহবশত কোন ব্যক্তি এই ত্রয়ীকে পরিত্যাগ করলে সেই পাতককে নগ্ন বলে। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ ভীষ্মকে যা বলেছিলেন, তা শোন। পুরাকালে এক দিব্য বৎসর ব্যাপী দেবাসুরের যে যুদ্ধ হয়, তাতে দেবতাদের পরাজয় হয়। তাঁরা ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর কূলে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তপস্যা করেন। এই স্তব করেন, আমাদের শত্রুরা নিজেদের বর্ণ ধর্মে নিরত, বেদ-মার্গানুসারী ও তপসান্বিত বলে আমরা তাদের বধ করতে পারছি না। এই অসুরদের যাতে বিনাশ করতে পারি, হে বিষ্ণু, এই রকম কোন উপায় করে দাও। এই কথা শুনে বিষ্ণু নিজের শরীর থেকে মায়ামোহ উৎপাদন করে দেবতাদের দিয়ে বললেন, এই মায়ামোহ অসুরদের মোহিত করে বেদমার্গচ্যুত করলে তোমরা অনায়াসে তাদের বিনাশ করতে পারবে। দেবতারা এই আশ্বাস পেয়ে বিষ্ণুকে প্রণাম করে মায়ামোহকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

মায়ামোহ দেখলেন যে অসুররা নর্মদার তীরে তপস্যা করছে। তখন তিনি দিগম্বর, মুণ্ডিতমস্তক ও বর্হিপত্রধারী হয়ে অসুরদের বললেন, তোমরা কেন তপস্যা করছ? এই তপস্যায়

তোমরা ঐহিক না পারলৌকিক ফল পেতে চাও? অসুররা বলল, আমরা পারলৌকিক ফলের জন্য তপস্যা করছি। মায়ামোহ বললেন, যদি তোমরা মুক্তি চাও তো আমি যে ধর্মের অনুষ্ঠানের কথা বলি, তাই কর। তারপর মায়ামোহ নানা রকম যুক্তি দেখিয়ে তাদের বেদমার্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বললেন, তোমরা এই মহাধর্ম মান্য কর, তোমরা আর্হত নামে বিখ্যাত হবে। অসুররা তার কথায় সেই ধর্ম গ্রহণ করে একে অপরকে বুঝিয়ে নূতন ধর্ম গ্রহণ করাতে লাগল। অল্প দিনের মধ্যেই তারা বৈদিক ধর্ম পরিত্যাগ করল।

এর পরে মায়ামোহ রক্তাম্বর পরে চোখে অঞ্জনরাগ দিয়ে অন্য অসুরদের কাছে গিয়ে বললেন, যদি নির্বাণমুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কাম্য হয় তো পশুহিংসাদি দুষ্ট ধর্মে কোন ফল হবে না। এই জগৎ বিজ্ঞানময়, অনাধার, ভ্রান্তিজ্ঞান ও অর্থান্বেষণে তৎপর এবং রাগাদি দোষে দূষিত। এই জগৎ ভবসঙ্কটে ভ্রমণ করছে। এই রকম নানা যুক্তি দিয়ে মায়ামোহ দৈত্যদের নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করালেন। ধর্মত্যাগীরা আবার অন্যদের নিকট প্রচার করতে লাগল। আর এই ভাবেই তারা বেদ ও স্মৃতির পরম ধর্ম পরিত্যাগ করল।

এই মায়ামোহ আরও অনেক রকম পাষণ্ড রূপ ধারণ করে আরও অনেক অসুরকে মোহিত করলেন। তাদের কেউ বেদের নিন্দা করল, কেউ দেবতাদের নিন্দা করল, কেউ বা যাগযজ্ঞ ও ব্রাহ্মণের নিন্দা করতে আরম্ভ করল। মায়ামোহ বলতে লাগলেন, যে কাজে প্রাণী হিংসা হয়, তা কি কখনও ধর্ম হতে পারে!' আগুনে ঘি পুড়লে ফল পাওয়া যায়, এ তো বালকের মতো কথা! অনেক যজ্ঞ করে দেবতা হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদি শমাকাঠ খেতে হয় তো তার চেয়ে তো পশু হওয়াও ভাল, পশুরা অন্তত সরস পাতা খেতে পায়। যজ্ঞে পশু বধ করলে সেই পশু যদি স্বর্গে যায় তো যজমান নিজের পিতাকে কেন বধ করে না! শ্রাদ্ধের সময়ে একজন ভোজন করলে যদি অন্যের তৃপ্তি হয় তো প্রবাসে যাবার সময়ে খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে নেবার কী

দরকার! তবেই দেখতে পাচ্ছ যে লোকের বিশ্বাসের উপরেই সব নির্ভর করছে। আর নিজেরা বিবেচনা করলেই বুঝতে পারবে যে এই সব উপেক্ষা করাই শ্রেয়। কেননা, আপ্তবাক্য আকাশ থেকে পড়ে না। যা যুক্তিগ্রাহ্য, তাই আমাদের গ্রহণীয়। মায়ামোহের এই সব যুক্তি শুনে দৈত্যদের মধ্যে আর কারও বেদে রুচি রইল না।

দৈত্যরা কুপথগামী হতেই দেবতারা যুদ্ধ করতে এলেন এবং সন্মার্গ-ভ্রষ্ট অসুরদের বিনাশ করলেন। এই সময় পর্যন্ত যে সব মানুষ মায়ামোহের প্রবর্তিত ধর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদেরই নাম নগ্ন। বেদরূপ আবরণ ত্যাগ করে তাদের এই নাম হয়েছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক—এই চার আশ্রমের পর কোন পঞ্চম আশ্রম নেই। গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করে যে বানপ্রস্থে না যায় বা পরিব্রাজক না হয়, সে পাপাত্মাও নগ্ন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় যদি স্বধর্মচ্যুত হয় বা হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহলে তাদেরও নগ্ন বলা হয়। বেদত্যাগী নগ্নদের সঙ্গে আলাপ বা তাদের স্পর্শ করাও উচিত নয়।

পরাশর বললেন, শুনেছি পুরাকালে শতধনু নামে পৃথিবীতে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নী শৈব্যা পতিব্রতা ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা প্রতি দিন হোম জপ দান উপবাস ও পূজা করে বিষ্ণুর আরাধনা করতেন। একদিন তাঁরা কার্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করে ভাগীরথীর জলে স্নান করে উঠে আসছিলেন, এমন সময়ে সামনে এক পাষণ্ডকে দেখতে পেলেন। ইনি ছিলেন রাজা চাপাচার্যের সখা। রাজা আচার্যের গৌরবের কথা মনে করে সেই পাষণ্ডের সঙ্গে আলাপ করলেন; কিন্তু তাঁর আরব্ধব্রতা পত্নী উপবাসী আছেন বলে বাগ্‌যতা হয়ে পাষণ্ডের মুখদর্শন হওয়ায় সূর্য দর্শন করলেন। তারপর বিধানানুসারে বিষ্ণুপূজা করলেন। কিছুকাল পরে রাজার মৃত্যু হলে পতির চিতায় শৈব্যা তাঁর অনুগমন করলেন।

উপবাসী রাজা পাষণ্ডের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন বলে পরজন্মে কুকুর হয়ে জন্মালেন, আর শৈব্যা কাশীরাজের জাতিস্মর কন্যা হয়ে

জন্ম নিলেন। কাশীরাজ কন্যার বিবাহ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই ঐ কন্যার নিষেধে তিনি সে চেষ্টায় বিরত হলেন। শৈব্যা দিব্য চক্ষুতে তাঁর পতি কুকুরকে বিদিশায় আছে দেখলেন। তিনি সেখানে গিয়ে সেই কুকুরকে ভাল আহার দিয়ে বশ করে পূর্বজন্মের কথা শোনালেন। কুকুর অনেকক্ষণ চিন্তা করে অনুতপ্ত হয়ে এক পাহাড়ের চূড়া থেকে মরুভূমিতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করল। দ্বিতীয় বৎসর শৈব্যা দিব্যচক্ষুতে দেখলেন যে রাজা শৃগাল হয়ে জন্মে কোলাহল পর্বতে আছেন। শৈব্যা সেখানে গিয়েও তাকে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। শৃগাল বনের মধ্যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করল। পরজন্মে রাজা নেকড়ে হয়ে জন্মালেন। শৈব্যা সব কথা মনে করিয়ে দিতেই প্রাণত্যাগ করে শকুন হয়ে জন্মালেন এবং শৈব্যার কথায় দেহত্যাগ করে কাক হয়ে জন্মালেন। এর পরের জন্ম হল ময়ূর হয়ে এবং শৈব্যা তাঁকে নানাবিধ আহার দিয়ে অনুগত করলেন। এই সময়ে জনক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞে সেই ময়ূরকে স্নান করালেন। এর পরে শৈব্যা তাঁকে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে রাজা দেহত্যাগ করে জনক রাজার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এবারে শৈব্যা তাঁর পিতাকে বিবাহের আয়োজন করতে বললেন। কাশীরাজা স্বয়ংবর সভা আহ্বান করলে শৈব্যা তাঁর নিজের স্বামীকেই বরণ করলেন।

জনক রাজার মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র রাজা হলেন। তাঁরা বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন, বহু ধন দান করলেন। তাঁদের অনেক পুত্র হল। রাজা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ, রাজ্যভোগ ও পৃথিবী পালন করে ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলেন। সতী শৈব্যা চিতায় মৃত পতির অনুগমন করলেন। এবারে তাঁরা ইন্দ্রলোক অতিক্রম করে অক্ষয়লোকে গেলেন।

পরাশর বললেন, নগ্ন কাকে বলে তা তোমাকে বললাম। এই পাপাত্মাদের নাম পাষণ্ড। এদের সঙ্গে সম্ভাষণ করলে এক দিনের পুণ্য নষ্ট হয়।

তৃতীয়াংশ সমাপ্ত

চতুর্থাংশ

বংশ বিস্তার, পুরূরবার জন্ম ও রেবতীর উপাখ্যান

মৈত্রেয় বললেন, এইবারে আমাকে বিভিন্ন বংশের বিবরণ বলুন।

পরাশর বললেন, ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরই এক কন্যা অদিতির পুত্র সূর্য ও সূর্যের পুত্র মনু। মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নামে পুত্র ও ইলা নামে এক কন্যা জন্মে। মিত্রাবরুণের অনুগ্রহে ইলা মনুব সুদ্যুম্ন নামে পুত্রে পরিণত হন এবং ঈশ্বরের কোপে পুনরায় তিনি কন্যা হন। একদিন যখন তিনি চন্দ্রের পুত্র বুধের আশ্রমের নিকটে পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন বুধ তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন এবং পুরূরবা নামে তাঁদের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শিবের প্রসাদে ইলা আবার সুদ্যুম্নে পরিণত হন। সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিনত নামে তিন পুত্র জন্মে। কিন্তু তিনি কন্যারূপে জন্মেছিলেন বলে পিতার রাজ্যভাগ পেলেন না। বশিষ্ঠের কথায় তাঁর পিতা তাঁকে প্রতিষ্ঠান নামে এক নগর প্রদান করেন। সুদ্যুম্ন ঐ নগর পুরূরবাকে দান করেন।

মনুর অপব এক পুত্র শর্যাতির সুকন্যা নামে এক কন্যা জন্মে। চ্যবন তাঁকে বিবাহ করেন। শর্যাতির পুত্রের নাম আনর্ত। আনর্তের পুত্র রেবত কুশস্থলী নামে পুরীতে বাস করতেন। রেবতের একশো পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ককুদ্মী। ককুদ্মীর কন্যা রেবতী। এই কন্যা কার উপযুক্ত—এই কথা জানবার জন্য ককুদ্মী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে দেখলেন যে হাহা ও হূহূ নামে দুজন গন্ধর্ব তখন অতিতাল নামে দিব্য গন্ধর্ব গান ব্রহ্মাকে শোনাচ্ছেন। সেই গান শুনতে শুনতে যে অনেক যুগ গত হল তা তিনি বুঝতে পারলেন না, তাঁর মনে হল যে তিনি মুহূর্তকাল গান শুনেছেন। গান থামলে রৈবতক রাজ ককুদ্মী ব্রহ্মাকে তাঁর কন্যার উপযুক্ত বরের বিষয়ে জানতে চাইলেন। ব্রহ্মা বললেন, তোমার কোন্ বর পছন্দ তাই বল। রাজা

কয়েকজনের নাম বলতে ব্রহ্মা হেসে বললেন, তুমি যাদের কথা বলছ, পৃথিবীতে এখন তাদের পুত্র পৌত্রাদির পুত্রও বর্তমান নেই। তুমি যখন গান শুনছিলে তখন বহু যুগ অতীত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে এখন অষ্টাবিংশতিতম মনুর অধিকারের চার যুগ প্রায় শেষ হয়ে কলি আসন্ন। তোমার সমকালীন আর কেউ নেই। এই কথা শুনে রাজা সভয়ে বললেন, তবে আমার কন্যা কাকে সম্প্রদান করব? ব্রহ্মা বললেন, যেখানে তোমার অমরাবতীর মতো রমণীয় কুশস্থলী পুরী ছিল, এখন সেখানে দ্বারকাপুরী এবং বিষ্ণুর অংশে বলরাম সেখানে আছেন। তাঁকে তোমার কন্যা দান কর। ব্রহ্মার এই আদেশ পেয়ে রাজা রৈবতক পৃথিবীতে এসে দেখলেন যে তাঁর কুশস্থলী এখন অন্য রকম হয়েছে এবং পুরুষেরা হ্রস্ব অল্প তেজ ও স্বল্প বিবেক। তিনি বলরামকেই তাঁর কন্যা দান করলেন। আর বলরাম রেবতীকে দীর্ঘাঙ্গী দেখে নিজের লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে তাঁকে অন্যান্য বনিতার মতো খর্বাকার করলেন। রাজা রৈবতক কন্যা দানের পর তপস্যার জন্য হিমালয়ে চলে গেলেন।

ইক্ষ্বাকুর বংশ, মান্ধাতা ও সৌভরির উপাখ্যান

পরাশর বলতে লাগলেন, রৈবতক রাজা ককুদ্মী যখন ব্রহ্মলোকে ছিলেন, তখন পুণ্যজন নামে রাক্ষসরা তাঁর কুশস্থলী পুরী ধ্বংস করে। রাক্ষসদের ভয়ে রাজার একশো ভ্রাতা দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করে এবং তাঁদের বংশের ক্ষত্রিয়রা সব দিকেই বসবাস করতে থাকেন। ধৃষ্টের বংশ ধার্ষ্টক নামে অভিহিত হয়। নভাগের পুত্র নাভাগ, তাঁর পুত্র অম্বরীষ এবং অম্বরীষের প্রপৌত্র রথীতর সম্বন্ধে বলা হয় যে এঁর বংশ ক্ষত্রিয় হলেও এঁরা আঙ্গিরস বলে এঁদের ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যায়।

মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়েছিল হাঁচির সময় তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় থেকে। ইক্ষ্বাকুর একশো পুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন বিকুক্ষি, নিমি ও

দণ্ড। এঁদের পঞ্চাশজন উত্তরাপথে ও আটচল্লিশজন দক্ষিণাপথে রাজা হন। অষ্টকা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে রাজা ইক্ষ্বাকু তাঁর পুত্র বিকুক্ষিকে মাংস আনতে বলেছিলেন। বিকুক্ষি বনে গিয়ে অনেক মৃগ বধ করার পর ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। তখন সেই পশুর মধ্য থেকে একটি শশক খেয়ে অন্য মাংস নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু গুরু বশিষ্ঠ বললেন, এ মাংস অপবিত্র হয়েছে, এতে কোন প্রয়োজন নেই। এই ঘটনায় ইক্ষ্বাকু পুত্রকে পরিত্যাগ করলেন এবং বিকুক্ষি শশাদ নামে পরিচিত হন। ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। পরঞ্জয় তাঁর পুত্র।

ত্রেতা যুগে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তাতে অসুরদের হাতে পরাজিত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বললেন যে তিনি রাজা পরঞ্জয়ের দেহে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হয়ে অসুর নিধন করবেন। তার জন্য পরঞ্জয়কে যুদ্ধের উদ্যোগ করতে বলতে হবে। এই কথা শুনে দেবতারা যখন পরঞ্জয়ের নিকটে এসে তাঁকে যুদ্ধে সহায়তা করতে বললেন, তখন পরঞ্জয় বললেন যে দেবরাজ ইন্দ্রের কাঁধে চড়ে যুদ্ধ করতে তিনি রাজী আছেন, অন্যথায় নয়। কাজেই ইন্দ্র ও দেবতারা এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন। পরঞ্জয় বৃষভরূপী ইন্দ্রেব কাঁধে চড়ে বিষ্ণুর প্রভাবে অসুর নিধন করলেন। ইন্দ্রেব স্কন্ধ বা ককুতে আরোহণ করে যুদ্ধ করেছিলেন বলে পরঞ্জয়ের নাম হল ককুৎস্থ।

ককুৎস্থের পৌত্র পৃথু, পৃথুর প্রপৌত্র যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত নিজের নামে শ্রাবস্তী পুরী স্থাপন করেন। এঁর পুত্র বৃহদশ্ব এবং পৌত্র কুবলয়াশ্ব। কুবলয়াশ্ব তাঁর একুশ হাজার পুত্রকে নিয়ে মহর্ষি উতঙ্কের অপকারী ধুন্ধু নামের অসুরকে বিনাশ করেন। এর জন্য তাঁর নাম হয় ধুন্ধুমার। এই যুদ্ধে ধুন্ধুর নিঃশ্বাসের আগুনে কুবলয়াশ্বের সব পুত্র নিহত হয়, বেঁচে যায় শুধু দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব নামে তিনটি পুত্র। দৃঢ়াশ্বের বংশেই বনাশ্বের

পুত্রহীন যুবনাশ্ব মনের দুঃখে মুনিদের আশ্রমে বাস করতেন। মুনিরা এক সময়ে দয়া করে তাঁর পুত্রের জন্য যজ্ঞ করলেন। মধ্য রাত্রে যজ্ঞ সমাপ্ত হলে তাঁরা মন্ত্রপূত জলের কলস বেদীতে রেখে শয়ন করলেন। এ দিকে যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত হয়ে সেখানে এসে নিদ্রিত মুনিদের না জাগিয়ে সেই মন্ত্রপূত জল পান করলেন। মুনিরা জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই জলপান করল? এই জলপান করে যে যুবনাশ্বের পত্নী পুত্রলাভ করতেন! রাজা বললেন, না জেনে আমি এই জল পান করেছি। তাই যুবনাশ্বেরই গর্ভসঞ্চার হল এবং যথাসময়ে তাঁর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে এক পুত্র সন্তান জাত হল। মুনিরা বললেন, এই শিশু কার স্তন্য পান করবে? দেবরাজ ইন্দ্র এসে বললেন, এ আমাকে ধয়ন করবে। বলে শিশুর মুখে তাঁর প্রদেশিনী অঙ্গুলি দিলেন। শিশু সেই অমৃত-স্রাবিণী অঙ্গুলি চুষে এক দিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। মাং ধাতা, ইন্দ্রের এই কথা থেকে শিশুর নাম হল মান্ধাতা।

মান্ধাতা চক্রবর্তী রাজা হয়ে সপ্তদ্বীপ পৃথিবী ভোগ করেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে সূর্য যেখান থেকে উদিত হয়ে যেখানে অস্ত যান, তার সমস্তই মান্ধাতার রাজ্য। মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র ও পঞ্চাশটি কন্যা জন্মে।

এই সময়ে সৌভরি নামে এক ঋষি বারো বৎসর যাবৎ জলের মধ্যে বাস করছিলেন। সেই জলে সম্মদ নামে এক দীর্ঘাকার মৎস্য বহু পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্র নিয়ে সুখে বাস করত। তাদের সঙ্গে ক্রিয়ায় মৎস্যের হৃষ দেখে ঋষিরও পুত্র পৌত্রাদির সঙ্গে এই রকম জীবনযাপনের স্পৃহা জাগল। তিনি তখনই জল থেকে উঠে সংসার করবার ইচ্ছায় কন্যা লাভের জন্য রাজা মান্ধাতার নিকট উপস্থিত হলেন। বললেন, আমি বিবাহ করতে চাই, তোমার পঞ্চাশটি কন্যার একটি আমাকে দাও। রাজা দেখলেন যে ঋষির জরাজর্জরিত দেহ,

কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলে শাপের ভয়। তাই অনেক চিন্তা করে বললেন, কন্যা বর মনোনয়ন করবে, এই আমাদের কুলের নিয়ম। ঋষি চিন্তা করেই বুঝতে পারলেন যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবার এ একটা উপায়। তাই বললেন, বেশ, তাই হোক। আমাকে অন্তঃপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। যদি তোমার কোন কন্যা চায়, তবেই আমি বিবাহ করব। তা না হলে এই বৃদ্ধ বয়সে এই উদ্যোগ আর করব না।

রাজা কন্যাদের অন্তঃপুর রক্ষক ক্লীব বর্ষবরকে সেই আদেশ করলেন। বর্ষবর তাঁকে নিয়ে গিয়ে কন্যাদের সব কথা জানাল। কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশের সময় ঋষি সিদ্ধ গন্ধর্বের চেয়েও মনোহর রূপ ধারণ করলেন। এবং কন্যারা তাঁর রূপে মগ্ধ হয়ে সকলেই বলতে লাগল, আমি এঁকে আগে বরণ করেছি। অন্তঃপুর রক্ষকেব নিকট এই সংবাদ পেয়ে রাজা অনিচ্ছাসত্ত্বেই তাব অঙ্গীকার পালন করলেন। সব রাজকন্যাদের বিবাহ করে ঋষি নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন। তারপর বিশ্বকর্মাকে ডেকে প্রত্যেক কন্যার জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ করলেন। বললেন, এই সব প্রাসাদে হংস ও পদ্ম শোভিত জলাশয় ও উপবন থাকবে, থাকবে রমণীয় শয্যা, আসন ও পরিচ্ছদ। বিশ্বকর্মা সেই ব্যবস্থা করে দিলে কন্যারা অতিথি ও কুটুম্বদের নানা উপভোগে তৃপ্ত করতে লাগলেন।

কন্যারা সুখে আছেন না দুঃখে, তা দেখবার জন্য রাজা একদিন এসে উপস্থিত হলেন। তারপর একটি প্রাসাদে প্রবেশ করে তাঁর এক কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে সুখে আছ তো, না তোমার কোন দুঃখ আছে? কন্যা বলল, এখানে আমার সব রকমের সুখ আছে, দুঃখ শুধু এই যে ঋষি সারাক্ষণ আমার কাছেই থাকেন, তাই আমার বোনদের না জানি কত দুঃখ! রাজা আর এক কন্যার নিকট গিয়ে ঠিক একই কথা শুনতে পেলেন। একে একে সব কন্যার নিকটে গিয়ে একই কথা শুনে রাজা আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। তারপর এক নির্জন স্থানে ঋষি সৌভরিকে দেখে তাঁর

পূজা করে বললেন, আপনার মতো সিদ্ধির প্রভাব আমি আর কারও দেখি নি। কিছু দিন তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে রাজা ফিরে গেলেন।

কালক্রমে সৌভরির একশো পঞ্চাশটি পুত্রের জন্ম হল। ঋষি তাদের প্রতি মমতাকৃষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলেন, কবে এরা হাঁটতে শিখবে, কবে যুবা হবে, কবে এদের কৃতদার দেখব, এদেরও কি পুত্র হবে! তিনি দেখলেন যে একটি মনোরথ পূর্ণ হতে না হতেই আর একটি অভিলাষ প্রবল হয়ে উঠছে। মরণ পর্যন্ত মনোরথের অন্ত নেই, আর মনোরথে আসক্ত অন্তঃকরণ পরমাত্মসঙ্গী হতে পারে না। তিনি বুঝতে পারলেন যে জলবাসের সহচর মৎস্যের সঙ্গদোষেই তাঁর সমাধি বিনষ্ট হয়েছে। মুক্তির জন্য যতিদের চাই নিঃসঙ্গতা, সঙ্গ থেকেই অশেষ দোষ উৎপন্ন হয়। যার যোগ পূর্ণ হয়েছে, সঙ্গ দোষে সেও অধঃপাতে যেতে পারে ; যার অল্প সিদ্ধি, তার তো কথাই নেই।

এই সব ভেবে সোভরি সব কিছু পরিত্যাগ করে পত্নীদের নিয়ে বনে প্রবেশ করলেন। অশেষবিধ ক্রিয়ায় পাপ ক্ষীণ হলে যতি হলেন এবং পরিশেষে বিষ্ণুতে সব কর্ম সমর্পণ করে মুক্তিলাভ করলেন।

সগরের উপাখ্যান

পরাশর বললেন, মান্ধাতার কন্যাদের পর তাঁর পুত্র পুরুকুৎসের কথা বলছি। তাঁর সময়ে রসাতলে ছয় কোটি মৌনেয় নামের গন্ধর্ব বাস করত। তারা নাগ কুলের রত্ন ও আধিপত্য হরণ করে। নাগরা বিষ্ণুর কাছে গেলে তিনি বললেন যে পুরুকুৎসের দেহে প্রবেশ করে তিনি গন্ধর্বদের বিনাশ করবেন। নাগরা এই কথা শুনে রসাতলে ফিরে এসে নর্মদাকে পুরুকুৎসের কাছে পাঠাল। নর্মদা এসে পুরুকুৎসকে রসাতলে নিয়ে গেল এবং বিষ্ণুর প্রভাবে তিনি গন্ধর্বদের বিনাশ করলেন। নাগরা নর্মদাকে বর দিল যে তার নাম করলে কারও সর্পভয় থাকবে না। আর পুরুকুৎসকে তারা বর দিল যে তাঁর বংশ ছেদ হবে না।

নর্মদার গর্ভে পুরুকুৎসের পুত্র হল॥ অনরণ্য এঁর পৌত্র। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে রাবণ এই অনরণ্যকে বধ করে। অনরণ্যের বংশেই সত্যব্রতর জন্ম। তিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েছেন এবং চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দ্বাদশ বৎসর ধরে অনাবৃষ্টির সময় রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের পরিবার পোষণের চেষ্টা করেছিলেন। চণ্ডালের দান গ্রহণে যাতে কোন দোষ না ঘটে, তার জন্যে তিনি জাহ্নবী তীরের একটি বটবৃক্ষে প্রতি দিন মৃগমাংস বেঁধে রাখতেন। তুষ্ট হয়ে বিশ্বামিত্র তাঁকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করান।

ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও পৌত্র রোহিতাশ্ব। এই বংশেরই বাহু হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দের কাছে পরাজিত হয়ে রাণীকে নিয়ে বনে চলে যান। বনে রাণীর গর্ভ সঞ্চার হলে তাঁর সপত্নী তাঁকে বিষ প্রদান করে, কিন্তু গর্ভস্থ শিশু সাত বৎসর গর্ভে থাকে। এই সময়ে বৃদ্ধ রাজা বাহু ঔর্ব ঋষির আশ্রমের নিকট মারা যান। রাণী মৃত রাজাকে চিতায় তুলে নিজে সহমরণে যাবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু অতীত অনাগত ও বর্তমান কালবেত্তা ঔর্ব তাঁর আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, তুমি এ কাজ কোরো না, তোমার গর্ভে আছে রাজ-চক্রবর্তী বালক। এই কথায় রাণী সহমরণে নিবৃত্ত হলে ঔর্ব তাঁকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই বিষের সঙ্গে এক তেজস্বী বালক জন্মগ্রহণ করল। জাতকর্মাদি সম্পাদন করে ঔর্ব তাঁর নাম রাখলেন সগর। উপনয়নের পর বেদ, অখিল শাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দিলেন।

বড় হয়ে বালক মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কে এবং তিনি কোথায়? কেন আমরা এই তপোবনে আছি? এই প্রশ্ন শুনে মা তাঁকে অতীতের সব কথা বললেন। সগর ক্রুদ্ধ হয়ে হৈহয় তালজঙ্ঘাদি বধের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন এবং হৈহয় রাজাদের বধ করলেন। কিন্তু শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবরা তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণ নিল। বশিষ্ঠ তাদের জীবন্মৃত-প্রায় করে সগরকে

বললেন, তোমার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য আমি এদের স্বধর্ম ও ব্রাহ্মণ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়েছি, কাজেই এই জীবন্মৃতদের অনুসরণ করে ফল কী? গুরুর কথায় সম্মত হয়ে সগর তাদের ভিন্ন ভিন্ন বেশ দিলেন। যবনদের মাথা মুড়িয়ে দিলেন, শকদের অর্ধমুণ্ডিত করলেন, পারদদের প্রলম্ব কেশযুক্ত ও পল্লবদের শ্মশ্রুধারী করলেন এবং স্বাধ্যায় ও বষট্‌কারহীন করে দিলেন অন্যান্যদের। নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে তারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হল। আর নিজের অধিষ্ঠানে ফিরে এসে সগর সপ্তদ্বীপ শাসন করতে লাগলেন।

সগরের দুই পত্নী—একজন কশ্যপের কন্যা সুমতি ও অন্যজন বিদেহ রাজকন্যা কেশিনী। পুত্র লাভের জন্য এঁরা ঔর্ব ঋষির আরাধনা করলে তিনি বর দেন যে একজনের এক বংশধর পুত্র হবে এবং অন্যজনের হবে ষাট হাজার পুত্র এবং যার যে বর ইচ্ছা তাই নিতে পারে। এই কথা শুনে সুমতি ষাট হাজার পুত্র এবং কেশিনী একটি পুত্র চাইলেন। কিছু দিনের মধ্যেই কেশিনীর অসমঞ্জা নামে একটি পুত্র জন্মাল এবং কালক্রমে সুমতিরও ষাট হাজার পুত্র জন্মাল। অসমঞ্জারও এক পুত্র হল, তার নাম অংশুমান।

অসমঞ্জা বাল্যকাল থেকেই দুর্বৃত্ত ছিলেন। পিতা ভেবেছিলেন যে যৌবনে তিনি বুদ্ধিমান হবেন। কিন্তু তা হলেন না দেখে তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। এ দিকে রাজার অন্য ষাট হাজার পুত্রও অসমঞ্জার চরিত্রের অনুকরণ করল। এরা যজ্ঞাদি সন্মার্গ নষ্ট করছে দেখে দেবতারা কপিল ঋষিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সগরের পুত্ররা থাকলে জগতের কী দশা হবে? কপিল বললেন, অল্প দিনেই তারা বিনষ্ট হবে।

এর পর সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সগরের পুত্ররা ছিল যজ্ঞের অশ্ব রক্ষক, কিন্তু কেউ সেই অশ্ব অপহরণ করে ভূ-বিবরে প্রবেশ করল। সগরের পুত্ররা অশ্বের খুরের চিহ্ন অনুসরণ করে পৃথিবী খুঁড়ে পাতালে প্রবেশ করল। সেখানে দেখল যে যজ্ঞের

অশ্ব ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং শরতের নির্মল আকাশের সূর্যের মতো চারি দিক উদ্ভাসিত করে বসে আছেন কপিল ঋষি। অস্ত্র উদ্যত করে তারা বলল, যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাবার জন্য এই ব্যক্তিই অশ্ব চুরি করেছে, একে হত্যা কর। এই কথা বলে তাঁর দিকে ধাবিত হতেই কপিল তাদের দিকে তাকালেন এবং তাঁর শরীর থেকে সমুত্থিত আগুনে তারা বিনষ্ট হল।

এই সংবাদ পেয়ে সগর তাঁর পৌত্র অংশুমানকে যজ্ঞের অশ্ব আনবার জন্য পাঠালেন। অংশুমান একই পথে কপিলের নিকটে এসে ভক্তিনম্র হয়ে তাঁকে তুষ্ট করল। কপিল বললেন, এই অশ্ব নিয়ে তোমার পিতামহর কাছে ফিরে যাও। আর বর নাও, তোমার পৌত্র স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনবে। অংশুমান বলল, আমার পিতৃব্যরা ব্রহ্মদণ্ড হত বলে স্বর্গের অযোগ্য, তাঁরা যাতে স্বর্গে যেতে পারেন সেই বর দিন। কপিল বললেন, আমি তো বলেছি যে তোমার পৌত্র স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনবে। বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠ থেকে নির্গত এই জলের স্পর্শে তারা স্বর্গারোহণ করবে।

কপিলকে প্রণাম করে অংশুমান অশ্ব নিয়ে ফিরে এল। সগর তাঁর যজ্ঞ সমাপন করলেন এবং আত্মজ প্রীতিতে সাগরকে পুত্রত্বে কল্পনা করলেন।

কল্মাষপাদের উপাখ্যান

অংশুমানের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনয়ন করেন বলে গঙ্গার নাম হয় ভাগীরথী। এঁরই বংশে ঋতুপর্ণ ছিলেন অক্ষ-হৃদয়জ্ঞ ও নলের সহায়।

ঋতুপর্ণের প্রপৌত্র মিত্রসহ একদিন মৃগয়ায় গিয়ে দুটি ব্যাঘ্র দেখতে পান। এরা বনের সব মৃগ ভক্ষণ করেছিল বলে মিত্রসহ বাণ মেরে একটি ব্যাঘ্রকে বধ করেন। কিন্তু মৃত্যুকালে সে ভীষণাকার রাক্ষস রূপ ধারণ করে এবং অন্য ব্যাঘ্রটি এর প্রতিশোধ নেব বলে

অন্তর্হিত হয়। তারপর রাজা এক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞ শেষ করে আচার্য বশিষ্ঠ নিষ্ক্রান্ত হবার পর বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করে সেই রাক্ষস এসে বলল, যজ্ঞের অবসানে আমাকে সমাংস ভোজন করানো তোমার কর্তব্য। তুমি ব্যবস্থা কর, আমি আসছি। বলে বেরিয়ে গেল এবং পাচকের বেশ ধারণ করে রাজার আজ্ঞা গ্রহণ করে মানুষের মাংস রেঁধে রাজাকে দিল। রাজা সেই মাংস সোনার পাত্রে রেখে বশিষ্ঠের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন এবং বশিষ্ঠ এলে তাঁকে সেই খাদ্য নিবেদন করলেন। বশিষ্ঠ ভাবলেন, রাজার এ কি দুঃশীল আচরণ! আমাকে মাংস খেতে দিচ্ছে! পরে ধ্যানে জানতে পারলেন যে তা মানুষের মাংস। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শাপ দিলেন, আমাদের মতো তপস্বীদের এই অখাদ্য পরিবেশনের জন্য তুমি নিজে নরমাংস-লোলুপ হবে। রাজা বললেন, আপনিই তো আমাকে এই আদেশ করেছিলেন! আমি বলেছি! বলে বশিষ্ঠ পুনর্বার ধ্যানযোগে সব কথাই জানতে পারলেন। তারপর রাজার প্রতি অনুগ্রহ করে বললেন, চিরদিন নয়, মাত্র বারো বছর তোমাকে নরমাংস ভোজন করতে হবে। কিন্তু রাজাও তখন অঞ্জলিতে জল নিয়ে বশিষ্ঠকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তাঁর পত্নী মদয়ন্তী বলে উঠলেন, এ কি করছ! ইনি আমাদের গুরু। আচার্যকে কি এই ভাবে শাপ দেওয়া উচিত! এই ভাবে প্রসাদিত হয়ে রাজা তাঁর অঞ্জলির জল পৃথিবী বা আকাশে নিক্ষেপ করলে শস্য বা মেঘ নষ্ট হবে ভেবে নিজের দুই পায়ে সেচন করলেন। ক্রোধাগ্নিতে তপ্ত সেই জলের স্পর্শে রাজার পদদ্বয় কল্মাষ অর্থাৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল এবং তাঁর নাম হল কল্মাষপাদ।

তৃতীয় দিনেই রাজা রাক্ষস রূপে বনে গিয়ে মানুষ খেতে লাগলেন। এক দিন তিনি এক মুনিকে ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গত দেখলেন। ভয় পেয়ে সেই দম্পতি পলায়নপর হতেই রাক্ষস ব্রাহ্মণকে ধরে ফেললেন এবং ব্রাহ্মণীর সমস্ত বিলাপ উপেক্ষা করে তাকে ভক্ষণ করলেন। ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, আজ যেমন আমার তৃপ্তির পূর্বেই তুমি আমার

পতিকে ভক্ষণ করলে, তেমনি স্ত্রীসম্ভোগে প্রবৃত্ত হলেই তোমার বিনাশ হবে। এই বলে ব্রাহ্মণী আগুনে প্রবেশ করলেন।

বারো বছর অতীত হবার পর শাপমুক্ত হয়ে রাজা স্ত্রীসম্ভোগে অভিলাষী হলে তাঁর পত্নী মদয়ন্তী তাঁকে ব্রাহ্মণীর শাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং রাজাকে স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করতে হল। পরে অপুত্রক রাজার প্রার্থনায় বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করলেন। কিন্তু সাত বছর পরেও গর্ভের শিশু ভূমিষ্ঠ হল না দেখে মদয়ন্তী পাথর দিয়ে পেটে আঘাত করলেন। তাতেই জন্ম হল অশ্মকের।

অশ্মকের পুত্রের নাম মূলক। এই সময়ে পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করতে প্রবৃত্ত হলে বিবস্ত্র স্ত্রীরা মূলককে পরিবেষ্টন করে রক্ষা করে। এই জন্য তাঁকে নারী কবচ বলা হত। এঁরই বংশে খট্বাঙ্গ দিলীপের জন্ম। ইনি দেবাসুর সংগ্রামে অসুরদের বিনাশ করেন। এই উপকারের জন্য দেবতারা তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি জানতে চান যে কত কাল বাঁচবেন। দেবতারা বললেন যে তাঁর আয়ু আর এক মুহূর্ত অবশিষ্ট আছে। এই কথা শুনেই খট্বাঙ্গ দিলীপ দেব রথে চড়ে মর্ত্যে ফিরে এসে বললেন, ব্রাহ্মণদের চেয়ে আমার আত্মা প্রিয় ছিল না, স্বধর্ম আমি কখনও লঙ্ঘন করি নি, আমার মধ্যে কোন ভেদ জ্ঞান ছিল না—এই জন্য আমি যেন বিষ্ণুকে পাই। এর পরে তিনি বিষ্ণুতে আত্মা যোগ করে বিষ্ণুতেই বিলীন হয়ে গেলেন। পুরাকালে সপ্তর্ষিরা বলতেন যে পৃথিবীতে এঁর মতো আর কেউ জন্মাবে না।

রামের উপাখ্যান

খট্বাঙ্গ দিলীপের পৌত্র রঘু, রঘুর পৌত্র দশরথ। বিষ্ণু এই দশরথের পুত্র হয়ে রাম লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চার অংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। রাম বাল্যে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার জন্য যাবার পথে তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। যজ্ঞে মারীচকে বাণে আঘাত করে দূরে নিক্ষেপ করেন, সুবাহু প্রমুখ রাক্ষসদের বিনাশ করেন এবং দর্শনমাত্রে

অহল্যাকে নিষ্পাপ করেন। তারপর জনক রাজার গৃহে অনায়াসে হরধনু ভঙ্গ করে অযোনিজা সীতাকে তাঁর বীর্যের শুল্ক স্বরূপ লাভ করেন। বিবাহের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি পরশুরামের বলবীর্যের গর্ব খর্ব করেন।

পিতৃবাক্যে রাম রাজ্যাভিলাষ ত্যাগ করে ভ্রাতা ও ভার্যার সঙ্গে বনে গমন করেন। সেখানে বিরাধ খর দূষণ প্রভৃতি রাক্ষস, কবন্ধ ও বালিকে বধ করেন। পরে সমুদ্র বন্ধন করে অশেষ রাক্ষস বধের পর দশানন কর্তৃক অপহৃতা সীতাকে দশানন বধে তাঁর কলঙ্ক দূর করে এবং অগ্নিপ্রবেশে শুদ্ধ করে অযোধ্যায় নিয়ে আসেন।

ভরতও গন্ধর্ব রাজ্য লাভের জন্য তিন কোটি গন্ধর্ব বিনাশ করেন। আর শত্রুঘ্ন অমিতবল পরাক্রম মধুপুত্র লবণ রাক্ষসকে বধ করে মথুরা নামে পুরী স্থাপন করেন। এই ভাবে দুরাত্মাদের বধ করে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন স্বর্গে গমন করেন।

রামের পুত্র কুশ ও লব, লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কর এবং শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহু ও শরসেন। কুশের পুত্র অতিথি এবং এই বংশের হিরণ্যনাভ ছিলেন মহাযোগী জৈমিনির শিষ্য। হিরণ্যনাভের নিকটেই যাজ্ঞবল্ক্য যোগশিক্ষা করেন। হিরণ্যনাভের বংশে মরু যোগাবলম্বন করে আজও কলাপ গ্রামে আছেন এবং আগামী যুগে তিনিই সূর্যবংশের প্রবর্তয়িতা হবেন। মরুর অধঃস্তন ষষ্ঠ পুরুষে বৃহদ্বল ভারত যুদ্ধে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর হাতে নিহত হন।

নিমির উপাখ্যান

ইক্ষ্বাকুর নিমি নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি এক সময়ে সহস্র সংবৎসর ব্যাপী যজ্ঞের জন্য বশিষ্ঠকে হোতৃত্বে বরণ করলেন। বশিষ্ঠ বললেন, ইন্দ্র আমাকে পঞ্চশত বর্ষব্যাপী যজ্ঞে বরণ করেছেন, আপনি অপেক্ষা করুন, তাঁর যজ্ঞ শেষ করে আমি আপনার ঋত্বিক

হব। বশিষ্ঠের এই কথা শুনে রাজা নিমি কোন উত্তর দিলেন না। বশিষ্ঠ ভাবলেন যে রাজা এই কথায় সম্মত হয়েছেন এবং এই ভেবে ইন্দ্রের যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। কিন্তু রাজা নিমি বশিষ্ঠের জন্য অপেক্ষা না করে গৌতমাদি ঋষির সাহায্যে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। এদিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করে বশিষ্ঠ নিমির যজ্ঞের জন্য ত্বরান্বিত হয়ে এলেন এবং গৌতম যজ্ঞের কর্তৃত্ব করছেন দেখে নিদ্রিত নিমিকে শাপ দিলেন যে তাঁকে অবজ্ঞা করে গৌতমকে যজ্ঞের ভার দেবার জন্য নিমি বিদেহ অর্থাৎ দেহহীন হবেন। প্রবুদ্ধ হয়ে রাজাও বললেন, গুরু বশিষ্ঠ কিছু না জেনে শুনে আমাকে কিছু না বলে আমার নিদ্রাকালে আমাকে শাপ দিলেন, তার জন্য তাঁরও দেহ পতিত হবে। রাজা এই প্রতিশাপ দিয়ে দেহত্যাগ করলেন এবং তাঁর শাপের প্রভাবে বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হল।

একদিন উর্বশীকে দেখে মিত্রাবরুণের বীর্য স্খলিত হলে তার থেকে বশিষ্ঠ অপর দেহ লাভ করলেন। নিমি রাজার মৃতদেহ অতি মনোহর তৈল ও গন্ধাদি লিপ্ত থাকায় ক্লেদাদি দুষ্ট হল না এবং সদ্য মৃতের মতো অবিকৃত ছিল। যজ্ঞ সমাপ্তির পর ঋত্বিকরা যজ্ঞভাগ গ্রহণে আগত দেবতাদের বললেন, যজমানকে আপনারা বর দিন। দেবতারা বর গ্রহণ করতে বললে নিমি বললেন, এই জগতে শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগের চেয়ে বেশি দুঃখের আর কিছু নেই। কাজেই আমি আর শরীর গ্রহণ করতে চাই না। তার বদলে আমি সবার নয়নে বাস করতে চাই। নিমির এই প্রার্থনায় দেবতারা তাঁকে সকলের নেত্রে স্থাপন করলেন। এই জন্যই লোকের উন্মেষ ও নিমেষ হয়ে থাকে।

ঋষিরা অরাজকতার ভয়ে অপুত্রক রাজার দেহ অরণীকাষ্ঠে মন্থন করতে লাগলেন। তাতে এক পুত্র উৎপন্ন হল। জনকের দেহ থেকে জন্ম বলে ঐ পুত্রের নাম হল জনক এবং পিতা বিদেহ হয়েছিলেন বলে তাঁর অন্য নাম হল বৈদেহ। মন্থনে উৎপন্ন বলে

তাঁকে মিথিও বলা হয়। এই বংশেই সীরধ্বজের জন্ম। পুত্রলাভের জন্য তিনি যখন যজ্ঞভূমি কর্ষণ করেছিলেন সেই সময়ে তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগে সীতা নামে এক কন্যা সমুৎপন্ন হল।

সীরধ্বজের ভ্রাতা কুশধ্বজ ছিলেন সাঙ্কাশ্য নগরের অধিপতি। সীরধ্বজের পর এই বংশের বত্রিশজনের পর জনক বংশের অবসান হয়। এই মৈথিল রাজাদের প্রায় সকলেই আত্মতত্ত্বে পণ্ডিত ছিলেন।

তারাহরণ ও চন্দ্রবংশ

মৈত্রেয় পরাশরকে বললেন, আপনি এতক্ষণ সূর্যবংশের কথা বললেন, এবারে চন্দ্রবংশের কথা বলুন।

পরাশর বললেন, বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে সমুৎপন্ন ব্রহ্মার পুত্র অত্রি এবং অত্রির পুত্র চন্দ্র। ব্রহ্মা চন্দ্রকে অশেষ নক্ষত্র, ওষধি ও দ্বিজদের আধিপত্যে অভিষেক করেন। রাজসূয় যজ্ঞ করবার পর চন্দ্রের মদগর্ব উপস্থিত হয় এবং তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন। দেবর্ষিদের যাচ্ঞায় এমন কি ব্রহ্মার অনুরোধেও চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করলেন না। এদিকে বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষ ছিল বলে দৈত্যগুরু শুক্র চন্দ্রের সহায় হলেন। আবার অঙ্গিরার নিকট থেকে বিদ্যালাভ করে ফিরে রুদ্র বৃহস্পতিকে সাহায্য করতে আরম্ভ করলেন। চন্দ্রের পক্ষে জম্ভ, কুজম্ভ প্রভৃতি দানবরা সাহায্যের উদ্যোগ করল, আর বৃহস্পতিকে সাহায্যের জন্য দেবসৈন্য নিয়ে ইন্দ্র উপস্থিত হলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। তারার নিমিত্তে যুদ্ধ বলে এর নাম হল তারকাময়। যুদ্ধে ক্ষুব্ধহৃদয় জগৎ ব্রহ্মার শরণ নিলে তিনি শুক্র, অসুর, রুদ্র ও দেবগণকে নিবারণ করে বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করলেন। কিন্তু বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখে বললেন, আমার ক্ষেত্রে অন্যের সন্তান ধারণ তোমার উচিত নয়, তুমি এই গর্ভ ত্যাগ কর।

বৃহস্পতির কথায় পতিব্রতা তারা ঈষিকা তৃণগুচ্ছে তাঁর গর্ভপাত করলেন। আর তৎক্ষণাৎ এক পুত্র উৎপন্ন হয়ে নিজের কান্তিতে দেবতাদের তেজ অভিভূত করল। বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েই এই কুমারের দিকে সাভিলাষে তাকিয়ে আছে দেখে দেবতারা তারাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সত্য বল, এই সন্তান কার? কিন্তু তারা লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না। অনেকবার প্রশ্নের পরেও তারা যখন দেবতাদের কোন উত্তর দিলেন না, তখন সেই কুমার তাঁকে শাপ দিতে উদ্যত হয়ে বললেন, তুমি কেন আমার পিতার নাম করছ না? ব্রহ্মা কুমারকে নিবৃত্ত করে বললেন, বল এই পুত্র চন্দ্রের, না বৃহস্পতির? তারা এই বারে লজ্জাজড়িত হয়ে বললেন, চন্দ্রের। চন্দ্র তখনই তাঁর পুত্রকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি প্রাজ্ঞ, আমি তোমার নাম দিলাম বুধ।

উর্বশী-পুরূরবার উপাখ্যান

পরাশর বললেন, এই বুধ যে ভাবে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম দিয়েছিলেন, তা আগেই বলেছি। পুরূরবা তেজস্বী, দানশীল ও যজ্ঞকারী ছিলেন। মিত্রাবরুণের শাপে মনুষ্যলোকে বাস করতে হবে ভেবে উর্বশী মর্ত্যে এসে এই সত্যবাদী ও রূপবান রাজা পুরূরবাকে দেখলেন এবং দেখবামাত্র অশেষ মান ও স্বর্গসুখাভিলাষ ত্যাগ করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। রাজা পুরূরবাও উর্বশীর লাবণ্য দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বললেন, আমি তোমার অনুরক্ত হয়েছি, তুমিও প্রসন্ন হয়ে আমাতে অনুরক্ত হও। রাজার কথার উত্তরে উর্বশী লজ্জিত ভাবে বললেন, আমার প্রতিজ্ঞা আপনাকে পালন করতে হবে। রাজা বললেন, কী প্রতিজ্ঞা? উর্বশী উত্তর দিলেন, আমার পুত্রস্বরূপ এই মেষদ্বয়কে আমার শয্যার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারবেন না, আমার সামনে উলঙ্গ হবেন না, এবং শুধু ঘৃতই আমার আহার। রাজা বললেন, তাই হবে।

তারপর পুরূরবা উর্বশীর সঙ্গে কখনও অলকায়। চৈত্ররথাদি বনে, কখনও বা রমণীয় অমল-কমল-শোভিত মানসাদি সরোবরে ক্রীড়া করে নানা প্রমোদে ষাট হাজার বৎসর সুখে যাপন করলেন। উর্বশীও রাজার প্রতি বর্ধিত অনুরাগে ও উপভোগ সুখে অমরলোক বাসের স্পৃহা ত্যাগ করলেন।

এদিকে উর্বশীর অভাবে সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সুরলোক আর রমণীয় লাগছিল না। তাই বিশ্বাবসু উর্বশীর পণ জানতেন বলে গন্ধর্বদের সঙ্গে সমবেত হয়ে এক রাত্রে উর্বশী ও পুরূরবার শয্যা-পার্শ্ব থেকে একটি মেষ হরণ করলেন। আকাশে সেই মেষের ডাক শুনে উবর্বশী বললেন, কে আমার মেষ হরণ করছে? এখন আমি কার শরণ নেব? কিন্তু রাজা নিজে উলঙ্গ ছিলেন বলে উর্বশীর কথা শুনেও মেষ উদ্ধারে যেতে পারলেন না। তারপর গন্ধর্বরা আর একটি মেষ নিয়ে প্রস্থান করল। সেই মেষের ডাক শুনে উর্বশী আবার আর্ত স্বরে বললেন, আমি অনাথা, ভর্তৃহীনা ও কুপুরুষের আশ্রয়ে আছি। কে আমার সন্তানকে রক্ষা করবে? এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ রাজা ভাবলেন যে অন্ধকারে উর্বশী তাঁর উলঙ্গ অবস্থা দেখতে পাবে না। তাই খড়্গ হাতে ধাবিত হতেই গন্ধর্বরা অতি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ স্ফুরণ করলেন। সেই আলোয় উর্বশী রাজাকে বিবস্ত্র দেখে পণ ভঙ্গ হয়েছে বলে প্রস্থান করলেন। গন্ধর্বরাও মেষদ্বয়কে পরিত্যাগ করে পলায়ন করল। রাজা তাদের নিয়ে হৃষ্ট মনে নিজ শয্যায় ফিরে উর্বশীকে দেখতে পেলেন না।

উর্বশীকে হারিয়ে রাজা উন্মত্ত ভাবে ভ্রমণ করতে লাগলেন। একদিন কুরুক্ষেত্রের অম্ভোজ সরোবরে চারজন অপ্সরার সঙ্গে উর্বশীকে দেখতে পেয়েই তিনি বলে উঠলেন, এসো নির্দয়, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর। উর্বশী বললেন, আমি এখন অন্তঃসত্ত্বা। এক বছর পরে আপনি এখানে আসবেন, তখন আপনার একটি পুত্র হবে এবং এক রাত্রি আমি আপনার সহবাস করব। উর্বশীর এই কথা শুনে

পুরূরবা হৃষ্ট মনে নিজের পুরে ফিরে গেলেন। আর উর্বশী অন্য অপ্সরাদের বললেন, ইনিই পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা, এঁরই অনুরাগে আকৃষ্ট হয়ে আমি এত কাল এঁর সঙ্গে সহবাস করেছি॥ অপ্সরারা বললেন, সত্যিই ইনি সুপুরুষ। এঁর সঙ্গে অভিরমণে আমাদেরও স্পৃহা হচ্ছে।

এক বছর পূর্ণ হলে রাজা পুনরায় সেখানে গেলেন! উর্বশী তাঁকে আয়ু নামে একটি পুত্র দিলেন এবং এক রাত্রি রাজার সহবাস করে আরও পাঁচটি পুত্রের জন্য গর্ভ ধারণ করলেন। বললেন, আমার প্রীতির জন্য গন্ধর্বরা আপনাকে বর দিতে অভিলাষী, আপনি বর চান। রাজা বললেন, আমার শত্রুরা পরাজিত, সেনাবল ও কোষ পূর্ণ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য অব্যাহত. উর্বশীর সান্নিধ্য এখন অপ্রাপ্য বলে আমি তারই সঙ্গে কালযাপনে অভিলাষী। গন্ধর্বদের নিকটে রাজা এই বর চাইলে তাঁরা তাঁকে একটি অগ্নিস্থালী দিয়ে বললেন, দেবানুসারী হয়ে প্রতি দিন তিন ভাগ করে এই অগ্নির যজন করবেন, তাতেই আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

রাজা সেই অগ্নিস্থালী নিয়ে স্বপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে এক বনের মধ্যে ভাবলেন, আমি কী মূঢ়, উর্বশীর বদলে আমি এই অগ্নিস্থালী নিয়ে যাচ্ছি! এই কথা মনে হতে বনের মধ্যেই অগ্নিস্থালী ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। নিজ পুরে পৌঁছবার পর মধ্য রাত্রে বিনিদ্র রাজার মনে হল যে উর্বশীর সঙ্গ লাভের জন্যই তো গন্ধর্বরা তাঁকে অগ্নিস্থালী দিয়েছিলেন,' আর তিনি তা বনের মধ্যে ফেলে এলেন! আবার তা আনবার জন্য তিনি বনে গেলেন, কিন্তু অগ্নিস্থালী দেখতে পেলেন না। যে স্থানে তিনি সেটি নিক্ষেপ করেছিলেন, সেখানে শমী গর্ভে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখতে পেয়ে ভাবলেন যে সেই স্থালীই এই বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তিনি ঠিক করলেন যে এই অশ্বত্থকে নিয়ে গিয়ে তাকে অরণী করে উৎপন্ন অগ্নির উপাসনা করবেন। রাজা তাই করলেন। নিজের পুরে গিয়ে সেই অরণী ঘর্ষণ করে, অগ্নিত্রয় উৎপাদন করে বেদানুসারে হোম করতে

লাগলেন। সেই অগ্নিবিধি দ্বারা নানা যজ্ঞ করে তিনি গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হলেন, তখন আর তাঁর উর্বশীর বিয়োগ হল না।

পূর্বে অগ্নি এক ছিল। পুরূরবাই গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামে ত্রিবিধ অগ্নির প্রবর্তন করেন।

জহ্নুর গঙ্গাপান, বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ও পরশুরামের জন্ম

পরাশর বললেন, পুরূরবার আয়ু, ধীমান, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ু ও শ্রুতায়ু নামে ছয়টি পুত্র হয়। অমাবসুর চতুর্থ পুরুষ জহ্নু। জহ্নু এক দিন নিজের যজ্ঞ বাটিকে গঙ্গাজলে প্লাবিত দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে পান করেছিলেন। দেবর্ষিরা তাঁকে প্রসন্ন করে গঙ্গাকে তাঁর দুহিতা রূপে স্বীকার করান। এতে জহ্নু তাঁকে পরিত্যাগ করেন।

জহ্নুর বংশে পঞ্চম পুরুষ কুশাশ্ব ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের জন্য তপস্যা শুরু করেন। তাঁর উগ্র তপস্যা দেখে ইন্দ্র নিজেই তাঁর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর নাম হয় কৌশিক গাধি। সত্যবতী নামে গাধির এক কন্যা হয়। ভার্গব ঋচীক তাঁকে প্রার্থনা করেন। কিন্তু গাধি এই অতি বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ স্বভাবের ব্রাহ্মণকে কন্যাদানে অনিচ্ছুক ছিলেন বলে এক হাজার শ্যামকর্ণ শ্বেতকান্তি বায়ুর ন্যায় বেগবান অশ্ব কন্যার মূল্য স্বরূপ যাচ্ঞা করলেন। ঋচীক বরুণের কাছ থেকে অশ্বতীর্থে উৎপন্ন এই রকমের এক হাজারটি অশ্ব এনে রাজাকে দিয়ে সত্যবতীকে বিবাহ করলেন।

পরে তিনি সত্যবতীর সন্তান কামনায় যজ্ঞে চরু অর্থাৎ পায়স প্রস্তুত করলেন। সত্যবতী তাঁর জননীর জন্যও পুত্র প্রার্থনা করলে ঋচীক তাঁর জন্যও চরু প্রস্তুত করলেন। তারপর এটি তোমার ও অপরটি তোমার মাতার উপযোগী এই বলে তিনি বনে গেলেন। কিন্তু চরু সেবন কালে সত্যবতীর জননী বললেন, সকলেই তো নিজের জন্য অতি গুণবান পুত্র চায়, তাই তোমার চরু আমাকে দাও ও আমারটি তুমি খাও। তাছাড়া আমার পুত্রকে তো পৃথিবী পালন

করতে হবে, আর ব্রাহ্মণের বলবীর্য সম্পত্তির কী প্রয়োজন! জননীর কথায় সত্যবতী নিজের চরু মাকে দিয়ে মায়ের চরু নিজে খেলেন।

বন থেকে ফিরে এসে ঋচীক সত্যবতীকে দেখে বললেন, এ তুমি কী অকাজ করেছ! তোমার শরীরে রুদ্র ভাব দেখে আমার মনে হচ্ছে যে তুমি তোমার মায়ের চরু খেয়েছ। এ কাজ তোমার করা উচিত হয় নি। তোমার মায়ের চরুতে আমি সমস্ত বীর্য সম্পদের সমাবেশ করেছিলাম, আর তোমার চরুতে সমাবেশ করেছিলাম শান্তি জ্ঞান মতি তিতিক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সম্পদের। বিপরীত কাজ করার জন্য তোমার পুত্র রৌদ্রাস্ত্রধারণ ও মারণাদিনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়াচারী হবে, আর তোমার মাতার পুত্র হবে শান্তির অভিলাষী ব্রাহ্মণাচারী। এই কথা শুনেই সত্যবতী ঋষির পা ধরে বললেন, অজ্ঞানতার জন্যই আমি এ কাজ করেছি। আমার পুত্র যেন এ রকম না হয়, বরং পৌত্র তাই হোক।

যথাসময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে ও তাঁর মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করলেন। সত্যবতী পরে কৌশিকী নামে নদী হয়েছিলেন এবং জমদগ্নি ইক্ষ্বাকু বংশের রেণু রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। তাঁরই গর্ভে জন্ম হয় ক্ষত্রিয় বংশের উচ্ছেদকারী নারায়ণের অংশভূত পরশুরামের।

দেবতারা ভৃগুবংশের শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের পুত্র রূপে প্রদান করেন বলে তাঁর দেবরাত নাম হয়। বিশ্বামিত্রের অন্যান্য পুত্রদের নাম মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক।

ধন্বন্তরির কথা ও রজি রাজার উপাখ্যান

পরাশর বললেন, পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ু বাহুর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর পাঁচটি পুত্রের নাম নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা। ক্ষত্রবৃদ্ধের কনিষ্ঠ পৌত্র গৃৎসমদের পুত্র শৌনক চাতুর্বর্ণের প্রবর্তক। জ্যেষ্ঠ পৌত্র কাশের পৌত্র দীর্ঘতমা। ধন্বন্তরি তাঁর পুত্র।

এঁর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মর্ত্য ধর্ম ছিল না এবং ইনি প্রাণীতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব জন্মে বিষ্ণু এঁকে বর দিয়েছিলেন যে ইনি এই বংশে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত আয়ুর্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করবেন ও যজ্ঞভাগী হবেন।

ধন্বন্তরির প্রপৌত্র দিবোদাস তাঁর পুত্র প্রতর্দনকে বৎস বলে ডেকেছিলেন বলে প্রতর্দনের অপর নাম বৎস। ইনি মদ্রশ্রেণ্য বংশের উচ্ছেদ করে শত্রু জয় করেছিলেন বলে নাম হয় শত্রুজিৎ। ইনি সত্যব্রত ছিলেন বলে এঁকে ঋতধ্বজও বলা হয় এবং কুবলয় নামে অশ্বলাভ করে কুবলয়াশ্ব নামে পৃথিবীতে প্রখ্যাত হন। এঁর পুত্র অলর্কের নামে একটি কথা প্রচলিত আছে। অলর্ক ছাড়া আর কোন রাজা যুবাবস্থায় ষাট হাজার ষাট শো বছর পৃথিবী ভোগ করতে পারেন নি। এই বংশেরই ভার্গভূমির সময়ে চতুর্বর্ণের প্রচার হয়।

আয়ুর অন্য পুত্র রজির পরাক্রমশালী পাঁচ শো পুত্র ছিল। একবার দেবাসুরের যুদ্ধের সময়ে উভয় পক্ষই ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বিরোধে কোন্ পক্ষ জয়ী হবে? ব্রহ্মা বললেন, রজি রাজা যার পক্ষে থাকবেন, তাদেরই জয় হবে। এই কথা শুনে দৈত্যেরা রজির নিকটে এসে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে রজি বললেন, দেবতাদের জয় করে যদি আপনারা আমাকে রাজা করেন, তাহলে আমি আপনাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে রাজী আছি। অসুররা বলল, আমরা এক রকম কথা বলে অন্য রকম আচরণ করব না। প্রহ্লাদ আমাদের রাজা, তাঁর জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ। কাজেই আমরা এ রকম অঙ্গীকারে বদ্ধ হতে পারব না। এই বলে তারা প্রস্থান করলে দেবতারা এসে একই প্রার্থনা জানালেন এবং রাজাও এই শর্ত আরোপ করলেন। কিন্তু দেবতারা স্বীকার করে বললেন, আপনিই আমাদের ইন্দ্র হবেন।

সুতরাং রজি দেবসৈন্য সহায় হয়ে অসুরদের বিনাশ করলেন। শত্রুপক্ষ পরাজিত হলে ইন্দ্র রজির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বললেন,

আপনি ভয় থেকে রক্ষা করেছেন বলে আমাদের পিতা। ত্রিলোকে আপনিই এখন সর্বোত্তম, কারণ আমি ইন্দ্র এখন আপনার পুত্র। রাজা হেসে বললেন, বেশ, তাই হোক। বৈরি পক্ষেরই চাটুবাক্য-যুক্ত প্রণতি অতিক্রম করা শক্ত, আর এ তো স্বপক্ষ। এই বলে রাজা স্বপুরে ফিরে এলেন।

কাজেই ইন্দ্রই রাজা রইলেন। কিন্তু রজি রাজা স্বর্গে যাবার পর নারদ ঋষির প্ররোচনায় রজির পুত্ররা ইন্দ্রের নিকট আচার অনুসারে রাজ্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ইন্দ্র অসম্মত হলে রজির বলশালী পুত্ররা ইন্দ্রকে পরাজিত করে নিজেরা রাজা হয়ে বসলেন।

অনেক দিন পরে ইন্দ্র এক দিন নির্জনে বৃহস্পতির সঙ্গে দেখা করে বললেন, কুলের আকারের ঘৃত দিয়ে কি আমার তৃপ্তি সাধন করতে পারবেন! বৃহস্পতি বললেন, তুমি যদি আগেই আমার কাছে চাইতে, তা হলে তোমার জন্যে আমি কী না করতাম! এবারে অল্প দিনের মধ্যেই আমি তোমাকে নিজ পদে অধিষ্ঠিত করছি। বলে তিনি রজির পুত্রদের বুদ্ধি মোহের জন্য অভিচার ক্রিয়া এবং ইন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধির জন্য হোম করতে আরম্ভ করলেন। তাতে রজির পুত্ররা বুদ্ধি মোহে বেদপরাঙ্মুখ, ধর্মত্যাগী ও ব্রহ্মদ্বেষী হলেন এবং ইন্দ্র অনায়াসে এঁদের হত্যা করে স্বর্গ অধিকার করতে পারলেন।

যযাতির উপাখ্যান

পরাশর বললেন, আয়ুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিযতি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র হয়। এঁরা সকলেই মহাবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু যতি রাজ্য চান নি বলে যযাতিই রাজা হন। তিনি শুক্রের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। দেবযানীর যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র হয়।

শুক্রের শাপে যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তারপর

শুক্র প্রসন্ন হলে তাঁর কথায় যযাতি তাঁর জরা অপরকে দেবার জন্য নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বললেন, তোমার মাতামহর শাপে অকালে আমি জরাগ্রস্ত হয়েছি, কিন্তু বিষয় ভোগে আমার এখনও তৃপ্তি হয় নি। এখন তাঁরই অনুগ্রহে আমি এই জরা এক হাজার বছরের জন্য তোমাতে সংক্রামিত করে বিষয় ভোগ করতে চাই। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরো না। কিন্তু যদু রাজী হলেন না দেখে যযাতি শাপ দিলেন, তোমার বংশে কেউ রাজ্য ভোগ করবার উপযুক্ত হবে না।

এই ভাবে যযাতি ক্রমে ক্রমে দ্রুহ্যু, তুর্বসু ও অণুর নিকটে গিয়ে নিজেদের যৌবনের বদলে তাঁর জরা গ্রহণের প্রার্থনা জানালেন ; কিন্তু একে একে সকলেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজা শেষে সকলের কনিষ্ঠ পুরুকেও এই কথা বললেন। পুরু তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আমার ওপরে এ আপনার মহান অনুগ্রহ। বলে তিনি পিতার জরা গ্রহণ করে নিজের যৌবন তাঁকে দান করলেন।

এর পর রাজা যযাতি নিয়মিত উৎসাহে বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। তিনি বিশ্বাচী নামের এক অপ্সরার সঙ্গে কামের অন্ত দেখবার জন্য নানা উপভোগে রত হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললেন, উপভোগে কখনও কামের তৃষ্ণা মেটে না, বরং আগুনে ঘৃতাহুতির মতো তা বৃদ্ধি পায়। অতএব তৃষ্ণাকেই ত্যাগ করা উচিত। এক হাজার বছর পূর্ণ হল, তবু মন আমার বিষয়ে আসক্ত, তৃষ্ণা প্রতি দিন বাড়ছে। এবারে আমি বনে গিয়ে ব্রহ্মে মন অর্পণ করব। এই বলে যযাতি পুরুর কাছ থেকে নিজের জরা গ্রহণ করে তাঁকে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে রাজ্যে অভিষেক করলেন এবং পূর্বে তুর্বসুকে, পশ্চিমে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণে যদুকে এবং উত্তরে অণুকে খণ্ড খণ্ড ভাবে রাজ্য দিয়ে বনে গেলেন।

যদুবংশ ও সহস্রবাহু অর্জুনের উপাখ্যান

পরাশর মৈত্রেয়কে বললেন, এর পর আমি তোমাকে যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশের কথা বলব। এই যদু বংশেই বিষ্ণু স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদুর এক পৌত্রের নাম হৈহয়, এই বংশে কৃতবীর্যের জন্ম, অর্জুন তাঁরই পুত্র। বিষ্ণুর অংশে অত্রিকুলোদ্ভব দত্তাত্রেয়র আরাধনা করে অর্জুন সহস্রবাহু হয়েছিলেন। বর পেয়েছিলেন যে তিনি ধর্মে পৃথিবী জয় ও প্রতিপালন করবেন, শত্রুর অপরাজেয় হবেন এবং কোন প্রখ্যাত পুরুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে। এই বরে অর্জুন সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রতিপালন করেন এবং দশ হাজার যজ্ঞ করেন। লোকে বলত যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বিনয় বা ইন্দ্রিয় সংযমে কোন রাজা কার্তবীর্য অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারবে না। তিনি পঞ্চাশ হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন।

এক দিন তিনি মদ্যপানে মত্ত হয়ে নর্মদার জলে অবগাহন ক্রীড়া করছিলেন। সেই সময়ে দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব বিজয়ের গর্বে রাবণ তাঁর মাহিষ্মতী নগরী আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি অনায়াসেই রাবণকে পশুর মতো বন্ধন করে নগরের এক নির্জন স্থানে রেখে দেন। ইনি বিষ্ণুর অংশে জন্ম পরশুরামের হাতে নিহত হন।

এই বংশে বৃষ্ণির জন্ম এবং তাঁর নামেই যদুকুল বৃষ্ণি সংজ্ঞা পেয়েছে। এঁরা যাদব নামে বিখ্যাত।

স্ত্রৈণ জ্যামঘের উপাখ্যান

এই যদু বংশেই জ্যামঘ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে জগতে যাঁরা স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন বা জন্মাবেন, তাঁদের মধ্যে শৈব্যাপতি জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ। শৈব্যার পুত্র ছিল না, অথচ পুত্রকাম হয়েও রাজা তাঁর ভয়ে অন্য পত্নী গ্রহণ করতে পারেন নি।

একবার এক প্রবল সংগ্রামে রাজা শত্রুসৈন্য পরাজিত করলেন। নগর ছেড়ে সবাই যখন পলায়ন করছিলেন, রাজা তখন এক বিলাপরত

রাজকন্যাকে দেখতে পেলেন। ভয়ে সেই কন্যার নয়ন চঞ্চল হয়েছিল বলে তাকে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল। অনুরাগে আকৃষ্ট হয়ে রাজা ভাবলেন, অপত্যের জন্যই বিধাতা বোধ হয় আমাকে এই কন্যা দিলেন, আমি একে বিবাহ করব। এখন সঙ্গে নিয়ে যাই, শৈব্যার অনুজ্ঞা পেলেই বিয়ে করব। এই ভেবে সেই রাজকন্যাকে রথে তুলে নিজের নগরে ফিরলেন।

রাণী শৈব্যা অমাত্য পরিজন ও ভৃত্যদের নিয়ে বিজয়ী রাজাকে দেখবার জন্য নগর দ্বারে উপস্থিত ছিলেন। রাজার বাম পাশে এই কন্যাকে দেখে কোপে অধর স্ফুরিত করে প্রশ্ন করলেন, রথে কাকে তুলে এনেছ? ভয় পেয়ে রাজা বললেন, এই কন্যা আমার পুত্রবধূ। শৈব্যা বললেন, আমার তো পুত্র নেই, তোমারও অন্য পত্নী নেই। তবে একে পুত্রবধূ বলছ কেমন করে? ভয়ে বিবেক নাশ হয়েছিল বলে অসম্বদ্ধ বাক্য পরিহারের জন্য রাজা বললেন, তোমার যে পুত্র হবে, ইনি তাঁরই স্ত্রী হবেন। শৈব্যা হেসে বললেন, বেশ, তাই হোক। বলে রাজার সঙ্গে তিনি নগরে প্রবেশ করলেন।

রাজা রাণীর এই আলাপ লগ্নহোরাংশক সময়ে হয়েছিল বলে সন্তান ধারণের বয়স অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও শৈব্যা অল্পকাল পরেই গর্ভবতী হলেন এবং কালক্রমে এক পুত্র প্রসব করলেন। জ্যামঘ এই পুত্রের নাম রাখলেন বিদর্ভ এবং যথাসময়ে বিদর্ভের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলেন।

স্যমন্তক মণির উপাখ্যান

পরাশর বললেন, এই বংশের সত্রাজিতের সখা হয়েছিলেন সূর্য। সত্রাজিত একদিন সমুদ্রের তীরে তন্ময় হয়ে সূর্যের স্তব করছিলেন। এই সময়ে সূর্য তাঁর সামনে উপস্থিত হন। তাঁকে অস্পষ্ট মূর্তিধর দেখে সত্রাজিত বললেন, আকাশে আপনাকে যেমন তপ্ত বহ্নি পিণ্ডের মতো দেখি, এখন তো অন্য রকম দেখছি না! এই কথা শুনে সূর্য

নিজের কণ্ঠদেশ থেকে স্যমন্তক নামের মণি খুলে এক জায়গায় রেখে দিলেন। তখন সত্রাজিত সূর্যকে ভাল করে দেখতে পেলেন—বপু তাম্রবর্ণ, হ্রস্ব ও উজ্জ্বল এবং নয়ন ঈষৎ পিঙ্গল। সূর্য বললেন, তুমি বর নাও। সত্রাজিত এই কথায় তাঁর স্যমন্তক মণি চাইলেন এবং সূর্য তাঁকে সেই মণি দিয়ে অন্তরিক্ষে স্বস্থানে চলে গেলেন। আর সত্রাজিত তা নিজের গলায় পরে সূর্যের মতো দীপ্যমান হয়ে দ্বারকায় প্রবেশ করলেন।

দ্বারকাবাসী সত্রাজিতকে দেখে বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ কৃষ্ণকে বললেন, সূর্য আপনাকে দেখতে আসছেন। এই কথা শুনে কৃষ্ণ হেসে বললেন, না, ইনি সূর্য নন। ইনি সত্রাজিত, সূর্যের স্যমন্তক মণি ধারণ করে এখানে আসছেন।

সত্রাজিত এই মণি নিজের গৃহে রেখে দিলেন। মণি প্রতি দিন আট ভরি করে সোনা প্রসব করতে লাগল এবং মণির প্রভাবে রাষ্ট্রে রোগ, অগ্নি, চৌর, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষাদি ভয় দূর হয়ে গেল। এই রকম রত্ন রাজা উগ্রসেনেরই ধারণ করা উচিত, এই ভেবে কৃষ্ণের সেই রত্নের জন্য লিপ্সা হল। কিন্তু শক্তি থাকলেও গোত্রভেদ ভয়ে তা হরণ করলেন না। কৃষ্ণের এই মণির লোভ হয়েছে বুঝতে পেরে সত্রাজিত ভয় পেলেন যে কৃষ্ণ হয়তো এই মণি তাঁর কাছে চেয়ে বসবেন। তাই তাঁর ভাই প্রসেনকে এই মণি দিয়ে দিলেন।

এই মণির এমন একটা গুণ ছিল যে শুদ্ধ অবস্থায় ধারণ করলে তা সোনা প্রসব করত, কিন্তু অশুচি অবস্থায় ধারণ করলে প্রাণ যেত। একদিন প্রসেন এই মণি ধারণ করে অশ্বারোহণে বনে গেলেন মৃগয়ায়। এক সিংহ তাকে বধ করল। সিংহ যখন মণি নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিল,.তখন ভল্লুকদের অধিপতি জাম্ববান সিংহকে হত্যা করে সেই মণি নিয়ে নিজের গুহায় প্রবেশ করে সুকুমার নামে বালককে সেটি খেলার জন্য দিলেন।

প্রসেন ফিরছে না দেখে যদু কুলে সবাই কানাকানি করতে লাগল

যে কৃষ্ণই তো মণির অভিলাষী ছিলেন, তা না পেয়ে তিনিই বোধহয় প্রসেনকে বধ করেছেন। এই লোকাপবাদ জানতে পেরে কৃষ্ণ যদু সৈন্যের সঙ্গে প্রসেনের অশ্বপদচিহ্ন অনুসরণ করে বনে গিয়ে দেখতে পেলেন যে এক সিংহ প্রসেন ও তার অশ্বকে বধ করেছে। সবাই যখন দেখে বিশ্বাস করল যে কৃষ্ণ নয়, সিহের হাতে প্রসেনের মৃত্যু হয়েছে, তখন কৃষ্ণ সিংহের পদচিহ্ন দেখে আরও কিছু দূর এগিয়ে দেখলেন যে ভল্লুকের হাতে নিহত হয়ে সিংহটি পড়ে আছে। এইবারে তিনি গিরিতটে সৈন্য সমাবেশ করে রেখে ভল্লুকের পদানুসরণ করে তার গুহায় প্রবেশ করলেন। অর্ধপ্রবিষ্ট হয়েই শুনতে পেলেন যে এক ধাত্রী কোন বালকের প্রলোভনের জন্য বলছে, তুমি রোদন কোরো না, এই স্যমন্তক মণি তোমারই। কৃষ্ণ তখন গুহায় প্রবেশ করে ধাত্রীর হাতে মণি দেখতে পেলেন এবং ধাত্রী এই মণির লোভে একজন পুরুষকে দেখে ত্রাহি ত্রাহি রবে চিৎকার করে উঠল। ধাত্রীর আর্তনাদ শুনে জাম্ববান ক্রুদ্ধ হয়ে এসে উপস্থিত হলেন এবং দুজনে যুদ্ধ আরম্ভ হল।

এদিকে যদু সৈন্যরা সাত আট দিন অপেক্ষা করে যখন দেখল যে কৃষ্ণ গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন না, তখন তারা কৃষ্ণ নিহত হয়েছেন ভেবে দ্বারকায় ফিরে সেই কথা প্রচার করে দিল। কৃষ্ণের বান্ধবরা তাঁর প্রেতক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। এঁদের প্রদত্ত অন্নজলে কৃষ্ণের বল ও প্রাণের পুষ্টি হল এবং প্রহারে ও খাদ্যাভাবে জাম্ববানের বলহানি হতে লাগল। একুশ দিন যুদ্ধের পর কৃষ্ণ জাম্ববানকে পরাজিত করলেন। তারপর জাম্ববান কৃষ্ণের পরিচয় জেনে তাঁকে তাঁর কন্যা জাম্ববতীকে সম্প্রদান করলেন এবং স্যমন্তক মণিও দিলেন। কৃষ্ণ জাম্ববতীকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এলেন এবং সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি দিয়ে মিথ্যা অপবাদ থেকে শুদ্ধ লাভ করলেন।

কৃষ্ণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করেছি ভেবে ভীত সত্রাজিত নিজের কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণের হাতে সম্প্রদান করলেন। কিন্তু

পূর্বে অক্রুর, কৃতবর্মা ও শতধন্বা এই কন্যাকে প্রার্থনা করেছিলেন বলে তাঁরা ভাবলেন যে সত্রাজিত তাঁদের অবজ্ঞা করলেন। অক্রুর ও কৃতবর্মা শতধন্বাকে বললেন, সত্রাজিত অতি দুরাত্মা, তাকে বিনাশ করে আপনি মণি নিচ্ছেন না কেন? কৃষ্ণ আপনার সঙ্গে শত্রুতা করলে আমরা আপনার সাহায্য করব।

এদিকে জতুগৃহ দাহনের পর পাণ্ডবদের প্রকৃত অবস্থা জেনেও কুলোচিত সৌজন্য দেখাবার জন্য কৃষ্ণ বারণাবতে গেলেন। এই সময়ে শতধন্বা নিদ্রিত সত্রাজিতকে বধ করে মণি গ্রহণ করলেন। পিতার হত্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে সত্যভামা রথারোহণে বারণাবতে গিয়ে কৃষ্ণকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বললেন, এখন যা উচিত তাই কর। মনে মনে তুষ্ট হলেও কৃষ্ণ মুখে বললেন, শতধন্বা আমারই অবমাননা করেছে, এ আমি সহ্য করব না। তুমি শোক ত্যাগ কর, আমি প্রতিবিধান করছি।

কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে নির্জনে বলদেবকে বললেন, সিংহের হাতে প্রসেনের মৃত্যু হয়েছে এবং সত্রাজিতকে হত্যা করেছে শতধন্বা। সুতরাং কোন অধিকারী না থাকায় স্যমন্তক মণি এখন আমাদের দুজনের সম্পত্তি। তাই রথে উঠে শতধন্বা বধের উদ্যোগ কর। বলদেব এ কথা মেনে নিলেন।

শতধন্বা এই সংবাদ পেয়ে কৃতবর্মার নিকটে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কৃতবর্মা বললেন, কৃষ্ণ ও বলদেবের সঙ্গে বিরোধে আমি সমর্থ নই। এর পরে শতধন্বা অক্রূরের সাহায্য চাইলেন। অক্রূর বললেন, জগতে এমন কেউ নেই যে চক্রধারী কৃষ্ণ ও হলধর বলদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ। আমার কী সাধ্য! আপনি অন্য কারও শরণ নিন। অক্রূরের কথা শুনে শতধন্বা বললেন, আপনি যদি আমার পরিত্রাণে অসমর্থ মনে করেন, তবে আমার এই স্যমন্তক মণি নিয়ে আমাকে রক্ষা করুন। অক্রূর বললেন, মরণ কালেও যদি আপনি এই মণির সন্ধান কাউকে না দেন, তবেই আমি এটা গ্রহণ

করতে পারি। শতধন্বা বললেন, তাই হবে। অক্রূর তখন ম| গ্রহণ করলেন এবং শতধন্বা এক বেগবতী বড়বা অর্থাৎ ঘোড়ায় চ পলায়ন করলেন।

চার অশ্বযুক্ত রথে কৃষ্ণ ও বলদেব অনুগমন করলেন শতধন্বাকে একশো যোজন পথ অতিক্রম করবার পর মিথিলার বনের কা শতধন্বার ঘোড়া প্রাণত্যাগ করলে তিনি পদব্রজেই পলায়ন কর লাগলেন। কৃষ্ণ বলদেবকে বললেন, তুমি এই রথেই অপেক্ষা ক আমি পায়ে হেঁটেই শতধন্বাকে অনুসরণ করে তাকে হত্যা করে ফি আসছি। এই বলে দু ক্রোশ এগিয়ে শতধন্বাকে দেখতে পেয়ে চক্র নিক্ষেপ করে তার মস্তক ছেদন করলেন। কিন্তু তাঁর দেহ ও ব অনুসন্ধান করে স্যমন্তক মণি পেলেন না। ফিরে এসে বলদেবকে বললেন, বৃথাই আমরা শতধন্বাকে বিনাশ করলাম। মণি তার কাছে নেই। এই কথা শুনে বলভদ্র কুপিত হয়ে বললেন, ধিক তোমাকে তুমি অর্থলিপ্সু। ভাই বলেই তোমার অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম এই পথে তুমি ফিরে যাও, তোমাতে বা দ্বারকায় আমার কো প্রয়োজন নেই। এই ভাবে কৃষ্ণকে তিরস্কার করে তিনি বিদেহ পুরাতে প্রবেশ করলেন। আর দ্বারকায় ফিরে গেলেন কৃষ্ণ।

বিদেহরাজ জনক সাদরে বলভদ্রকে নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন এইখানে অবস্থানের সময়ে দুর্যোধন তাঁর কাছে গদাযুদ্ধ শিক্ষ করলেন। তিন বৎসর পর বভ্রু, উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবরা বিদেহ পুরীতে এসে বলভদ্রকে শপথ করে বোঝালেন যে কৃষ্ণ মণি অপহরণ করেন নি এবং তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করে তাঁকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন।

এদিকে অক্রূর সেই মণির কাছে পাওয়া সোনায় অনেক যজ্ঞ করতে লাগলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে ব্রহ্মহত্যার পাপের ভয়ে যজ্ঞে দীক্ষিত অবস্থায় কৃষ্ণ তাঁকে বধ করে মণি গ্রহণ করতে পারবেন না। এইভাবে বাষট্টি বছর দ্বারকায় দুর্ভিক্ষ মড়কাদি কোন উপসর্গ হল

না। তারপর অক্রূর-পক্ষের ভোজরা শত্রুঘ্নকে বিনাশ করলে ভোজদের সঙ্গে অক্রূরও দ্বারকা ত্যাগ করে পলায়ন করলেন। আর তখন থেকেই দ্বারকায় উপসর্গ, হিংস্র জন্তুর ভয়, অনাবৃষ্টি ও মড়কাদি উপদ্রব শুরু হয়ে গেল।

বলদেব, উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণ বললেন, হঠাৎ এমন উপদ্রব শুরু হল কেন, তা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। এই কথা শুনে অন্ধক নামের এক বৃদ্ধ যাদব বললেন, অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক যেখানে বাস করতেন, সেখানে অনাবৃষ্টি ও মড়কাদি হত না। একবার কাশিরাজা তার রাজ্যে অনাবৃষ্টির জন্য শ্বফল্ককে নিয়ে যান। শ্বফল্ক সেখানে পৌঁছবামাত্র বর্ষণ হয়। সে সময়ে কাশিরাজের পত্নীর গর্ভে এক কন্যা ছিল। বারো বৎসরেও কন্যা ভূমিষ্ঠ হল না দেখে কাশিরাজ গর্ভস্থ কন্যাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি ভূমিষ্ঠ হচ্ছ না কেন? কন্যা উত্তর দিল, যদি প্রতি দিন ব্রাহ্মণকে একটি করে গাভী দান করেন, তবে আর তিন বৎসর পর আমি ভূমিষ্ঠ হব। রাজা তাই করলেন এবং তিন বৎসর পরে ঐ কন্যা জন্মালে তার নাম রাখলেন গান্দিনী আর গৃহাগত উপকারী শ্বফল্ককে ঐ কন্যা দান করলেন। গান্দিনীও যাবজ্জীবন একটি করে গাভী ব্রাহ্মণকে দান করেছেন। অক্রূর এঁদেরই সন্তান এবং তিনি চলে যাওয়াতেই এই মড়ক ও দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রব শুরু হয়েছে। অক্রূরের অপরাধ অন্বেষণে প্রয়োজন নেই, তাঁকে এখানে আনুন।

এই কথা সবাই মেনে নিয়ে তাঁরা অক্রূরকে দ্বারকায় আনলেন। আর তাঁর আসা মাত্র মণির প্রভাবে সব উপদ্রব শান্ত হল। কিন্তু কৃষ্ণ ভাবলেন যে গান্দিনীর পুত্র বলেই অক্রূরের এমন প্রভাব হতে পারে না, তা ছাড়া বেশি ধন না থাকা সত্ত্বেও অক্রূর একের পর আর এক যজ্ঞ করে থাকেন। কাজেই মনে হয় যে এঁর কাছেই স্যমন্তক মণি আছে। এই ভেবে কৃষ্ণ কোন প্রয়োজনে যাদবদের এক সভা করলেন। সভার কাজের পর প্রসঙ্গক্রমে হাস্য-পরিহাসের মধ্যে

অক্রুরের সঙ্গে পরিচয় করে বললেন, আমরা সবাই জানি যে শতধন্বা স্যমন্তক মণি আপনাকে অর্পণ করেছিলেন। রাজ্যের উপকারক এই রত্ন আপনার কাছেই থাক, এতে কোন ক্ষতি নেই। কেন না আমরা সেই রত্নের প্রসাদ ভোগ করছি। কিন্তু বলভদ্র আশঙ্কা করেছেন যে রত্ন আমার কাছে আছে। আপনি তাই আমাদের প্রীতির জন্য রত্নটি একবার তাঁকে দেখান।

রত্ন অক্রুরের কাছেই ছিল। তিনি ভাবলেন, এখন কী করা কর্তব্য। যদি মিথ্যা বলি, তাহলে অন্বেষণ করলেই বস্ত্রাবৃত রত্ন বেরিয়ে পড়বে এবং তাতে মঙ্গল হবে না। তাই অক্রুর বললেন, এই সেই স্যমন্তক মণি। শতধন্বা এটি আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আপনি চেয়ে নেবেন বলে এত কাল তা অনেক কষ্টে ধারণ করে আছি। তার জন্য ক্লেশে এত দিন কিছু উপভোগ করতে পারি নি। এবারে আপনি নিজে নিন, কিংবা যাকে ইচ্ছা ত দিন। এই বলে তিনি বস্ত্রের মধ্যে লুকানো একটি সোনার কৌ থেকে স্যমন্তক মণি বার করে সবার সামনে রাখলেন। তা কান্তিতে সভা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সবাই বিস্মিত হয়ে সাধু সা বলতে লাগলেন।

বলভদ্র ভাবলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে এই মণি আমারও উপভোগ্য পিতৃধন বলে সত্যভামারও মণির স্পৃহা হল। কৃষ্ণ তাঁদের মনো বুঝতে পেরে অক্রূরকে বললেন, এই রত্নে বলভদ্র ও আমার সমা অধিকার আর এটি সত্যভামার পিতৃধন। এ মণিতে আর কার অধিকার নেই। কিন্তু সর্বকালে শুচি থেকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে এই মণি ধারণ করলে রাজ্যের উপকার হয় এবং অশুচি অবস্থা ধারণ করলে মৃত্যু অনিবার্য। আমার ষোল হাজার স্ত্রী, তাই এটি ধারণ করতে অসমর্থ। সত্যভামাই বা কেমন করে এটি ধার করবেন। আর বলভদ্র কি মদিরা পানাদি উপভোগ ত্যাগ করবেন তাই আমি সকলের হয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি যে রাজ্যে

উপকারের জন্য আপনিই এটি ধারণ করুন। কৃষ্ণের কথায় অক্রুর নিজের কণ্ঠে এই মণি ধারণ করলেন।

শিশুপালের উপাখ্যান

পরাশর বললেন, অন্ধকের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুকুরের বংশে আহুকের জন্ম। দেবক ও উগ্রসেন নামে তাঁর দুই পুত্র ছিল। দেবকের চার পুত্র ও সাতটি কন্যা। তাদের মধ্যে কনিষ্ঠা দেবকী। বসুদেব এই সাতটি কন্যাকেই বিবাহ করেন। উগ্রসেনের পাঁচটি কন্যা ও নয়টি পুত্র, তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কংস। অন্ধকের দ্বিতীয় পুত্র ভজমানের বংশে শূরের জন্ম। তাঁরও পাঁচ কন্যা ও নয় পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম বসুদেব। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দেবতারা তাঁর গৃহে বিষ্ণুর অংশ অবতীর্ণ হবেন বলে অনেক দুন্দুভি বাদ্য করেছিলেন। এই জন্য বসুদেবের অন্য নাম আনকদুন্দুভি। বসুদেবের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম পৃথা। কুন্তিভোজ নামে এক সখা অপুত্রক ছিলেন বলে তাঁদের পিতা শূর বিধান অনুসারে পৃথাকে কুন্তিভোজের হাতে সমর্পণ করেন। পাণ্ডু পৃথাকে বিবাহ করেন এবং পৃথার গর্ভে ধর্ম বায়ু ও ইন্দ্রের যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। বিবাহের পূর্বে পৃথা সূর্যের পুত্র কর্ণের জন্ম দেন। এঁর মাদ্রী নামে এক সপত্নী ছিলেন। তিনি নকুল ও সহদেব নামে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দুই পুত্রের জন্ম দেন।

পৃথার এক ভগিনী শ্রুতশ্রবাকে চেদিরাজ দমঘোষ বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্রের নাম শিশুপাল। পূর্ব জন্মে ইনিই দৈত্যদের আদি পুরুষ হিরণ্যকশিপু ছিলেন। বিষ্ণুর হাতে নিহত হয়ে পরজন্মে তিনিই দশানন রাবণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। রামের হাতে নিহত হবার পর এঁরই জন্ম হয় শিশুপাল রূপে। কৃষ্ণ বিদ্বেষের জন্য তাঁরই হাতে নিহত হয়ে শিশুপালের মুক্তি হয়।

মৈত্রেয় প্রশ্ন করলেন, কৌতূহল বশে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা

করছি। হিরণ্যকশিপু ও রাবণ জন্মে বিষ্ণুর হাতে নিহত হয়ে কেন তাঁর মুক্তি হয় নি, আর শিশুপাল জন্মে কেন তা হল ?

পরাশর বললেন, নৃসিংহ যে বিষ্ণু, একথা হিরণ্যকশিপুর মনে হয় নি। রাবণ জন্মেও তাই। রাম যে বিষ্ণুর অংশ, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। কিন্তু শিশুপাল সব সময়েই দেখতে পেতেন যে তাঁকে বধের জন্য বিষ্ণু চক্র নিক্ষেপ করছেন।

বসুদেবের অনেক পত্নী ছিল। তাঁর এক পত্নী রোহিণীর পুত্র বলভদ্র। কংস দেবকীর ছয়টি পুত্র বিনাশ করবার পরে বলভদ্র রোহিণীর গর্ভে আসেন। ভগবৎ প্রেরিতা যোগনিদ্রা তাঁকে দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে রোহিণীর জঠরে নিয়ে যান। এই জন্যই বলভদ্রের নাম হয় সঙ্কর্ষণ। দেবকীর অষ্টম গর্ভে অবতীর্ণ হন কৃষ্ণ। যোগনিদ্রাও নন্দগোপের পত্নী যশোদার গর্ভে জন্ম নেন।

কৃষ্ণের ষোল হাজার একশো পত্নী ছিল। তাঁদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, জলহাসিনী প্রভৃতি আটজন প্রধান। তাঁর পুত্রদের সংখ্যা আট অযুত ও আট লক্ষ। তাদের মধ্যে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সাম্ব প্রভৃতি তেরোজন প্রধান। প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যা ককুদ্বতীকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র অনিরুদ্ধ। ইনি রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন এবং বজ্র নামে তাঁর এক পুত্র হয়। এই ভাবে যদুকুলে শত সহস্র পুরুষের জন্ম হয়। একশো বছরেও তাঁদের পরিচয় জানা যায় না। বলা হয় যে যদুকুলের কুমারদের ধনুর্বিদ্যা শেখাবার জন্য তিন কোটি আটাশি লক্ষ আচার্য সর্বদা নিযুক্ত থাকতেন। দেবাসুর সংগ্রামে যে দৈত্যরা নিহত হয়েছিল, তারাই যদু বংশে জন্ম নিয়েছিল এবং এদেরই জন্ম দেবার জন্য কৃষ্ণ যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

যযাতির বংশ

পরাশর বললেন, যযাতি ও দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশের পর তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র তুর্বসুর বংশে মরুত্ত অনপত্য ছিলেন। তাই তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরুর বংশের দুষ্মন্তকে পুত্র রূপে কল্পনা করেন। যযাতি ও শর্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যুর বংশের রাজারা উদীচ্যাদি ম্লেচ্ছদের অধিপতি ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র অনুর বংশে বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা নামে ঋষি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটি পুত্রের জন্ম দেন। এঁদের নামানুসারে পাঁচটি দেশের নামও অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি হয়েছে। অঙ্গের বংশে একজন দশরথ আছেন, তাঁর অপর নাম রোমপাদ। রোমপাদের কোন পুত্র কন্যা ছিল না বলে দশরথ তাঁর নিজের কন্যা শান্তাকে তাঁর কন্যা রূপে দান করেন। পরে তাঁর তুরঙ্গ নামে একটি পুত্র হয়। তুরঙ্গের পৌত্র চম্প চম্পা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের জয়দ্রথ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শঙ্কর থেকে উৎপন্ন পত্নীর গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। বিজয়ের বংশে অধিরথ পৃথার পরিত্যক্ত পুত্র কর্ণকে একটি কাষ্ঠ-পিঞ্জরের মধ্যে পেয়েছিলেন। কর্ণের পুত্র বৃষসেন।

যযাতি ও শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশে দুষ্মন্তের জন্ম। এর পুত্র ভরত চক্রবর্তী রাজা হন। ভরত নাম হবার কারণ সম্বন্ধে দেবতারা বলেন যে মাতা একটি চর্ম পাত্রের আধার মাত্র, পুত্রের উপর পিতারই অধিকার। কাজেই হে দুষ্মন্ত, তুমি এই পুত্রের ভরণ কর।

ভরতের নয়টি পুত্র হয়। কিন্তু কোন পুত্রই তাঁর অনুরূপ নয়, ভরত এই কথা বলায় তাঁর পত্নীরা পরিত্যক্ত হবার ভয়ে পুত্রদের বিনাশ করেন। এর পর ভরত মরুৎ স্তোম নামে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে মরুৎগণ বৃহস্পতির বীর্যে ও উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে উৎপন্ন ভরদ্বাজ নামে এক পুত্র তাঁকে প্রদান করেন। ভরদ্বাজের নামকরণ সম্বন্ধেও একটি কথা প্রচলিত আছে। এই পুত্রের জন্মের পর

বৃহস্পতি মমতাকে বলেছিলেন, তুমি একে ভরণ কর এবং মমতা বৃহস্পতিকে বলেছিলেন, তুমি ভরণ কর। বলে দুজনেই প্রস্থান করলে পুত্রের ভরদ্বাজ নাম হয়।

ভরদ্বাজের বংশে হস্তী হস্তিনা নামে পুরী নির্মাণ করেন। হস্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব এবং কণ্বের পুত্র মেধাতিথি থেকে কাণ্বায়ন দ্বিজদের উৎপত্তি হয়েছে। এই বংশের হর্যশ্বের পাঁচটি পুত্রের সম্বন্ধে পিতা মন্তব্য করেছিলেন যে তারা তাঁর অধীন পাঁচটি দেশ রক্ষা করতে সক্ষম। এর জন্য এঁদের পাঞ্চাল নাম হয়। এই পুত্রদের মধ্যে মুদ্‌গলের বংশে জাত ক্ষত্রিয়রা কোন কারণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে মৌদ্‌গল্য নামে অভিহিত হন। মুদ্‌গলের পুত্র বৃদ্ধাশ্ব, এঁর দিবোদাস ও অহল্যা নামে পুত্র-কন্যা জন্মে। অহল্যার পুত্র শতানন্দ। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি ধনুর্বেদে পারদর্শী হয়েছিলেন। একদিন উর্বশীকে দেখে শরগুচ্ছে তাঁর বীর্যপাত হয়। তার থেকে জন্ম হয় এক পুত্র-কন্যার। রাজা শান্তনু মৃগয়ায় এসে এদের দেখতে পেয়ে কৃপাবশে গ্রহণ করেন। তাই পুত্রের নাম কৃপ ও কন্যার নাম কৃপী হয়। কৃপীর বিবাহ হয় দ্রোণের সঙ্গে এবং অশ্বত্থামা তাঁদের পুত্র। দিবোদাসের বংশে দ্রুপদের জন্ম, তাঁর দুই পুত্রের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধৃষ্টকেতু।

অজমীঢ়ের আর এক পুত্র ঋক্ষ। ঋক্ষর পুত্র সংবরণ ও পৌত্র কুরু। এই কুরু ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের উপরিচর বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বৃহদ্রথ। তাঁর একটি পুত্র জন্মকালে দুখণ্ডে বিভক্ত থাকে। জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুই খণ্ড একটি করায় পুত্রের নাম জরাসন্ধ হয়। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, পৌত্র সোমাপি ও প্রপৌত্র শ্রুতশ্রবা মগধের রাজা ছিলেন।

কুরুর বংশে প্রতীপের তিন পুত্র দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যেই অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন বলে শান্তনু রাজা হন। শান্তনু সম্বন্ধে এই কথা বলা হয় যে তিনি কোন বৃদ্ধকে স্পর্শ করলে

সেই বৃদ্ধ যৌবন লাভ করত এবং তাঁর স্পর্শে সবাই শান্তি লাভ করত বলেই তাঁর নাম হয় শান্তনু। একবার এঁর রাজ্যে বারো বছর বৃষ্টি হচ্ছে না দেখে শান্তনু ব্রাহ্মণদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণরা বললেন, এই রাজ্য আপনার অগ্রজ দেবাপির, যতদিন তিনি কোন দোষাচরণ না করেন ততদিন এ রাজ্য তাঁরই প্রাপ্য। এই কথা শুনে শান্তনুর মন্ত্রী অশ্মসারী বনে দেবাপির নিকট এক বেদবাদ বিরোধ বক্তাকে পাঠালেন এবং সে সেই সরলমতি রাজপুত্রের বুদ্ধিকে বেদ-বিরুদ্ধ মার্গানুসারী করল। এদিকে রাজা শান্তনু যখন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অগ্রজকে রাজ্য দেবার জন্য বনে এলেন এবং ব্রাহ্মণরা দেবাপিকে রাজ্য গ্রহণে অনুরোধ করলেন, তখন দেবাপি তাঁদের যুক্তি-দূষিত ও বেদ-বিরুদ্ধ অনেক কথা বললেন। তাই শুনে ব্রাহ্মণরা শান্তনুকে বললেন, এ বিষয়ে আর আগ্রহ দেখাবার প্রয়োজন নেই, আপনি ফিরে চলুন, বেদ-বিরোধী কথা বলে ইনি পতিত হয়েছেন। ফিরে এসে শান্তনু আবার রাজত্ব করতে লাগলেন এবং পর্জন্যদেবও বারি বর্ষণ করলেন। প্রতীপের কনিষ্ঠ পুত্র বাহ্লীকের পুত্র সোমদত্ত; পৌত্র তিনজন, তাদের নাম ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল্য।

শান্তনুর পুত্র ভীষ্মের জন্ম গঙ্গার গর্ভে, সত্যবতী নামে অন্য এক পত্নীর গর্ভে জন্ম হয় বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদের। বাল্যকালেই চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ হয় কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার। কিন্তু অতিরিক্ত উপভোগের জন্য যক্ষ্মা রোগে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এর জন্য সত্যবতীর নিয়োগানুসারে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং এক দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম দেন।

ধৃতরাষ্ট্রের একশো পুত্র হয়। কিন্তু পাণ্ডু মৃগরূপধারী এক ঋষির শাপে প্রজননে অক্ষম হন বলে তাঁর পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন নামে তিন পুত্রের এবং অন্য পত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্রের জন্ম দেন।

দ্রৌপদীর পাঁচটি পুত্র হয়, তার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের পুত্র সুতসোম, অর্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্তি, নকুলের পুত্র শতানীক ও সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্মা। এ ছাড়াও পাণ্ডবদের আরও অনেক পুত্র ছিল। যুধিষ্ঠিরের পত্নী যৌধেয়ীর পুত্র কেবক, ভীমের পত্নী হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ ও কাশীর পুত্র সর্বত্রগ, নকুলের পত্নী করেণুমতীর পুত্র নিরমিত্র এবং সহদেবের পত্নী বিজয়ার পুত্র সুহোত্র। অর্জুনের পত্নী নাগকন্যা উলুপীর ইরাবান, মণিপুর রাজকন্যার পুত্র বভ্রুবাহন এবং সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু। কুরুকুল ক্ষীণ হবার পর ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে অশ্বত্থামা অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরার গর্ভ ভস্মীভূত করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের প্রভাবে ঐ গর্ভ পুনর্জীবন লাভ করে পরীক্ষিতের জন্ম হয়। এই পরীক্ষিৎ এখন দেশ শাসন করছেন।

ভাবী রাজাদের বিবরণ

পরাশর বললেন, এবারে আমি ভবিষ্য রাজাদের বিষয়ে বলব। পরীক্ষিতের চারজন পুত্র হবে--জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। জন্মেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদাধ্যয়ন ও কৃপের নিকট শস্ত্রবিদ্যালাভ করে পরে বিষয়ে বিরক্ত-চিত্ত হবেন এবং শৌনকের উপদেশে আত্মবিজ্ঞান প্রবণ হয়ে নির্বাণ মুক্তি লাভ করবেন। কলি যুগে এই বংশের শেষ রাজা হবেন ক্ষেমক।

এই বারে ইক্ষ্বাকু বংশের ভবিষ্য রাজাদের কথা বলছি। বৃহদ্বলের পুত্ররা সুমিত্র পর্যন্ত রাজত্ব করবেন। কলি যুগে এঁর পরেই এই বংশ শেষ হয়ে যাবে।

মগধে বৃহদ্রথের বংশের রাজারা এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন। এই বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয়ের সুনিক নামে এক অমাত্য রাজাকে হত্যা করে নিজের পুত্র প্রদ্যোতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবে। নন্দিবর্ধন পর্যন্ত এই বংশের পাঁচজন রাজা একশো আটত্রিশ বছর রাজত্ব করবেন। তাঁর পুত্র শিশুনাগ, মহানন্দী পর্যন্ত এই বংশের

দশজন রাজা তিনশো বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করবেন। বিম্বসার ও অজাতশত্রু এই বংশের পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজা। শূদ্রার গর্ভে মহানন্দীর মহাপদ্মানন্দ নামে অতি লোভী এক পুত্র হবে। সেই ব্যক্তি পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করবে এবং তার সময় থেকেই শূদ্ররা রাজা হবে। এই বংশের রাজ্য ভোগের কাল একশো বছর। তারপর কৌটিল্য নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দ বংশের উচ্ছেদ করে শূদ্র মৌর্য বংশের চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার এবং তাঁর পুত্র অশোকবর্ধন। এই বংশের দশজন রাজা একশো সাঁইত্রিশ বছর রাজত্ব করবেন।

তারপর শুঙ্গ বংশের রাজারা রাজত্ব করবেন। এঁদের পুষ্পমিত্র নামে এক সেনাপতি রাজাকে হত্যা করে রাজত্ব করবেন। এঁর বংশের দশজন রাজা একশো বার বছর রাজত্ব করবার পর দেবভূতি নামে কণ্ব বংশীয় একজন অমাত্য রাজাকে হত্যা করে নিজে রাজা হবেন। এই বংশের চারজন রাজা পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করবার পর শিপ্রক নামে অন্ধ্র জাতীয় একজন ভৃত্য কণ্ব বংশের শেষ রাজা সুশর্মাকে বধ করে রাজা হবেন। এঁরা ত্রিশজন রাজা চারশো ছাপ্পান্ন বছর রাজত্ব করবেন। তারপর সাতজন আভীর ও দশজন গর্দভিল রাজা হবার পর ষোলজন শক বংশীয় ও আটজন যবন রাজা হবেন। এই ভাবে একে একে চোদ্দজন তুখার, তেরোজন মুণ্ড ও এগারোজন মৌন এক হাজার তিনশো নিরানব্বই বছর রাজত্ব করবেন। পৌর বংশীয় এগারজন রাজা রাজত্ব করবেন তিনশো বছর। তারপর কৈলবিল নামে যবনরা একশো ছয় বছর রাজত্ব করবেন। এর পরেও এদের তেরোজন, বাহ্লীক বংশীয় তিনজন, পুষ্পমিত্র প্রভৃতি তেরোজন, মেকল-দেশজাত সাতজন ও নয়জন কোশলে রাজা হবেন। পরে নিষধ দেশীয় নয়জন রাজা হবেন।

এর পর মগধে বিশ্বস্ফটিক নামে একজন রাজা অন্য বর্ণের প্রবর্তন করবেন এবং ক্ষত্রিয় জাতির উচ্ছেদ করে ব্রহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী

কৈবর্ত, কটু ও পুলিন্দদের রাজ্যে স্থাপিত করবে। পদ্মাবতীতে নয়জন নাগবংশীয় এবং গঙ্গা ও প্রয়াগের নিকট কান্তিপুরী ও মথুরায় মাগধ ও গুপ্তরা রাজা হবেন। দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশল, ওড্র, তাম্রলিপ্ত ও সমুদ্র তটের পুরীগুলিকে রক্ষা করবে। কলিঙ্গ, মাহিষিক, মাহেন্দ্র ও ভীমরা গুহা রক্ষা করবেন। মণিধার বংশীয়রা নৈষাদ, নৈনিষিক ও কালতোয় জনপদ ভোগ করবে। কনক বংশীয়রা স্ত্রীরাজ্য ও মূষিক নামে জনপদ ভোগ করবে। তখন পতিত ব্রাহ্মণ, আভীর ও শূদ্রাদি জাতি সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, শূদ্র, অর্বুদ ও মরুভূমি প্রভৃতি বিষয় ভোগ করবে। সিন্ধু তট, দার্বীকোষী, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ ম্লেচ্ছ ও ব্রাত্য শূদ্ররা ভোগ করবে।

এই রাজারা সর্বদা অপ্রসন্ন, কোপান্বিত স্বভাব, মিথ্যা ও অধর্মে রুচিবান, স্ত্রী-বালক ও গোবধকারী, পরধন লোভী, অল্পশক্তি ও উদয়াস্তের ন্যায় স্বল্পায়ু হবেন। আর্য ও ম্লেচ্ছরা বিপরীত বৃত্তি অবলম্বন করে প্রজাক্ষয় করবে। প্রতি দিন ধর্ম ও অর্থের হ্রাস হবে। অর্থ কুল ও ধর্মের কারণ হবে, অভিরুচি মাত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন হবে, বিচারে মিথ্যার জয় হবে, স্ত্রী হবে উপভোগের কারণ। যার যত রত্ন ও অর্থ থাকবে, সে ততই পৃথিবী উপভোগ করবে। যজ্ঞোপবীত বিপ্রত্বের হেতু, চিহ্ন ধারণ আশ্রমের হেতু, অন্যায় জীবিকা নির্বাহের হেতু এবং দুর্বলতা অবৃত্তির হেতু হবে। ভয় দেখিয়ে চিৎকার হবে পাণ্ডিত্যের লক্ষণ, সদ্‌বেশধারী হবেন সৎপাত্র, দূরবর্তী জল তীর্থ বলে পরিগণিত হবে। যিনি বলবান, তিনিই ভোগ করবেন পৃথিবী। অতি লোলুপ রাজার করভারে প্রজারা আশ্রয় নেবে গিরি কন্দরে। মানুষ আর তেইশ বছরও বাঁচবে না।

এই ভাবে কলি যুগ অন্তিম দশায় উপনীত হলে সম্ভল গ্রামের ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে অবতীর্ণ হবেন কল্কি অবতার। তিনিই সব ম্লেচ্ছ, দস্যু ও দুরাত্মাদের ক্ষয় করে পুনরায় ধর্ম স্থাপন করবেন।

পরীক্ষিতের জন্ম থেকে নন্দর অভিষেক পর্যন্ত কালের পরিমাণ

পনর হাজার বছর। কৃষ্ণ যত দিন তাঁর পায়ে পৃথিবী স্পর্শ করে থাকতেন, তত দিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করে নি। কৃষ্ণ স্বর্গে যাবার পরই যুধিষ্ঠির অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখে পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষেক করেছিলেন। নন্দের রাজ্যকাল থেকেই কলি বৃদ্ধি পাবে।

মানুষের সংখ্যায় কলি তিন লক্ষ ষাট হাজার বছর বিদ্যমান থাকবে। তারপর আবার আসবে সত্যযুগ। পুরু বংশের রাজা দেবাপি ও ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা মরু ভবিষ্যৎ মনুবংশের বীজ রূপে অবস্থিতি করছেন। সত্য যুগে এঁরা কলাপ গ্রাম আশ্রয় করে ক্ষত্র বংশের প্রবর্তন করবেন।

চতুর্থাংশ সমাপ্ত

পঞ্চমাংশ

কৃষ্ণের জন্ম

মৈত্রেয় বললেন, আপনি তো রাজাদের বংশ বিস্তারের কথা বললেন, এইবারে আমার যদুকুলে উৎপন্ন বিষ্ণুর অবতারের কথা বিস্তারিত ভাবে শোনবার ইচ্ছা হচ্ছে। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি কী করেছিলেন, তা আমাকে বলুন।

পরাশর বললেন, পুরাকালে বসুদেব দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহে ভোজ বংশের কংস সারথি হয়ে দম্পতির রথ চালনা করছিলেন। সেই সময়ে আকাশ থেকে মেঘ-গম্ভীর স্বরে দৈববাণী হয়েছিল, পতির সঙ্গে যাকে তুমি রথে নিয়ে যাচ্ছ, তাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার প্রাণ হরণ করবে। কংস এই কথা শুনেই খড়্গ নিয়ে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন বসুদেব বললেন, দেবকীকে আপনি বধ করবেন না, এর গর্ভে উৎপন্ন সব সন্তানকে আমি আপনার হাতে সমর্পণ করব। বেশ, তাই হবে, বলে কংস দেবকীকে হত্যা করলেন না।

এই সময়ে পৃথিবী নানা ভাবে পীড়িত হয়ে সুমেরু পর্বতে দেবতাদের নিকটে গেলেন এবং দেবতাদের প্রণাম করে করুণ ভাষায় তাঁর দুঃখের কথা বললেন, সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যরা মর্ত্যলোকের প্রজাদের অহর্নিশি ক্লেশ দিচ্ছে। কালনেমিকে বিষ্ণু বধ করেছিলেন, সে এখন উগ্রসেনের পুত্র কংস রূপে জন্মগ্রহণ করেছে। অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ, বাণাসুর প্রভৃতি আরও কত দুরাত্মা রাজগৃহে জন্মেছে তার সংখ্যা আমি জানি না। এই সব গর্বিত দৈত্যদের সৈন্যের ভার আমি আর বহন করতে পারছি না। আপনারা আমার ভার কমান, যাতে আমি রসাতলে না যাই।

পৃথিবীর এই কথা শুনে ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন, আসুন, আমরা

ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর তটে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করে তাঁকে সব নিবেদন করি। ব্রহ্মা এই কথা বলে দেবতাদের নিয়ে ক্ষীর সমুদ্রের তটে গিয়ে বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বললেন, তোমরা যা চাও বল, তা সিদ্ধ হবে বলেই জেনো। তারপর নিজের সাদা ও কালো দুই গাছি কেশ নিয়ে বললেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তার দুঃখ দূর করবে। বসুদেবের পত্নী দেবকীব অষ্টম গর্ভে জন্মে আমি কংসরূপী কালনেমিকে বধ করব। তোমরাও আপন অংশে পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। বিষ্ণুর এই কথায় দেবতারা সুমেরু পর্বতে ফিরে এসে পৃথিবীতে জন্ম নিতে লাগলেন।

নারদ কংসকে বললেন, বিষ্ণু দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম নেবেন। কংস এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবকী ও বসুদেবকে গুপ্ত ভাবে গৃহে আবদ্ধ করে রাখলেন। আব বসুদেব তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে পুত্রের জন্ম হলেই কংসের হাতে সমর্পণ করতে লাগলেন। শোনা যায় যে প্রথম ছয়টি গর্ভে হিরণ্যকশিপুর পুত্র ছিল। বিষ্ণুর মহামায়া যোগনিদ্রা অবিদ্যায় সমস্ত জগৎ মোহিত করে রেখেছেন। বিষ্ণু তাঁকে আদেশ করেছিলেন পাতালের এই ছয়জনকে দেবকীর গর্ভে স্থাপন করতে। বলেছিলেন, এর পরে শেষ নামে আমার অংশ সপ্তম গর্ভে সমুৎপন্ন হবে। তুমি এই গর্ভে কারাগার থেকে নিয়ে গিয়ে গোকুলে বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কোরো। লোকে বলবে, দেবকীর এই গভ পতিত হয়েছে। কিন্তু এই বীর সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হবেন। এর পর আমি দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করব। তুমিও অবিলম্বে যশোদার গর্ভে প্রবেশ কোরো। বর্ষাকালে শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীতে নিশীথ রাত্রে আমি জন্ম নেব, তুমি নবমীতে জন্ম নিও। আমার শক্তিতে বসুদেব আমাকে যশোদার শয্যায় ও তোমাকে দেবকীর শয্যায় আনবে। তারপর কংস তোমাকে যখন পাথরে নিক্ষেপ করবে, তুমি আকাশে অবস্থান কোরো। ইন্দ্র তোমাকে

ভগিনী বলে গ্রহণ করবেন। তুমি শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যদের বিনাশ করে বিন্ধ্য জালন্ধর প্রভৃতি স্থান স্থাপন করবে।

বিষ্ণুর আদেশে যোগনিদ্রা সবই করলেন। দেবকীর প্রথম ছয়টি গর্ভ স্থাপনের পর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করলেন। বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করলে যোগনিদ্রা তার পরের দিন যশোদার গর্ভে সম্ভূত হলেন। মধ্য রাত্রে বিষ্ণুর জন্মের সময়ে মেঘ মৃদু গর্জন করেছিল, অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন, গন্ধর্বরা গান ও অপ্সরারা নৃত্য করেছিল। তিনি চতুর্ভুজ হয়ে জন্মেছিলেন এবং তাঁর বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। কংসের ভয়ে ভীত বসুদেব বললেন, এই দিব্য রূপ ত্যাগ কর, এ কথা জানতে পারলে কংস আজই আমার সর্বনাশ করবে। দেবকী বললেন, তোমার এই চতুর্ভুজ রূপ সংবরণ কর, রাক্ষসের অংশে জন্ম এই কংস যেন তোমাকে অবতার বলে জানতে না পারে।

সেই রাত্রেই বসুদেব পুত্রকে নিয়ে বাহিরে গেলেন। সেখানকা রক্ষীদের ও মথুরার দ্বারপালদের যোগনিদ্রা মোহিত করেছিলেন অনন্ত নাগ তাঁর ফণার আচ্ছাদনে বৃষ্টিধারা থেকে রক্ষা করে বসুদেবে অনুগমন করলেন। অতি গভীর ও নানা ঘূর্ণিতে পূর্ণ যমুনা জা পরিমিত জলেই অতিক্রম করে বসুদেব কংসের কর নিয়ে আগা নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে যমুনাতটেই দেখতে পেলেন। এই সময়ে সবাই মোহাচ্ছন্ন হলে যশোদাকেও বিমোহিত করে যোগনিদ্র ভূমিষ্ঠ হলেন। বসুদেব যশোদার শয্যায় বালককে রেখে সেই কন্যাকে নিয়ে শীঘ্র প্রত্যাগমন করলেন।

জাগ্রত হয়ে যশোদা দেখলেন নীল পদ্মপত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ পু এবং দেবকীর কারাগারে শিশুর ধ্বনি শুনে রক্ষীরা কংসকে দেবকীর প্রসব বার্তা দিল। তৎক্ষণাৎ কংস এসে সেই কন্যাকে তুলে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কন্যা আকাশেই রইলেন এব

অষ্টভুজা রূপ ধারণ করে হেসে বললেন, তোমাকে বধ করবার জন্য বিষ্ণু জন্ম নিয়েছেন। বলে অন্তর্হিত হলেন।

উদ্বিগ্ন চিত্তে কংস প্রলম্ব, কেশী, ধেনুক, পূতনা, অরিষ্ট প্রভৃতি অসুরদের ডেকে বললেন, আমার বলবীর্যে তাপিত হয়ে দুরাত্মা দেবতারা আমাকে বধ করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি ভয় পাই না। অল্পবীর্য ইন্দ্র, তপস্বী মহাদেব বা ছিদ্রপথে অসুরঘাতী বিষ্ণুর কত ক্ষমতা আমি জানি। বসু, আদিত্য, অগ্নি ও আমার বাহুবলে পরাজিত দেবতাদের ক্ষমতা আমার অজ্ঞাত নয়। আমার সঙ্গে যুদ্ধে পিঠে বাণ নিয়ে ইন্দ্রকে পালাতে কি তোমরা দেখ নি? আমার রাজ্যে ইন্দ্র যখন অনাবৃষ্টি করেছিল, তখন আমার বাণে ছিন্নভিন্ন মেঘ থেকে কি যথোপযুক্ত জল বর্ষণ হয় নি! গুরু জরাসন্ধ ছাড়া আর সব রাজারা কি ভয়ে আমার নিকট নত হয় নি! দেবতাদের প্রতি আমার অবজ্ঞা আছে, এখন তারা আমাকে বধ করবার চেষ্টা করছে দেখে হাসি পাচ্ছে। তবু সেই দুষ্ট ও দুরাত্মাদের অপকার করা আমার কর্তব্য। পৃথিবীতে যারাই যাগশীল ও যশস্বী আছে, দেবতাদের অপকার করার জন্য তাদের সবাইকে বধ করতে হবে। দেবকীর গর্ভজাত বালিকা বলেছে যে আমার হত্যাকারী উৎপন্ন হয়েছে। তাই বলবান বালক দেখলেই তাকে বধ করতে হবে।

কংস অসুরদের এই আদেশ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করে বললেন, বৃথাই আমি আপনার সন্তানদের বিনষ্ট করেছি, এর জন্য অনুতাপ করবেন না, তাদের অদৃষ্টে এই রকম মৃত্যু নির্দিষ্ট ছিল।

পূতনা বধ ও শকট ভঞ্জন

বসুদেব কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে নন্দের শকটের নিকটে এসে তাঁকে পুত্র লাভ করে আনন্দিত দেখলেন। বসুদেব বললেন, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার পুত্র হয়েছে, এ অতি ভাগ্যের কথা। রাজার বার্ষিক

কর তো দেওয়া হয়েছে, এখনও এখানে বসে আছেন কেন ? আপনারা শীঘ্র গোকুলে যান। রোহিণীর গর্ভজাত আমার এই পুত্রকেও আপনি নিজের এই পুত্রের মতো রক্ষা করবেন। বসুদেবের এই কথায় নন্দ প্রভৃতি গোপরা কর প্রদানের পর শূন্য ভাণ্ডগুলি শকটের উপরে রেখে গোকুলে গেলেন।

তাঁরা যখন গোকুলে বাস করছিলেন, তখন এক রাতে বালক-ঘাতিনী পূতনা নিদ্রিত কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্তন্য দান করছিল। রাতে পূতনা কাউকে স্তন্য দিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সকল অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর হাত দিয়ে দৃঢ় ভাবে তার স্তন ধরে পূতনার প্রাণের সঙ্গে পান করতে লাগলেন। তাতেই স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হয়ে ম্রিয়মাণ পূতনা ভয়ঙ্কর শব্দ করে ভূমিতে পড়ল। সেই শব্দে জাগ্রত হয়ে ব্রজবাসীরা দেখল যে কৃষ্ণ পূতনার ক্রোড়ে। যশোদা তাঁকে কোলে নিয়ে গোপুচ্ছ বুলিয়ে তাঁর বালদোষ দূর করলেন; নন্দও কৃষ্ণের মাথায় গোময় চূর্ণ দিয়ে যথা বিধানে স্বস্তি বাচন করলেন। তারপর শকটের নিচে দোলায় কৃষ্ণকে শুইয়ে দিলেন। গোপরা পূতনার বিরাট দেহ দেখে বিস্মিত ও ভীত হয়েছিল।

এক দিন শকটের নিচে দোলায় শুয়ে কৃষ্ণ স্তন্য পানের জন্য পা ছুঁড়ে কাঁদছিলেন। তাঁর পাদ প্রহারে শকট উল্টে কুম্ভ ও ভাণ্ডগুলি ভেঙে গেল। গোপ ও গোপীরা হাহাকার করতে করতে এসে বলল, শকট কে ওল্টাল ? বালকেরা বলল, কৃষ্ণ শকট উল্টেছে। এ কথা শুনে গোপরা আরও বেশি আশ্চর্য হল। বিস্মিত নন্দ কৃষ্ণকে কোলে নিলেন এবং যশোদা ভগ্ন ভাণ্ডের কপালিকা ও শকট পূজা করলেন

গর্গ মুনি গোপদের অজ্ঞাতসারে দুই বালকের সংস্কার ও নামকরণ করলেন। জ্যেষ্ঠের রাম ও কনিষ্ঠের কৃষ্ণ নাম হল। অল্প সময়েই তাঁরা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগলেন এবং গায়ে গোময় ও ভস্ম মেখে যখন তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন, তখন যশোদা বা রোহিণী তাঁদের ধরতে পারতেন না। বালকরা কখনও গো গৃহে কখনও বা সদ্যোজাত

গাবৎসের পুচ্ছ ধরে খেলা করতেন। যশোদা এক দিন কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে উদূখলে বেঁধে রাখলেন। কিন্তু তিনি গৃহকর্মে ব্যস্ত হতেই কৃষ্ণ এক জোড়া অর্জুন গাছের মাঝখান দিয়ে সেই উদূখল টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। তাতে গাছ দুটি ভেঙে পড়ল। তার শব্দে ব্রজবাসীরা এসে দেখল যে গাছ দুটি ভেঙে পড়েছে এবং কৃষ্ণ কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় তাঁর নবোদ্গত দাঁত বার করে হাসছেন। এই ঘটনার পর কৃষ্ণের নাম হল দামোদর। দাম বা দড়ি দিয়ে বাঁধা উদর যার, তিনিই দামোদর।

এর পরেই ভীত নন্দ বৃদ্ধ গোপদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন যে এ স্থানে বাস করা ঠিক নয়। কারণ এখানে পূতনার বিনাশ, শকটের বিপর্যয় এবং বিনা ঝড়ে বৃক্ষের পতন প্রভৃতি উৎপাত দেখা দিয়েছে। কাজেই এখান থেকে বৃন্দাবনে যাওয়া হোক। এই স্থির করে ব্রজবাসীরা পরিবারবর্গের সঙ্গে শকট ও গোধন চালনা করে যাত্রা করলেন এবং বৃন্দাবনে এসে শকটীবাট পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে বাস করতে লাগলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ মাথায় ময়ূরপুচ্ছ ও কানে ফুল গুঁজে বেণু, মৃদঙ্গ ও পাতার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, খেলে ও গরু চরিয়ে বেড়াতে লাগলেন। সাত বছর বয়সেই এই দুই বালক বৎসদের পালক হয়ে উঠলেন।

তারপর বর্ষা নামল। সারা দিন বনে বিচরণ করে সন্ধ্যায় তাঁরা ব্রজে ফিরতেন।

কালিয়দমন, ধেনুকাসুর ও প্রলম্বাসুর বধ

এক দিন কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে না নিয়ে বৃন্দাবনে গেলেন এবং বনফুলের মালা গলায় পরে বিচরণ করতে করতে যমুনার তীরে কালিয়নাগের বিষাগ্নিতে সন্তপ্ত এক ভীষণ হ্রদ দেখতে পেলেন। হ্রদ থেকে উত্থিত বিষাগ্নিতে গাছপালা দগ্ধ হয়ে গিয়েছে, বাতাসে উৎক্ষিপ্ত জলের স্পর্শে আকাশের পাখিরাও দগ্ধ হচ্ছে। কৃষ্ণ ভাবলেন যে

তাঁর বাহন গরুড়ের ভয়ে কালয় সাগর ত্যাগ করে যমুনাকে দূষিত করেছে। গরু ও গোপরা তৃষ্ণার্ত হয়েও নদীর জল পান করতে পারে না। কাজেই ব্রজবাসী যাতে নির্ভয়ে এই জল ব্যবহার করতে পারে, তার জন্য এই নাগকে দমন করা উচিত। এই ভেবে কৃষ্ণ কোমরের বস্ত্র বেঁধে নিকটের এক কদম্ব বৃক্ষের শাখায় উঠে সেই হ্রদে লাফিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণের বাহু তাড়নার শব্দ পেয়ে কালিয়নাগ অনেক বিষাক্ত সর্পে পরিবৃত্ত হয়ে দ্রুত এসে উপস্থিত হল। ক্রোধে রক্তবর্ণ তার নেত্র, আর মুখ থেকে আগুনের ঝলক বার হচ্ছিল তাদের পত্নীরাও এল এবং সকলে কৃষ্ণকে বেষ্টন করে দংশন করতে লাগল।

কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখে গোপরা ব্রজে গিয়ে চিৎকার করে বলল কৃষ্ণ কালিয় হ্রদে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে ও সর্পরা তাকে খেয়ে ফেলছে। এই কথা শুনে গোপ ও গোপীরা সেখানে ছুটে এল যশোদা, নন্দ ও বলরামও তাদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন যে সর্প কুণ্ডলে বেষ্টিত কৃষ্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন। যশোদা ও নন্দ কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু অন্যান্য গোপীরা শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, আমরাও ঐ হ্রদে প্রবেশ করব, ব্রজে আর আমরা ফিরে যাব না। কৃষ্ণ না থাকলে গোকুল আমাদের বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে।

গোপীদের এই বিলাপ শুনে এবং যশোদাকে মূর্ছিত, নন্দকে দীন ও গোপীদের ভয়ে বিহ্বল দেখে বলরাম সঙ্কেতে কৃষ্ণকে বললেন, তুমি এমন মানুষের মতো আচরণ কেন করছ! দুরাত্মাকে এইবারে দমন কর! বলরাম কৃষ্ণকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই কৃষ্ণ সহাস্যে আস্ফালন করে নিজের দেহ মুক্ত করলেন এবং দুই হাতে কালিয়র ফণা নত করে তার উপরে উঠে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর পাদপ্রহারে কালিয় মূর্ছিত হল ও রক্ত বমন করতে লাগল। তাই দেখে তার পত্নীরা বলল, আমরা তোমাকে চিনতে পেরেছি প্রভু

নাগরাজ মরে যাচ্ছেন, আমাদের পতির প্রাণ আমরা ভিক্ষা চাইছি। কালিয়ও ক্লান্ত দেহে বলল, আপনি প্রসন্ন হোন, আমার জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন। কৃষ্ণ বললেন, তুমি যমুনার জল ত্যাগ করে সপরিবার সমুদ্রে যাও। তোমার মাথায় আমার পদচিহ্ন দেখে গরুড় তোমাকে কষ্ট দেবে না। এই কথা বলে কালিয়কে মোচন করলে তারা সবাই কৃষ্ণকে প্রণাম করে সমুদ্রে চলে গেল।

গোপরা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে চোখের জলে তাঁর মাথা ভিজিয়ে দিল। গোপীরা গান গেয়ে কৃষ্ণকে ব্রজধামে ফিরিয়ে আনল।

আর এক দিন গোচারণে রত বলরাম ও কৃষ্ণ বনে বেড়াতে বেড়াতে এক রমণীয় তাল বনে এসে উপস্থিত হলেন। ধেনুক নামে গর্দভাকৃতি এক দৈত্য সেই তাল বনে বাস করত। পাকা তাল দেখে লুব্ধ গোপরা বলল, তালের গন্ধে চারি দিক আমোদিত হচ্ছে। আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে এই ফল খেতে। গোপদের এই কথা শুনে বলরাম ও কৃষ্ণ তাল পাড়তে লাগলেন। সেই শব্দ পেয়ে ধেনুক ক্রোধ ভরে এসে পিছনের দুই পায়ে বলরামের বুকে আঘাত করল। কিন্তু বলরাম তার দুই পা ধরে আকাশ পথে ঘোরাতেই সে প্রাণত্যাগ করল। বলরাম তাকে তাল গাছের উপরে নিক্ষেপ করলেন। সেই আঘাতে আরও অনেক তাল নিচে পড়ল।

এই সংবাদ পেয়ে আগত দৈত্য গর্দভের আরও অনেক জ্ঞাতিকে বলরাম ও কৃষ্ণ অনায়াসে তাল গাছের মাথায় নিক্ষেপ করলেন। এই ভাবে অনুচরদের সঙ্গে গর্দভাসুর নিহত হলে গরু, গোপ ও গোপীরা স্বচ্ছন্দে সেই তাল বনে বিচরণ করতে লাগল।

তারপর বলরাম ও কৃষ্ণ ভাণ্ডীর নামে বটবৃক্ষের নিচে এসে নানা রকম ক্রীড়া ও ব্যায়াম করতে লাগলেন। এই সময়ে প্রলম্ব নামে একজন অসুর তাঁদের হরণ করবার জন্য গোপ বেশ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হল। তাঁদের অসাবধানতার সুযোগ অন্বেষণের সময়ে কৃষ্ণকে দুর্ধর্ষ বলে সেই অসুরের মনে হল। সবাই মিলিত

হয়ে হরিণাক্রীড়ন নামে এক খেলা শুরু করলেন। তাতে দুজন মিলিত হয়ে লক্ষ্য স্থানে যাবেন। কৃষ্ণ শ্রীদামের সঙ্গে, বলরাম প্রলম্বের সঙ্গে এবং অন্য বালকরা জোড়ায় জোড়ায় দৌড়তে লাগলেন। এতে কৃষ্ণ শ্রীদামকে ও বলরাম প্রলম্বকে পরাজিত করলেন এবং পরাজিত বালকরা বিজয়ী বালকদের কাঁধে নিয়ে ভাণ্ডীর বৃক্ষের নিচে ফিরে এল।

কিন্তু প্রলম্ব বলরামকে কাঁধে নিয়ে সেখানে না ফিরে দ্রুত যেতে লাগল। বলরামের ভার বেশি মনে হওয়াতে সে বিশাল দেহ ধারণ করল। এই ভাবে অপহৃত হতে দেখে বলরাম কৃষ্ণকে বললেন, এই দেখ, কোন দৈত্য আমাকে হরণ করছে। কৃষ্ণ হেসে বললেন, সব জেনেও এই মানুষ ভাব অবলম্বন করছ কেন! নিজের আত্মাকে স্মরণ করে এই দানবকে হত্যা করে বন্ধুদের মঙ্গল কর।

কৃষ্ণ এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই ক্রোধে বলরামের চক্ষু রক্তবর্ণ হল। প্রলম্বাসুরকে পীড়িত করে বলরাম তার মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করলেন। সেই প্রহারে তার দুই চক্ষু বহির্গত হল ও মস্তিষ্ক নিষ্কাশিত হল। রক্ত বমন করতে করতে অসুরের মৃত্যু হল।

গোপ বালকেরা প্রশংসা করল বলরামের এবং তাঁরা গোকুলে ফিরে এলেন।

গোবর্ধন পূজা ও ইন্দ্র-কৃষ্ণ সংবাদ

পরাশর বললেন, এই ভাবে বর্ষা অতীত হয়ে শরৎকাল উপস্থিত হল। এই সময়ে এক দিন কৃষ্ণ ব্রজে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে ব্রজবাসীরা ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ করতে উদ্যত হয়েছেন। বৃদ্ধ গোপদের দেখে কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, এ কোন্ ইন্দ্র-যজ্ঞের জন্য আপনারা হর্ষ প্রকাশ করছেন? তাঁর প্রশ্ন শুনে নন্দ গোপ বললেন, বর্ষাকালে দেবরাজ ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন। তাতে আমাদের গাভীরা বৃষ্টির জন্য বর্ধিত শস্যে হৃষ্ট ও পুষ্ট হয়ে দুগ্ধ ধারণ করে। তাই আমরা

ইন্দ্র-যজ্ঞ করি। এই কথা শুনে কৃষ্ণ বললেন, ত্রয়ী, তর্কশাস্ত্র, দণ্ডনীতি ও বার্তা—এই চার প্রকার বিদ্যার মধ্যে কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন বার্তার অন্তর্গত। আমরা কৃষি বা বাণিজ্যজীবী নই, আমরা বনচর এবং গাভীই আমাদের দেবতা। বনের সীমা রূপে পর্বতের অবস্থান। কাজেই পর্বতই আমাদের শ্রেষ্ঠ গতি। গাভী ও গিরি আমাদের দেবতা। তাই আজ থেকে ইন্দ্র-যজ্ঞের পরিবর্তে গিরি-যজ্ঞের প্রবর্তন করুন। আমরা গোবর্ধন গিরির পূজা করব। নন্দ বললেন, খুবই যুক্তিযুক্ত কথা, এখন থেকে গিরি-যজ্ঞ প্রবর্তিত হোক।

ব্রজবাসীরা তখন গিরি-যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। দধি, পায়স ও মাংসাদি দিয়ে শৈল বলি প্রদান করলেন। শত সহস্র ব্রাহ্মণ ও অভ্যাগতদের ভোজন করালেন। অর্চিত গাভী ও বৃষভরাও শৈল প্রদক্ষিণ করল। পর্বত শিখরে কৃষ্ণ এক বিচিত্র মূর্তি ধারণ করে গোপদের প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করলেন এবং নিজের রূপে গোপদের সঙ্গে শিখরে আরোহণ করে গিরি পূজা করলেন। গিরিদেব অন্তর্হিত হলে বরপ্রাপ্ত গোপরা গোষ্ঠে ফিরে এলেন।

কিন্তু নিজের যজ্ঞ প্রতিহত হবার জন্য ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে সংবর্তক মেঘদের বললেন, দুর্বুদ্ধি নন্দ গোপ কৃষ্ণের কথায় গর্বিত হয়ে আমার উৎসব ভঙ্গ করেছে। তোমরা তাদের গাভীদের বায়ু ও বৃষ্টি দিয়ে পীড়িত কর। ইন্দ্রের কথায় মেঘরা গোধন বিনাশের জন্য ভয়ঙ্কর বায়ু ও বারি বর্ষণ শুরু করল। ক্ষণকালের মধ্যে সেই ধারা বর্ষণে পৃথিবী, আকাশ ও চারি দিক একাকার হয়ে গেল। কিছু গরু তাদের কটি, উরু ও গ্রীবা অবসন্ন হওয়ায় প্রাণত্যাগ করল, কিছু বৎসহীন হল। কৃষ্ণ এদের এবং গোপ ও গোপীদের দুর্দশা দেখে ভাবলেন যে তাঁরই গোষ্ঠকে রক্ষা করা উচিত। তাই তিনি গোবর্ধন পর্বতকে উৎপাটন করে এক হাতে অবলীলাক্রমে ছত্রের মতো ধারণ করে বললেন, তোমরা নির্ভয়ে গিরিমূল গর্তে প্রবেশ কর। কৃষ্ণের কথায়

গোপ ও গোপীরা গাড়িতে তাদের ভাণ্ড তুলে গোধন নিয়ে পর্বতের নিচে আশ্রয় নিলেন।

ইন্দ্রের প্রেরিত মেঘরা সাত রাত্রি বর্ষণ করল এবং কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে গোকুল রক্ষা করলেন। তারপর আকাশ মেঘশূন্য হলে গোকুলবাসী স্বস্থানে ফিরে এলেন এবং কৃষ্ণ পর্বতকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

কৃষ্ণ এই ভাবে গোবর্ধন ধারণ করে গোকুল রক্ষা করলেন দেখে ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে গোবর্ধন পর্বতে এসে কৃষ্ণকে দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন যে জগতের রক্ষাকর্তা গোপ দেহে গরু চরাচ্ছেন এবং অদৃশ্য ভাবে গরুড় পাখা বিস্তার করে তাঁর মাথায় ছায়া প্রদান করছে। তখনই ইন্দ্র হাতির উপর থেকে অবতরণ করে সহাস্যে বললেন, আপনার নিকটে কেন এসেছি তা শুনুন। আপনি গরদের ইন্দ্র, তাই আপনার গোবিন্দ নাম হোক। তারপর তিনি ঐরাবতের ঘণ্টার জল নিয়ে কৃষ্ণের অভিষেক করে বললেন, পৃথিবীর ভার হরণের জন্য আমার অংশ পৃথার গর্ভে অর্জুন নামে জন্ম নিয়েছে। আপনার কাজে অর্জুন আপনাকে সাহায্য করবে, আপনি তাকে সর্বদা রক্ষা করবেন।

কৃষ্ণ বললেন, আপনার পুত্র যে ভরত বংশে জন্ম গ্রহণ করেছে, আমি তা জানি। আমি যত দিন পৃথিবীতে থাকব, তত দিন কেউ তাকে জয় করতে পারবে না। কংস, অরিষ্ট, কুবলয়াপীড়, কেশী, নরক প্রভৃতি অসুররা নিহত হবার পর এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধেই আমি ভূভার হরণ করব।

এই কথা শুনে ইন্দ্র কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে ঐরাবতে চড়ে স্বর্গে গেলেন এবং কৃষ্ণ গাভীদের নিয়ে ব্রজে ফিরে এলেন।

কৃষ্ণের রাসলীলা ও বৃষভাসুর বধ

পরাশর বললেন, ইন্দ্র স্বর্গে যাবার পর গোপালরা কৃষ্ণকে বললেন, এই যে আপনি অক্লেশে পর্বত ধারণ করে মহাভয় থেকে আমাদের রক্ষা করলেন, আপনাকে মানুষ বলে আমাদের মনে হচ্ছে না। ক্ষণকাল মৌন থেকে কৃষ্ণ বললেন, আমি দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ বা দানব নই। আমি তোমাদের বান্ধব রূপেই জন্মেছি। এ ছাড়া অন্য কিছু তোমরা ভেবো না। এই কথা শুনে গোপরা বনে চলে গেলেন।

তারপর নির্মল আকাশে শরতের চাঁদ, ফুল্ল কুমুদিনীর সৌরভে চারিদিক আমোদিত ও মধুকর গুঞ্জিত বনরাজি দেখে কৃষ্ণের ইচ্ছা হল গোপীদের সঙ্গে রতির। তিনি তখন নানা তন্ত্রী-স্বরের মিশ্রণে ও সুন্দর পদবিন্যাসে বনিতাদের প্রিয় গান গাইতে লাগলেন। গোপীরা সেই গান শুনে গৃহ ত্যাগ করে কৃষ্ণের কাছে ছুটে আসতে লাগলেন। গোপীদের মধ্যে কেউ ধীরে ধীরে গান গাইতে আরম্ভ করলেন, কেউ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ডেকে লজ্জিত হলেন, কেউ বা প্রেমান্ধা হয়ে লজ্জা ত্যাগ করে কৃষ্ণের পাশে উপস্থিত হলেন। কেউ মনে মনে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন, কেউ বা বহির্ভাগে গুরুজনকে দেখে গৃহের মধ্যে থেকেই কৃষ্ণের চিন্তায় তন্ময় হলেন। কোন গোপকন্যা নিরুচ্ছ্বাসে কৃষ্ণকে চিন্তা করতে করতে মুক্তিলাভ করলেন। রাস আরম্ভে উৎসুক কৃষ্ণ গোপী পরিবৃত হয়ে শরৎ চন্দ্রে মনোরম রাত্রিকে সম্মানিত করলেন।

কৃষ্ণ স্থানান্তরে গেলে গোপীরা কৃষ্ণ চেষ্টার অধীন হয়ে বৃন্দাবনে বিচরণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণের প্রতি নিরুদ্ধ হৃদয়ে কেউ বললেন, আমি কৃষ্ণ, আমার ললিত গতি তোমরা দেখ। কেউ বললেন, আমিই কৃষ্ণ, আমার মধুর গীতি তোমরা শোন। কোন গোপী তাঁর বাহু আন্দোলন করে বললেন, স্থির হও দুষ্ট কালিয়, আমি কৃষ্ণ। কোন গোপী বললেন, তোমরা নির্ভয়ে থাক, আমি গোবর্ধন ধারণ

করে আছি। আবার কোন গোপী কৃষ্ণ লীলার অনুকরণ করে বললেন, ধেনুকাসুরকে আমি বিনাশ করেছি, তোমরা নির্ভয়ে বিচরণ কর। গোপীরা মিলিত হয়ে এই ভাবে কৃষ্ণ লীলা করে রম্য বৃন্দাবনে বিচরণ করতে লাগলেন। কোন কমললোচন গোপ বরাঙ্গনা মাটির দিকে চেয়ে বললেন, এই দেখ, লীলাললিতগামী কৃষ্ণের ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পদ্মাঙ্কিত পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আরও দেখ, তাঁর সঙ্গে কোন পুণ্যবতী নারী মদালস ভাবে চলেছিল, তারও ছোট ও ঘন পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এইখানে কৃষ্ণ তাঁর পায়ের আঙুলে ভর করে পুষ্প চয়ন করেছেন, আর এইখানে তিনি তাঁর সঙ্গিনীকে ফুল দিয়ে সাজিয়েছেন। আর এই পথে তিনি একা ফিরে গেছেন।

এই ভাবে পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে নিরাশ হয়ে গোপীরা যমুনা তীরে এসে কৃষ্ণ চরিত্র গান করতে লাগলেন। তার পরেই তাঁরা কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। বিকশিত পদ্মের মতো সুন্দর মুখ দেখে কেউ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না, কেউ বা তাঁদের ভ্রমর নেত্রে কৃষ্ণের মুখ-পঙ্কজের মধু পান করতে লাগলেন। আবার কেউ যোগিনীর মতো নিমীলিত নেত্রে কৃষ্ণের রূপের ধ্যান করতে লাগলেন।

কাছে এসে কৃষ্ণ কারও সঙ্গে প্রিয়ালাপ করে, কাউকে দৃষ্টিতে ভ্রূভঙ্গি করে, কারও বা কর স্পর্শ করে অনুনয় করতে লাগলেন। তারপরে এই প্রসন্নচিত্ত গোপীদের সঙ্গে রাস গোষ্ঠী রচনা করে খেলায় প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু সবাই কৃষ্ণের কাছে থাকবার জন্য স্থির হয়ে রইলেন বলে রাস মণ্ডল তৈরি হল না। কৃষ্ণ তখন নিজের হাতে এক একজনকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাস মণ্ডল রচনা করে রাসলীলা শুরু করলেন।

গোপীদের হাতের চঞ্চল বলয়ে মধুর শব্দ উঠল এবং তাঁরা শরৎ বর্ণনার কাব্য গাইতে লাগলেন। কৃষ্ণও চাঁদ, কৌমুদী ও কুমুদ সরোবর নিয়ে গান করতে লাগলেন। কোন গোপী শুধু কৃষ্ণ নামই গাইতে

লাগলেন, কেউ তাঁর শ্রান্ত বাহুলতা কৃষ্ণের কাঁধে রাখলেন, আবার কোন নিপুণ গোপী তাঁর গানের স্তুতির ছলে বাহু প্রসারিত করে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করলেন। কৃষ্ণেরও দুই হাত কোন গোপীর কপোল স্পর্শে পুলকিত ও ঘর্মাক্ত হল। কৃষ্ণ যখন উচ্চ স্বরে গান ধরলেন, গোপীরা তখন দ্বিগুণ স্বরে 'সাধু সাধু' বলতে লাগলেন।

কৃষ্ণ এমন ভাবে গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন যে তাঁর ক্ষণকালের বিরহ তাঁরা কোটি বৎসরের মতো মনে করতে লাগলেন। পিতা ভ্রাতা ও পতিরা নিবারণ করা সত্ত্বেও রতিপ্রিয়া গোপীরা রাতে কৃষ্ণের সঙ্গে রমণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণও তাঁর কিশোর বয়স সম্মানিত করে প্রতি রাত্রেই তাঁদের সঙ্গে রমণ করতে লাগলেন।

এক দিন সন্ধ্যার অবসানে কৃষ্ণ রাসে আসক্ত আছেন, এমন সময় অরিষ্ট নামে এক অসুর এসে গোষ্ঠের ত্রাস সঞ্চার করল। বৃষভ রূপধারী সেই দৈত্য গাভীদের গর্ভপাত করত এবং তাপসদের বিনষ্ট করে বনে বিচরণ করত। সজল মেঘের মতো কালো তার দেহ, তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ ও সূর্যের মতো চক্ষু। পুচ্ছ তুলে সে তার জিহ্বা দিয়ে ওষ্ঠ লেহন করছিল। এই অসুরকে দেখে গোপ ও গোপীরা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ তাই শুনে হাতে তালি দিয়ে সিংহনাদ করলেন এবং অরিষ্টাসুর তাঁর দিকেই ধাবিত হল। কৃষ্ণ পালালেন না, বরং হেসে অবজ্ঞা ভরে তার শৃঙ্গ ধরে নিজের জানু দিয়ে তার কুক্ষিতে আঘাত করলেন এবং দু হাতে তার কণ্ঠ পীড়ন করতে লাগলেন; একটি শৃঙ্গ উৎপাটিত হতে তাই দিয়ে এমন তাড়না করলেন যে রক্ত বমন করে দৈত্যের মৃত্যু হল।

কেশী বধ ও অক্রূর সংবাদ

পরাশর বললেন, নারদ কংসের নিকট কৃষ্ণের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করলেন। কংস কুপিত হয়ে যাদবদের সভায় বসুদেবকে তিরস্কার

করে কী কর্তব্য তাই চিন্তা করতে লাগলেন। বুঝতে পারলেন যে বালক অবস্থাতেই বলরাম ও কৃষ্ণকে বধ করা উচিত, কারণ দৃঢ় যৌবনে তাদের বধ করা অসাধ্য হবে। স্থির করলেন যে চানূর ও মুষ্টিক নামে তাঁর দুই পরাক্রান্ত অনুচরের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধে তাদের বধ করাবেন। ধনুর্যজ্ঞ নামে এক মহা যজ্ঞের ছলে তাঁদের ব্রজ থেকে আনাবেন। এর জন্য শ্বফল্কের পুত্র অক্রূরকে গোকুলে পাঠাবেন। এও ভাবলেন যে বালকদের হত্যা করতে বৃন্দাবনবাসী বলবান অসুর কেশীকে পাঠাবেন। অথবা ব্রজ থেকে আগত বসুদেবের এই দুই পুত্রকে তাঁর হাতী কুবলয়াপীড়ই বধ করতে পারবে।

এই সব ভেবে তিনি অক্রূরকে সব কথা জানালেন। বললেন, আমার প্রীতির জন্য আপনি রথে গোকুলে যান। আগামী চতুর্দশী তিথিতে এখানে ধনুর্যজ্ঞ হবে। তার জন্য বসুদেবের দুই পুত্রকে আনুন। আমার মল্লযোদ্ধা চানূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে তাদের মল্লযুদ্ধ সকলে দেখবে। কিংবা আমার হাতী কুবলয়াপীড় তাদের বিনাশ করবে। তারপর আমি দুষ্ট গোপদের গোধন ও বিত্ত হরণ করব। আমার দোষদর্শী অন্য যাদবদের বধের চেষ্টাও করব। তারপর আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য শাসন করব। আপনি গোকুলে গিয়ে গোপদের এমন কথা বলবেন যে তারা যেন মহিষের দুধের ঘৃত ও দধি প্রভৃতি উপহার নিয়ে আসে।

কংসের এই আজ্ঞা লাভ করে কৃষ্ণকে দেখতে পাবেন বলে অক্রূর আনন্দিত হলেন। 'তাই হবে' বলে রথে আরোহণ করে তিনি মথুরাপুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এ দিকে কংসের দূতের কথায় কেশী বৃন্দাবনে উপস্থিত হল। অশ্বরূপধারী সেই দৈত্যের হ্রেষারবে ভয়ার্ত গোপ ও গোপীরা 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে কৃষ্ণকে ডাকলেন। কৃষ্ণ বললেন, তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? তারপর কেশীকে বললেন, এ দিকে আয়, আমি তোর সব দাঁত উপড়ে দেব। বলে নিজের বাহু প্রসারিত করে কেশীর মুখে

ঢুকিয়ে দিলেন। তার দাঁতগুলো ভেঙে মাটিতে পড়তে লাগল এবং বাহুর বৃদ্ধিতে তার ওষ্ঠদ্বয় উৎপাটিত হয়ে ফেনার সঙ্গে রক্ত বমি হতে লাগল। চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে এল এবং মুখব্যাদান করে অসুর মাটিতে পড়ল, দুই ভাগে বিভক্ত হল তার শরীর।

কেশী নিহত হয়েছে দেখে গোপরা বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। আকাশে প্রচ্ছন্ন থেকে নারদ বললেন, এই যুদ্ধ দেখবার জন্য আমি স্বর্গ থেকে এখানে এসেছি। এই কেশীর হ্রেষারবে দেবতারা ও ইন্দ্রও ভয় পেতেন। আপনি অবলীলাক্রমে একে বধ করলেন বলে আজ থেকে লোকে আপনাকে কেশব বলবে। পরশু কংস বধের সময়ে আবার আমি আসব।

নারদ প্রস্থান করলে কৃষ্ণ গোপ ও গোপীদের সঙ্গে গোকুলে প্রবেশ করলেন।

কৃষ্ণকে দর্শনের আশায় অক্রূর একা রথে মথুরা থেকে বেরিয়ে নন্দের গোকুলে এলেন। পথে আসতে আসতে তিনি ভাবলেন যে তাঁর চেয়ে ধন্য আর কেউ নেই, কেননা তিনি বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ কৃষ্ণকে দেখতে পাবেন ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করবেন। এই সব চিন্তা করতে করতে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে তিনি গোকুলে পৌঁছলেন এবং গাভীদের দোহন স্থানে গিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখতে পেলেন। তাঁর মুখ বিকশিত ও সর্বাঙ্গ পুলকিত হয়ে উঠল। 'আমি অক্রূর' বলে তিনি কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর ধ্বজ-বজ্র-পদ্ম চিহ্নিত হাতে স্পর্শ করে প্রীতির সঙ্গে কাছে টেনে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁকে নিজেদের গৃহে নিয়ে গেলেন। আহারাদির পর অক্রূর তাঁদের সব বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন। দুরাত্মা কংস বসুদেব ও দেবকীকে কী রকম ভর্ৎসনা করেন, উগ্রসেনের প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহার এবং কী উদ্দেশে তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন, সব কথা বললেন। কৃষ্ণ বললেন, ঐ সবই আমরা জানি। যে উপায়ে কার্য

সিদ্ধি হবে, তাই আমরা অবলম্বন করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ত্রিরাত্রির মধ্যেই সানুচর কংসকে আমি বিনাশ করব।

রাত্রে অক্রূর নন্দ গোপের গৃহে সুখে নিদ্রা গেলেন। তার পর নির্মল প্রভাতে কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁর সঙ্গে মথুরা যাত্রার উদ্যোগ করলেন। তাই দেখে গোপীরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং তাঁদের হাতের কঙ্কণ ঢিল হয়ে গেল। সাশ্রু নয়নে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁরা বলতে লাগলেন, কৃষ্ণ মথুরায় গেলে আর কেন গোকুলে ফিরবেন? তখন তিনি নগরবাসিনীদের সঙ্গেই মধুর আলাপে তৃপ্ত থাকবেন। তাদের বিলাসবাক্যে আসক্ত হলে আর কেন গ্রাম্য গোপীদের কথা মনে পড়বে! ক্রূর-হৃদয় অক্রূর দ্রুত রথ চালনা করছেন। রথচক্রে যে ধুলো উড়ছে তাতে কৃষ্ণকে আর দেখা যাচ্ছে না। রথের ধুলোও আর দেখা যাচ্ছে না।

মধ্যাহ্নে তাঁরা যমুনা তটে উপস্থিত হলেন। অক্রূর কৃষ্ণকে বললেন, যমুনায় আহ্নিক করে যতক্ষণ আমি না ফিরি ততক্ষণ আপনারা এই রথেই থাকুন। বলে অক্রূর যমুনার জলে স্নান আচমন করে পরম ব্রহ্মের চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সময়ে তিনি যমুনার জলে সহস্র ফণার মালায় বাসুকি রম্ভাদি সর্পে বেষ্টিত কুন্দশুভ্র অরুণ-লোচন শুভ্র বসন পরিহিত বলভদ্রকে দেখতে পেলেন। তাঁরই সঙ্গে চক্রাদি শোভিত চতুর্ভুজ পীতবসনধারী ঘনশ্যাম বিষ্ণু বিরাজমান আছেন। রথ ছেড়ে এঁরা এখানে এলেন কী করে, এই ভেবে অক্রূর জল থেকে উঠে রথের নিকটে গিয়ে দেখলেন যে তাঁরা সেখানেই অধিষ্ঠান করছেন। ফিরে এসে যমুনায় আবার সেই দৃশ্য দেখলেন। মুনি, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও সর্পরা তাঁদের স্তব করছেন। তাই দেখে অক্রূরও তাঁদের স্তব করলেন, তারপর সমাধি থেকে বিরত হয়ে রথের নিকটে ফিরে এসে দুজনকে আগের মতোই দেখতে পেলেন। তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি দেখে কৃষ্ণ বললেন, যমুনার জলে আপনি বোধ হয় কোন আশ্চর্যের জিনিস দেখেছেন! অক্রূর বললেন, এ

বিষয়ে আলোচনা করে কোন ফল নেই। কংসকে আমি ভয় করি। পরের অন্নে যারা জীবন ধারণ করে তাদের ধিক।

এই বলে অক্রূর দ্রুত অশ্ব চালনা করে সায়াহ্নে মথুরাপুরীতে উপস্থিত হলেন। তারপর মথুরার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে বললেন, আপনারা বীর্যবান বলে পদব্রজে অগ্রসর হোন, আমি রথে একাকী নগরে প্রবেশ করি। কিন্তু আপনারা বসুদেবের গৃহে যাবেন না, কংস সর্বদাই ঐ বৃদ্ধকে তিরস্কার করছেন। এই কথা বলে অক্রূর নগরে প্রবেশ করলেন।

কংস বধ

পরাশর বললেন, কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরাপুরীতে প্রবেশ করে রাজমার্গে উপস্থিত হলেন। পথে একজন রঙ্গকারক রজককে দেখতে পেয়ে তাঁরা তার নিকট সুন্দর বস্ত্র চাইলেন। রজক কংসের দাস ছিল। সে উচ্চ স্বরে তাদের অনেক গালাগালি দিল। কৃষ্ণ তখনই তাকে প্রহার করে তার মাথা দ্বিখণ্ড করে ধরাশায়ী করলেন। তারপর তার নানাবিধ বস্ত্র গ্রহণ করে বলরাম ও কৃষ্ণ নীল ও পীত বস্ত্র পরিধান করে এক মালাকার-গৃহে গেলেন এবং তার নিকটে ফুল চাইলেন। মালাকার তাঁদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে অনেক সুন্দর ফুল দিল। প্রসন্ন হয়ে কৃষ্ণ তাকে বর দিলেন যে শ্রী তাকে পরিত্যাগ করবে না এবং যত দিন চন্দ্র সূর্য উদিত হবে তত দিন তার বংশ নাশ হবে না। এই বর দিয়ে বলরামের সঙ্গে তার গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তারপর রাজপথে কৃষ্ণ একজন কুব্জা নারীকে আসতে দেখলেন। নবযৌবনসম্পন্না ঐ নারীর হাতে চন্দনাদি অনুলেপনের পাত্র ছিল। ললিত স্বরে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, কার জন্য তুমি এই অনুলেপন নিয়ে যাচ্ছ? সেই নারী সানুরাগে উত্তর দিলেন, আপনি কি আমাকে চেনেন না? আমার নাম অনেকবক্রা। কংস আমাকে অনুলেপনের কাজে নিযুক্ত করেছেন। আমার পেষা অনুলেপন ছাড়া তাঁর পছন্দ

হয় না বলে আমি তাঁর প্রসাদধনভাজন। কৃষ্ণ বললেন, এই সুগন্ধ অনুলেপন তুমি আমাদের দাও। 'এই নিন' বলে কুব্জা তাঁদের প্রয়োজনীয় অনুলেপন দিলেন।

দুজনে পরিপাটি করে সেই চন্দন মাখলেন। কৃষ্ণ উল্লাপন বিধান অর্থাৎ বাঁকা জিনিস সরল করতে জানতেন। তিনি নিজের হাতের মধ্যমা ও তর্জনী দিয়ে কুব্জার চিবুক ধরে উঁচু করলেন এবং নিজের পা দিয়ে তার পা চেপে ধরে উপরে টানলেন। এই ভাবে তার দেহ সোজা করে দিতেই তিনি অপরূপ সুন্দরী হলেন। সেই নারী তখন সপ্রেমে কৃষ্ণের বস্ত্র ধরে বিলাস ললিত স্বরে বললেন, আপনি আমার গৃহে চলুন। কৃষ্ণ হেসে বললেন, কিছুদিন পরে যাব। বলে তাঁকে বিদায় দিয়ে বলরামের মুখের দিকে চেয়ে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

এর পরে এঁরা ধনুঃশালায় এলেন। যজ্ঞের ধনু কোথায় আছে, রক্ষীদের কাছে তা জেনে নিয়ে কৃষ্ণ সেখানে গিয়ে সবলে সেই ধনুতে জ্যা আরোপ করলেন। তাতে সেই ধনু ভেঙে তার শব্দে মথুরানগরী সচকিত হল। রক্ষীরা এসে তাঁদের আক্রমণ করতে তাঁরা তাদের বিনাশ করে ধনুশাল থেকে বেরিয়ে এলেন।

কংস অক্রূরের আগমন বার্তা পেয়েছিলেন। এইবারে ধনুর্ভঙ্গের কথা শুনে চানূর ও মুষ্টিককে ডেকে বললেন, তোমরা মল্লযুদ্ধে গোকুলের দুই গোপাল বালককে ন্যায় বা অন্যায় ভাবে বধ করতে পারলে এই রাজ্য আমাদের সাধারণ ধন হবে। তারপর মাহুত হস্তিপককে ডেকে বললেন, তুমি আমার হাতী কুবলয়াপীড়কে সমাজ দ্বারে রেখো। যুদ্ধের জন্যে বালক দুটি রঙ্গদ্বারে এলে তুমি হাতী দিয়ে তাদের বিনাশ করবে।

এই সব আদেশ দিয়ে কংস মঞ্চগুলি দেখে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সূর্যোদয়ের পর নাগরিকরা সাধারণ মঞ্চে এবং রাজারা অমাত্যদের সঙ্গে রাজমঞ্চগুলিতে আরোহণ করলেন। মল্ল পরিচালকদের রঙ্গ মধ্যভাগে রেখে কংস একটি তুঙ্গ মঞ্চে উঠে

বসলেন। সেখানে অন্তঃপুরবাসিনী, স্ত্রী নাগরিক এবং বারাঙ্গনাদের জন্যও আরও অনেক মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। ভিন্ন মঞ্চে নন্দ ও অন্যান্য গোপ এবং তার পাশের মঞ্চে বসুদেব ও অক্রূর বসেছিলেন। পুত্রের মুখ দেখবার জন্য দেবকীও বসেছিলেন নগরের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে।

তারপর নানা প্রকার বাজনা বেজে উঠলে চানূর ও মুষ্টিক সগর্বে বাহু আস্ফালন করতে লাগল। আর দর্শকরা হাহাকার করে উঠল চারি দিক থেকে। এ দিকে কুবলয়াপীড়কে বধ করে তার দুই দন্ত হাতে নিয়ে মদ ও রক্তে অনুলিপ্ত অঙ্গে বলরাম ও কৃষ্ণ গর্ব ও লীলায় সব দেখতে দেখতে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। সব মঞ্চ থেকেই একটা হাহাকার ধ্বনি উঠল। ইনি কৃষ্ণ! আর ইনি বলরাম! কেউ বলে উঠল, এখানে কি উচিত কাজ করবার মতো কোন বৃদ্ধ নেই। এই সুকুমার কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে কি দারুণ মল্লরা যুদ্ধ করবে! যুদ্ধের বিচারকরা এই বালক ও বলবানের যুদ্ধ কেমন করে উপেক্ষা করছেন!

পুরস্ত্রীরা যখন পরস্পর এই সব কথা বলছিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁর কটিদেশ দৃঢ়ভাবে বেঁধে লাফিয়ে উঠলেন। বলরামও তাঁর বাহু আন্দোলন করে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর কৃষ্ণ চানূরের সঙ্গে ও বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কৃষ্ণ একবার নিকটে এসে ও একবার দূরে গিয়ে চানূরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কখনও ক্ষেপণ, মুষ্টিপাত, কিল প্রহার ও বাহুর অভিঘাত, কখনও বা জানুর আঘাত। পা দিয়ে ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ ও প্রসরণ—এই ভাবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হতে লাগল। এক সামাজিক উৎসবে এঁদের নিরস্ত্র ও প্রাণহানিকর যুদ্ধে চানূরের বলক্ষয় ও কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি দেখে কংস তূর্য বাদ্য বন্ধ করলেন এবং তখনই আকাশ থেকে দেবতূর্য বেজে উঠল। কৃষ্ণ তখন চানূরকে আকাশে তুলে একশো বার ঘুরিয়ে মৃত মল্লকে মাটিতে আছড়ে ফেললেন। চানূরের রক্তে মাটি কর্দমাক্ত হল। বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন।

নিজের মুষ্টি ও জানু দিয়ে মুষ্টিকের মাথায় ও বক্ষে আঘাত করে তাকে ভূপাতিত করে এমন ভাবে পেষণ করলেন যে তাতেই তার প্রাণান্ত হল। তারপর কৃষ্ণ তোষলক নামে আর একজন মল্লকে ধরাশায়ী করতেই অন্যান্য মল্লরা পলায়ন করল। তাই দেখে কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের সমবয়সী গোপাল বালকদের রঙ্গস্থলে টেনে এনে সবাই মিলে আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করলেন।

কংস রাগে চোখ রক্তবর্ণ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, এই সমাজ মণ্ডল থেকে গোপালদের বার করে দাও, পাপী নন্দকে লোহার শিকলে বাঁধ, বৃদ্ধ বসুদেবকেও বাঁধ, আর কৃষ্ণের সঙ্গে যারা নাচছে তাদের বধ কর। আমি এদের গাভী ও ধন হরণ করব।

কংসের এই আদেশ শুনে কৃষ্ণ তাঁর মঞ্চে লাফিয়ে উঠে চুল ধরে তাঁকে মাটিতে নামালেন। তাঁর মাথার কিরীট খুলে পড়ল। আর কৃষ্ণ তাঁর উপরে উঠতেই তাঁর দেহের ভারে উগ্রসেনের পুত্র কংসের মৃত্যু হল। কংসের ভ্রাতা সুমালী ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসতে বলরাম তাঁকে অবলীলাক্রমে বধ করলেন। কংসের মৃত্যুতে রঙ্গমণ্ডলের সব লোক হাহাকার করে উঠল।

কৃষ্ণ ও বলরাম গিয়ে বসুদেব ও দেবকীর পাদস্পর্শ করলেন। কৃষ্ণ বললেন, কংসের ভয়ে আমি ও বলরাম বহুদিন উৎকণ্ঠায় কাটিয়ে আজ আপনাদের দুজনকে দেখতে পেলাম। বলে দুই ভাই তাঁদের প্রণাম করলেন।

কংসের পত্নীরা কংসকে বেষ্টন করে বিলাপ করছিলেন। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁদেব অনেক সান্ত্বনা দিলেন। তারপর উগ্রসেনের বন্ধন মোচন করে তাঁকেই তাঁর নিজ রাজ্যে পুনর্বার অভিষিক্ত করলেন। উগ্রসেন নিজের পুত্র কংস ও অন্যান্য বীরদের প্রেতকার্য সম্পন্ন করে সিংহাসনে বসলে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, এখন আমাদের কী করতে হবে আজ্ঞা করুন। বলে পবন দেবকে ডেকে বললেন, ইন্দ্রের কাছ থেকে আপনি সুধর্মা নামের দেবসভা

এনে রাজা উগ্রসেনকে দিন। পবন সেই দিব্য সভা এনে দিলে যাদবরা তা উপভোগ করতে লাগলেন।

সান্দীপনি মুনির শিষ্যত্ব ও শঙ্খাসুর বধ

পরাশর বললেন, এরপর কৃষ্ণ ও বলরাম নিয়ম অনুসারে গুরুর নিকটে অস্ত্র শিক্ষার জন্য অবন্তীপুরে গেলেন। সেখানে কাশীতে উৎপন্ন সান্দীপনি মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং খুব আশ্চর্যের কথা যে চৌষট্টি দিনের মধ্যেই তাঁরা সরহস্য ও সসংগ্রহ ধনুর্বেদে অর্থাৎ অস্ত্র-মন্ত্রোপনিষৎ ও অস্ত্রপ্রয়োগে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। তারপর গুরুকে বললেন, আপনাকে গুরুদক্ষিণা কি দিতে হবে তাই বলুন। সান্দীপনি তাঁদের অলৌকিক ভাবে শিক্ষালাভ করতে দেখে বললেন, প্রভাসের লবণ সমুদ্রে মৃত আমার পুত্রকে জীবিত অবস্থায় এনে দিতে হবে।

অস্ত্র নিয়ে তাঁরা সেই সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হলে সমুদ্র বললেন সান্দীপনি মুনির পুত্রকে আমি হরণ করি নি। পঞ্চজন নামে শঙ্খরূপী এক দৈত্য তাকে গ্রহণ করেছে এবং ঐ দৈত্য আমার জলেই বাস করছে। সমুদ্রের এই কথা শুনে কৃষ্ণ জলে নেমে শঙ্খাসুরকে হত্যা করে তার অস্থিতে উৎপন্ন শঙ্খ গ্রহণ করলেন। তার এই পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে তিনি যমপুরীতে গিয়ে যমকে জয় করলেন। নিজের দেহে যাতনা-ভোগকারী বালককে নিয়ে তার পিতার হাতে প্রদান করলেন। অনন্তর তাঁরা মথুরায় ফিরে এলে সব স্ত্রীপুরুষ আনন্দিত হলেন।

জরাসন্ধ, কালযবন ও মুচুকুন্দের উপাখ্যান

পরাশর বললেন, কংস জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করেছিলেন। কৃষ্ণ এই কন্যাদের পতিকে হত্যা করেছেন জেনে জরাসন্ধ কুপিত হয়ে যাদবদের সঙ্গে কৃষ্ণকে বিনাশ করবার জন্য তেইশ

অক্ষোহিণী সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরোধ করলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ অল্প সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে এসে জরাসন্ধের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা নিজেদের দিব্য অস্ত্র গ্রহণের সংকল্প করতেই আকাশ থেকে শার্ঙ্গধনু, অক্ষয়বাণ পূর্ণ দুটি তূণ ও কৌমোদকী গদা কৃষ্ণের হাতে এল এবং বলরামের হাতে এল তাঁর হল ও সৌনন্দ মুষল। এই অস্ত্রে জরাসন্ধকে পরাজিত করে তাঁরা মথুরায় ফিরলেন। কিন্তু জরাসন্ধ জীবিতাবস্থায় এমন ভাবে পলায়ন করলেন যে কৃষ্ণ তাঁকে পরাজিত ভাবলেন না।

কিছুদিন পর জরাসন্ধ পুনরায় সসৈন্যে এসে উপস্থিত হলেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণের হাতে আবার পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। এইভাবে তিনি আঠারো বার যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন এবং প্রতি বারেই তাঁর বিপুল সৈন্য থাকা সত্ত্বেও যাদবদের অল্প সৈন্যের হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন।

এই সময়ে কালযবনও যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য মথুরায় এসে উপস্থিত হল। একদা গোষ্ঠে ব্রাহ্মণ গার্গ্যকে তাঁর শ্যালক নপুংসক বলে উপহাস করলে উপস্থিত সমস্ত যাদবরা হেসেছিল। গার্গ্য তাই ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে গিয়ে যাদবদের ভয়াবহ এক পুত্রের জন্য তপস্যা করেছিলেন। এই সময়ে তিনি শুধু লৌহ-চূর্ণ খেতেন এবং বারো বৎসর পর মহাদেব প্রসন্ন হয়ে বর দেন। অপুত্রক যবনেশ্বর গার্গ্যকে সসম্মানে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর রানীর সহবাসে ভ্রমরের মতো কালো যে পুত্র জন্মাল তারই নাম কালযবন। যথাসময়ে কালযবনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে যবনেশ্বর বনে গিয়েছিলেন এবং মদগর্বে গর্বিত কালযবন নারদের নিকট যাদব রাজার কথা শুনে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মথুরায় এলেন।

এদিকে কৃষ্ণ বারংবার জরাসন্ধের আক্রমণের পর কালযবনের এই আক্রমণ দেখে ভাবলেন যে এই যুদ্ধে ক্ষীণ হলে মগধরাজ জরাসন্ধের কাছে পরাজিত হতে হবে। দুই দিক থেকে বিপত্তি উপস্থিত হয়েছে

দেখে তিনি স্থির করলেন যে এমন একটি দুর্গ নির্মাণ করবেন যেখানে আশ্রয় নিয়ে শুধু যদু কুলের বীর পুরুষরাই নয়, স্ত্রীরাও যুদ্ধ করতে পারবেন। তিনি নিজে মত্ত, প্রমত্ত, সুপ্ত বা প্রবাসে থাকলেও শত্রু-পক্ষ যাদবদের পরাভূত করতে পারবে না। এই ভেবে তিনি মহা-সাগরের নিকটে বারো যোজন পরিমিত স্থান চেয়ে নিয়ে দ্বারকা নামে পুরী স্থাপন করলেন। প্রাচীর, গৃহ, দুর্গ, গভীর খাত, উদ্যান ও জলাশয়ে সেই পুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর মতো হল। কৃষ্ণ মথুরাবাসীকে দ্বারকায় পৌঁছে দিয়ে মথুরায় ফিরে এসে কালযবনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর তার সেনাবাহিনী এসে নগর অবরোধ করলে তিনি বেরিয়ে তাদের সম্মুখীন হলেন।

কালযবন শূন্য হাতে কৃষ্ণের অনুগমন করতে লাগল এবং কৃষ্ণ একটি গুহায় প্রবেশ করলেন। সেই গুহায় মুচুকুন্দ নামে এক বলশালী রাজা নিদ্রিত ছিলেন। কালযবন গুহায় ঢুকে এই রাজাকেই কৃষ্ণ ভেবে তাঁকে পদাঘাত করল। রাজার নিদ্রাভঙ্গ হল এবং তাঁর দৃষ্টিমাত্রে সেই ক্রোধবহ্নিতে কালযবন প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হয়ে গেল। একদা দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরদের জয় করে রাজা নিদ্রাতুর হয়েছিলেন এবং দেবতাদের নিকটে যখন দীর্ঘকাল নিদ্রার বর প্রার্থনা করেন, তখন তাঁরা এই বর দেন যে তাঁর নিদ্রাভঙ্গকারী তাঁরই দেহ থেকে উৎপন্ন অগ্নিতে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হবে।

কালযবন ভস্ম হবার পর রাজা কৃষ্ণকে দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? কৃষ্ণ বললেন, আমি যদুবংশের বসুদেবের পুত্র। বৃদ্ধ গার্গ্য মুনির কথা মুচুকুন্দের মনে পড়ে গেল। পুরাকালে তিনি বলেছিলেন যে দ্বাপরের অন্তে যদুবংশে বিষ্ণুর জন্ম হবে। মুচুকুন্দ তাঁর স্তব করলে কৃষ্ণ বললেন, দিব্যলোক ভোগের পর আপনি পৃথিবীতে জাতিস্মর হয়ে জন্মাবেন।

মুচুকুন্দ গুহা থেকে বেরিয়ে মানুষদের খর্বাকৃতি দেখলেন। তাতে কলিযুগ উপস্থিত হয়েছে ভেবে তপস্যার জন্য নরনারায়ণের

নিবাস গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন। আর এই ভাবে শত্রু বিনাশ করে কৃষ্ণ মথুরায় ফিরে এলেন। তারপর কালযবনের সৈন্যদের পরাজিত করে তার হাতী ঘোড়া ও রথ দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে উগ্রসেনকে দিলেন।

বলরামের ব্রজবিহার ও যমুনাকর্ষণ

পরাশর বললেন, যুদ্ধের অবসান হয়েছে দেখে বলরাম জ্ঞাতি সন্দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে গোকুলে গেলেন এবং গোপ ও গোপীদের সসম্মানে অভিবাদন করলেন। কেউ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, তিনিও কাউকে আলিঙ্গন করলেন। গোপ ও গোপী কারও কারও সঙ্গে হাসাহাসিও করলেন। গোপেরা তাঁর সঙ্গে অনেক কথা বললেন। কিন্তু গোপীরা প্রেমকুপিত হয়ে ঈর্ষার কথা বললেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, নগরবাসিনীদের প্রেমিক কৃষ্ণ তো এখন সুখে বাস করছেন? কেউ বললেন, কৃষ্ণ কি এখন আমাদের গান স্মরণ করে? আবার কেউ বললেন, তাঁর কথা বলে আর লাভ কী! তার চেয়ে অন্য কথা বলা যাক। আমাদের ছেড়ে তাঁর যদি দিন কাটে, তো তাঁকে ছেড়ে আমাদের দিনই বা কাটবে না কেন। কৃষ্ণ এমন অকৃতজ্ঞ! তাঁর জন্য আমরা কি বাপ মা ভাই-ভর্তা বন্ধুজনকেও পরিত্যাগ করি নি! আর একজন বললেন, আপনি সত্যি বলুন তো, কৃষ্ণ কি ব্রজে আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন? আমাদের মনে হচ্ছে যে কৃষ্ণের মন এখন পুরস্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমাদের প্রতি তাঁর আর প্রীতি নেই।

তারপর বলরামকেই কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করে তাঁরা হাসতে লাগলেন। বলরাম তাঁদের কৃষ্ণের সংবাদ দিয়ে আশ্বাস দিতে লাগলেন। পূর্বের মতো পরিহাসের কথা বলে তিনি তাঁদের সঙ্গে নানাবিধ লীলায় প্রবৃত্ত হলেন।

বলরামকে এই ভাবে বিচরণ করতে দেখে বরুণ বারুণী মদিরাকে

বললেন, তুমি তাঁর অভিলাষের পাত্রী, তাই তাঁর উপভোগের জন্য তুমি যাও। এই কথায় বারুণী বৃন্দাবনের এক কদম্ব বৃক্ষের কোটরে আশ্রয় নিলেন। সেই মদিরার ঘ্রাণ পেয়ে বলরামের পুরাতন মদিরানুরাগ জাগ্রত হল। কদম্ব বৃক্ষ থেকে বিগলিত মদিরার ধারা দেখে তিনি গীতবাদ্যে নিপুণ গোপ ও গোপীদের সঙ্গে আনন্দে সেই মদিরা পান করলেন। তারপর বিহ্বল ও ঘর্মাক্ত হয়ে যমুনাকে বললেন, তুমি এই দিকে এস, আমি স্নান করব। কিন্তু যমুনা তাঁর কথার অবমাননা করে কাছে এলেন না দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর হল দিয়ে যমুনাকে তটের দিকে আকর্ষণ করলেন। বললেন, আসবে না মানে! এবারে স্বেচ্ছায় যাও দেখি!

যমুনা তখন তাঁর নিজের ধারা পরিত্যাগ করে বলরামের দিকে তটভূমি প্লাবিত করে দিলেন। সভয়ে বললেন, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে ছেড়ে দিন। বলরাম বললেন, আর কখনও আমাকে অবজ্ঞা করলে আমি তোমাকে এই হলের আঘাতে সহস্র খণ্ড করে ফেলব। বলে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন।

তাঁর স্নান শেষ হলে লক্ষ্মী প্রকটিত হয়ে তাঁকে বসন ও ভূষণ দিলেন। তিনি তাই পরিধান করলেন। এই ভাবে ব্রজভূমিতে তিনি দুই মাস নানা লীলা করে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

রৈবত রাজার কন্যা রেবতীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর দুই পুত্রের নাম নিশধ ও উল্মুক।

রুক্মিণী হরণ, প্রদ্যুম্ন ও রুক্মীর উপাখ্যান

পরাশর বললেন, বিদর্ভ দেশের কুণ্ডিল রাজ্যে ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র কন্যার নাম রুক্মী ও রুক্মিণী। সুন্দরী রুক্মিণী ও কৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং কৃষ্ণ রুক্মিণীকে প্রার্থনা করলেও কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ বশে রুক্মী এই প্রস্তাবে সম্মত

হলেন না। রাজা ভীষ্মকও জরাসন্ধের পরামর্শে শিশুপালকে কন্যা-দান করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন।

বিবাহের সময় শিশুপালের বন্ধু জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজারা ভীষ্মকের পুরীতে এলেন। আর এই বিবাহ দেখবার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামও যাদবদের সঙ্গে কুণ্ডিল নগরে এলেন। বিবাহের ঠিক একদিন আগে বলরামের উপরে যুদ্ধের ভার দিয়ে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলেন।

এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে পৌণ্ড্রক, দন্তবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি রাজারা কৃষ্ণকে বিনাশ করবার জন্য উদ্যোগ করলেন। কিন্তু বলরাম ও যদুবীরদের হাতে পরাজিত হলেন। কিন্তু 'যুদ্ধে কৃষ্ণকে বধ না করে কুণ্ডিল নগরে ফিরব না' এই প্রতিজ্ঞা করে রুক্মী কৃষ্ণের পশ্চাদ্‌গামী হলেন।

কৃষ্ণ রুক্মীর হাতী ঘোড়া পদাতি ও রথারোহী সৈন্যদের হত্যা করে রুক্মীকে বধের জন্য মাটিতে ফেললেন। তাই দেখে রুক্মিণী বলে উঠলেন আমার একটি মাত্র ভাই, তাকে বধ কোরো না। কৃষ্ণ তখনই রুক্মীকে ছেড়ে দিলেন।

প্রতিজ্ঞার জন্য রুক্মী কুণ্ডিল নগরে আর ফিরলেন না। ভোজকট নামে এক নগর স্থাপন করে সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ রাক্ষস বিবাহ অনুসারে রুক্মিণীকে পেয়েও বিধি অনুসারে তাঁকে বিবাহ করলেন। রুক্মিণীর গর্ভে কামদেবের অংশে জন্ম হল প্রদ্যুম্নের।

মৈত্রেয় বললেন, শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নকে কেন হরণ করেছিল, আর প্রদ্যুম্ন তাকে কী ভাবে বিনাশ করেছিল, সেই কথা বলুন।

পরাশর বললেন, প্রদ্যুম্নের জন্মের ছয় দিন পরে শম্বর জানতে পারে যে এই বালক তাকে হত্যা করবে। এই কথা জেনেই সে সূতিকাগৃহ থেকে তাকে হরণ করে লবণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। বিশাল তরঙ্গমালায় উৎপন্ন আবর্তে পূর্ণ সেই সমুদ্রে অনেক মকর ও কুম্ভীর ছিল। কিন্তু একটি মৎস্য তাকে গিলে ফেলে এবং তাতে

প্রদ্যুম্নের মৃত্যু হল না। একদিন মৎস্যজীবীরা সেই মাছটি মেরে শম্বরকে দেয়। মায়াবতী নামে এক স্ত্রী তাঁর গৃহকর্ত্রী ছিলেন এবং পাচকদের উপরে তাঁরই আধিপত্য ছিল। মাছের পেট কেটে দগ্ধ কামতরুর অঙ্কুরের মতো একটি কুমার দেখতে পেয়ে মায়াবতী যখন ভাবছিলেন যে কে এই বালক এবং কেমন করে এই মাছের পেটে এল, তখন নারদ এসে তাকে বললেন, ইনি কৃষ্ণের পুত্র, সূতিকা-গৃহ থেকে হরণ করে শম্বরাসুর এঁকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল এবং এই মাছটি একে গিলে ফেলে। তুমি এই বালককে প্রতিপালন কর। নারদের কথা শুনে এবং বালকের রূপে মোহিত মায়াবতী সানুরাগে ঐ বালককে প্রতিপালন করতে লাগলেন।

প্রদ্যুম্নের যৌবন সমাগমে মায়াবতী তাঁকে অনুরাগ প্রকাশ করতে লাগলেন এবং তাঁকে নয়ন ও হৃদয় সমর্পণ করে তাঁর সমস্ত মায়াবিদ্যা শেখালেন। একদিন প্রদ্যুম্ন তাঁকে নায়িকার বেশে দেখে প্রশ্ন করলেন, মাতৃভাব ত্যাগ করে তুমি এ ভাব নিয়েছ কেন ? এর উত্তরে মায়াবতী বললেন, তুমি তো আমার পুত্র নও, তুমি কৃষ্ণের পুত্র। শম্বর তোমাকে হরণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল, আর আমি তোমাকে মাছের পেটে পেয়েছি। তোমার মা বোধহয় এখনও তোমার জন্যে কাঁদছেন।

প্রদ্যুম্ন এই কথা শুনে ক্রোধে আকুল হয়ে শম্বরকে যুদ্ধে আহ্বান করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শম্বরের সমস্ত সেনা নিধন করে তার সপ্তম মায়ার উপরে নিজের অষ্টম মায়া প্রয়োগ করলেন। তাতেই নিহত হল শম্বর। তারপর প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে নিয়ে আকাশ-পথে পিতৃগৃহে এলেন।

অন্তঃপুরে প্রদ্যুম্নকে দেখে কৃষ্ণের পত্নীরা তাঁকেই কৃষ্ণ বলে মনে করলেন। কিন্তু রুক্মিণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, আমার প্রদ্যুম্ন জীবিত থাকলে তার বয়স তোমার মতোই হত। আমার স্নেহ ও তোমার রূপ দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি কৃষ্ণেরই পুত্র।

এই সময়ে কৃষ্ণের সঙ্গে নারদ এসে রুক্মিণীকে বললেন, শম্বরাসুরকে বধ করে তোমার পুত্র প্রদ্যুম্নই এসেছে। আর এঁর সঙ্গে যাঁকে দেখছ, তিনি শম্বরের স্ত্রী নন, ইনি তোমার পুত্রেরই সতী স্ত্রী। পুরাকালে মদন ভস্ম হবার পর তাঁর স্ত্রী পতির জন্মের অপেক্ষায় শম্বরাসুরকে মায়ায় মোহিত করে রাখেন। নিন্দিত উপভোগে ইনি অসুরকে মায়ারূপ দেখাতেন। মদনই তোমার পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং মায়াবতী তাঁর স্ত্রী রতি এবং বর্তমানে তোমার পুত্রবধূ। এই কথা জেনে দ্বারকার সকলে সবিস্ময়ে 'সাধু সাধু' বলে হর্ষ প্রকাশ করতে লাগলেন।

রুক্মিণীর একটি কন্যা ও নয়টি পুত্র জন্মেছিল। রুক্মিণী ছাড়াও কৃষ্ণের আর সাতজন সুন্দরী স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন—কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নগ্নজিতের কন্যা সত্যা, জাম্ববানের কন্যা রোহিণী, মদ্ররাজ-কন্যা সুশীলা, সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা এবং লক্ষ্মণা। এঁরা ছাড়াও কৃষ্ণের আরও ষোল হাজার পত্নী ছিলেন।

প্রদ্যুম্ন রাজা রুক্মীর স্বয়ংবরস্থা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যার গর্ভে অনিরুদ্ধর জন্ম হয়। কৃষ্ণ রুক্মীর পৌত্রীর সঙ্গে অনিরুদ্ধর বিবাহ দিতে চান এবং রুক্মী স্পর্ধিত হয়েও পৌত্রীকে নিজের দৌহিত্রের হাতে প্রদান করেন। এই বিবাহে কৃষ্ণ বলরাম ও যাদবরা রুক্মীর রাজধানী ভোজকটে গিয়েছিলেন।

বিবাহের পর কলিঙ্গরাজ রুক্মীকে বললেন, পাশাখেলায় বলরাম অনভিজ্ঞ, অথচ খেলায় তাঁর আসক্তি অত্যধিক। তাই কেন আমরা পাশাখেলায় তাঁকে জয় করছি না? 'তাই হোক' বলে রুক্মী সভাস্থলে বলরামের সঙ্গে পাশাখেলা আরম্ভ করলেন। পরপর দুবার তিনি বলরামকে চার হাজার করে স্বর্ণমুদ্রায় পরাজিত করলেন। তারপর বলরাম চব্বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পণ রাখলেন এবং পাশাখেলায় শ্রেষ্ঠ রুক্মী তাও জিতে নিলেন। এই দেখে কলিঙ্গরাজ দাঁত বার করে উচ্চ স্বরে হাসলেন এবং রুক্মী বললেন,

বৃথাই বলরাম নিজেকে পাশাখেলায় পণ্ডিত মনে করেন। ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম চার কোটি স্বর্ণমুদ্রা পণ রাখলেন আর জয়ের আশায় রুক্মীও অক্ষপাত করলেন। কিন্তু এবারে রুক্মী পরাজিত হতেই বলরাম চিৎকার করে বলে উঠলেন, আমি জিতেছি। কিন্তু রুক্মী বললেন, মিথ্যা কথা বলবেন না, আপনার পণ তো আমি অনুমোদন করি নি! তখনই আকাশবাণী হল, রুক্মীর বাক্য মিথ্যা, ধর্মের সঙ্গে বলরাম জিতেছেন। মুখে অনুমোদন না করেও অক্ষপাত করলেই তা স্বীকার করা হয়। এই কথায় বলরাম ক্রোধে চোখ রক্তবর্ণ করে পাশার অষ্টাপদ দিয়ে আঘাত করে রুক্মীকে বধ করলেন এবং কলিঙ্গরাজ যে দাঁত বার করে হেসেছিলেন তা ভেঙে দিলেন। অন্য রাজাদেরও তিনি বধ করতে লাগলেন দেখে হাহাকার করে সকলে পালিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণের সঙ্গে যাদবরা অনিরুদ্ধকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরলেন।

নরকাসুর বধ

পরাশর বললেন, একদিন ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে নরক নামে এক অসুরের অত্যাচারের কথা বললেন। ইন্দ্র বললেন, পৃথিবীর পুত্র নরক এখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা এবং সে সকল প্রাণীর উপরে উপদ্রব করছে। দেবতা, সিদ্ধ, অসুব ও রাজাদের কন্যা হরণ করে নিজের গৃহে রুদ্ধ করে রেখেছে। বরুণের জলবর্ষণকারী ছত্র, মন্দরের শৃঙ্গ মণি পর্বত ও আমার মা অদিতির অমৃত বর্ষণকারী কুণ্ডল হরণ করে এখন আমার ঐরাবতের দিকে নজর দিয়েছে। তার দুর্নীতির বিষয় আমি আপনাকে বললাম, এখন আপনি যা ভাল মনে করেন করুন।

ইন্দ্রের এই কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন। মনে মনে গরুড়ের চিন্তা করতেই গরুড় এসে উপস্থিত হল এবং সত্যভামাকে নিয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দিকে যাত্রা করলেন। ইন্দ্র আবার ঐরাবতে চড়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের চারি দিকে একশো যোজন ভূভাগ মুরু নামে এক অসুরের তৈরি ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণধার পাশে বেষ্টিত ছিল। কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্রে সেই পাশ ছিন্ন করলেন এবং মুরু দাঁড়াতেই তিনি তাকে বধ করলেন। মুরুর সাত হাজার পুত্রকেও কৃষ্ণ চক্রের আগুনে পতঙ্গের মতো দগ্ধ করে ফেললেন। এই ভাবে মুরু, হয়গ্রীব ও পঞ্চজনকে বিনাশ করে কৃষ্ণ সত্বর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হলেন। তারপর বহু সৈন্য পরিবৃত নরকের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধে হাজার হাজার অসুর নিহত হবার পর কৃষ্ণ নরকাসুরকে দ্বিখণ্ড করে ফেললেন।

তার মৃত্যুর পর পৃথিবী অদিতির সোনার কুণ্ডল দুটি নিয়ে কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, বরাহ মূর্তি ধরে আপনি যখন আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, সেই সময়ে আপনার অঙ্গ স্পর্শে আমার এই নরক নামের পুত্র জন্মেছিল। আপনি যাকে দিয়েছিলেন, তাকে আজ আপনিই বধ করলেন। এই কুণ্ডল আপুনি নিন এবং নরকের পুত্রদের আপনি পালন করুন।

'তাই হবে' বলে কৃষ্ণ নরকের গৃহ থেকে সমস্ত রত্ন গ্রহণ করলেন। তার অন্তঃপুরে দেখতে পেলেন ষোল হাজার একশো কন্যা। চারটি করে দন্তধারী ছয় হাজার হাতী ও কম্বোজ দেশের একুশ নিযুত অশ্বও দেখতে পেলেন। নরকাসুরের কিঙ্করদের সঙ্গে সেই সব কন্যা, হাতী ও ঘোড়া কৃষ্ণ দ্বারকায় পাঠালেন। বরুণের ছত্র ও মণি পর্বতও দেখতে পেয়ে গরুড়ের পিঠে তুলে ইন্দ্রকে অদিতির কুণ্ডল দেবার জন্য কৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে স্বর্গ যাত্রা করলেন।

পারিজাত হরণ

স্বর্গদ্বারে পৌঁছে কৃষ্ণ শঙ্খ বাজালেন এবং সেই শব্দ শুনে দেবতারা অর্ঘ্যপাত্র হাতে কৃষ্ণের নিকটে এলেন। তাঁদের পূজা নিয়ে তিনি শুভ্র মেঘের শিখরাকার দেবমাতা অদিতির গৃহে গিয়ে তাঁর

দর্শন করলেন। ইন্দ্রের সঙ্গে প্রণাম করে তাঁকে তাঁর কুণ্ডল অর্পণ করলেন, নরকাসুরের বিনাশের কথাও বললেন। অদিতি প্রসন্ন হয়ে শান্ত ভাবে চিত্তকে তন্ময় করে কৃষ্ণের স্তব করে বললেন, তুমি প্রসন্ন হও। কৃষ্ণও সহাস্যে বললেন, তুমি মা, প্রসন্ন হয়ে তুমি আমাদের বর দাও। অদিতি বললেন, মর্ত্যে তুমি অজেয় হবে।

এর পরে সত্যভামা ইন্দ্রাণী শচীর সঙ্গে অদিতিকে প্রণাম করে বললেন, আপনি প্রসন্ন হোন। অদিতি বললেন, আমার প্রসাদে তোমার জরার বিরূপতা আসবে না, তোমার নবযৌবন স্থির হবে। তারপর অদিতির আজ্ঞায় ইন্দ্র সসম্মানে কৃষ্ণের পূজা করলেন কিন্তু শচী সত্যভামাকে মানুষ বলে পারিজাত ফুল দিলেন না, নিজে সেই ফুলের অলঙ্কার পরলেন।

এর পরে সত্যভামা কৃষ্ণের সঙ্গে নন্দন প্রভৃতি সুন্দর দেবোদ্যান-গুলি দেখতে লাগলেন। সমুদ্র মন্থনের সময় যে পারিজাত উঠেছিল, সেই বৃক্ষটিও দেখলেন। তার কচি পল্লবের শোভা তামার রঙের সুগন্ধ মঞ্জরীপুঞ্জ নিত্য আহ্লাদের জিনিস। সত্যভামা তাই দেখে কৃষ্ণকে বললেন, এই গাছ তুমি দ্বারকায় নিয়ে যাচ্ছ না কেন! তুমি তো বল সত্যভামা তোমার সবচেয়ে প্রিয়, তবে আমার গৃহের উদ্যানের জন্যে এই পারিজাত গাছটি তুমি নিয়ে যাচ্ছ না কেন! এই পারিজাতের মঞ্জরী মাথায় গুঁজে আমি আমার সপত্নীদের মধ্যে শোভা পেতে চাই। সত্যভামার কথা শুনে কৃষ্ণ হেসে সেই গাছটি তুলে গরুড়ের পিঠে রাখলেন।

তাই দেখে বনরক্ষীরা এসে বলল, দেবরাজ মহিষী শচীর এই গাছ। তাঁরই ভূষণের জন্য সমুদ্র মন্থনের সময় এটি উৎপন্ন হয়েছিল। এটি নিয়ে আপনি কুশলে যেতে পারবেন না। বজ্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত দেবতারা ছুটে আসবেন। তাঁদের সঙ্গে বৃথা বিরোধ করা উচিত হবে না।

বনরক্ষীদের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে সত্যভামা বললেন, অমৃত মন্থনে যা

কিছু উৎপন্ন হয়েছে তা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। একা ইন্দ্র একে কোন অধিকারে গ্রহণ করবেন! তোমরা গিয়ে স্বামীর বলবীর্যে গর্বিত শচীকে বল যে সত্যভামা তার স্বামীর বলে এই পারিজাত হরণ করছে, তাঁরা যেন রক্ষা করেন।

বনরক্ষীরা গিয়ে শচীকে সব কথা জানাল এবং শচী দেবরাজ ইন্দ্রকে উৎসাহিত করলেন। দেবসেনা পরিবৃত হয়ে ইন্দ্র পারিজাত রক্ষার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করলেন। ইন্দ্রের হাতে বজ্র, অন্যান্য দেবতারা পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা ও শূল হাতে নিলেন। ঐরাবতের উপরে ইন্দ্রকে দেবসেনা পরিবৃত হয়ে যুদ্ধে এসেছেন দেখে কৃষ্ণ শঙ্খধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ করে একসঙ্গে সহস্র অযুত তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। তাই দেখে দেবতারাও নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ সেই সব অস্ত্রকে সহস্র খণ্ড করে দিলেন। বরুণের পাশ গরুড় তার চঞ্চু দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। যমের দণ্ডকে কৃষ্ণ গদার আঘাতে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীতে ফেললেন এবং চক্র দিয়ে কুবেরের শিবিকা তিল তিল করে বিভক্ত করলেন। শুধুমাত্র দৃষ্টিপাতেই কৃষ্ণ সূর্যকে নিস্তেজ করলেন এবং অগ্নিকে নিরস্ত করলেন শত শত বাণে। তাঁর চক্রে শূলের অগ্রভাগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রুদ্রদের পতন হল, তাঁর বাণে বিক্ষিপ্ত হয়ে সধ্যি, মরুৎ, বিশ্বদেব ও গন্ধর্বরা শিমূল তুলার মতো উড়তে লাগলেন। তারপর ইন্দ্র ও কৃষ্ণ বৃষ্টিধারার মতো শরবর্ষণ করতে লাগলেন। এই ভাবে অস্ত্রশস্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দেখে ইন্দ্র তাঁর বজ্র ও কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র গ্রহণ করলেন। তাই দেখে ত্রিলোকের সকলে হাহাকার করে উঠল। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলে কৃষ্ণ তা ধারণ করে বললেন 'থাক', কিন্তু নিজে চক্র নিক্ষেপ করলেন না।

বজ্রহীন ইন্দ্র পলায়ন করছেন দেখে সত্যভামা বললেন, আপনি শচীর স্বামী, আপনার কি পালানো উচিত! পারিজাতের মালা পরে শচী শীঘ্রই আপনার কাছে আসবেন। না না, পালাবেন না,

লজ্জাও পাবেন না। এই পারিজাত আপনি নিয়ে যান, দেবতাদের ব্যথা শান্ত হোক। পতির গৌরবে গর্বিতা শচী আমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছিলেন। লঘুচিত্ত স্ত্রীলোক বলে আমি আমার স্বামীর গৌরবের জন্য এই যুদ্ধ বাধিয়ে ছিলাম। পরের পারিজাত হরণ করে আমাদের কী লাভ বলুন!

সত্যভামার কথায় নিবৃত্ত হয়ে ইন্দ্র বললেন, আমি আপনাদের মিত্র, কাজেই আমার খেদ বৃদ্ধি আর করবেন না। আর যাঁর কাছে পরাজিত হয়েছি, তাঁর কাছে পরাজয়ে আমার লজ্জা নেই। কৃষ্ণ বললেন, আপনি দেবরাজ ইন্দ্র ও আমরা মর্ত্যের মানুষ। আমাদের অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। আপনার পারিজাত আপনি নিয়ে যান, আর আপনার বজ্রও ফেবত নিন। ইন্দ্র বললেন, পারিজাত আপনি দ্বারকায় নিয়ে যান, আপনি মর্ত্যলোক ত্যাগ করলে পারিজাত আর সেখানে থাকবে না।

'তবে তাই হোক' বলে কৃষ্ণ ফিরে এলেন। দ্বারকার নিকটে এসে শঙ্খ বাজিয়ে দ্বারকাবাসীকে খুশী করলেন। তারপর গরুড়ের পিঠ থেকে নেমে অন্তঃপুরের উদ্যানে পারিজাত রোপণ করলেন। এই পারিজাতের সোরভ তিন যোজন পর্যন্ত আমোদিত করে এবং এর নিকটে এলে লোকে নিজের পূর্ব জন্মের বিষয় স্মরণ করতে পারে। যাদবরা কাছে এসে নিজেদের দেহ দেবশরীর বলে বুঝতে পারলেন।

কিঙ্করর। নরকাসুরের হাতী ঘোড়া ও স্ত্রীদের নিয়ে এলে কৃষ্ণ তাদের গ্রহণ করলেন। শুভ সময় এলে নানা দেশ থেকে অপহৃত সেই সব কন্যাকে কৃষ্ণ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ধর্মানুসারে বিবাহ করলেন। ষোল হাজার একশো কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য তিনি অতগুলি রূপ ধারণ করেছিলেন। কন্যারা প্রত্যেকেই ভেবেছিল যে কৃষ্ণ তাকে বিবাহ করলেন। প্রতি রাত্রে তিনি তাদের প্রত্যেকের গৃহে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

উষা ও অনিরুদ্ধের উপাখ্যান

পরাশর বললেন, ভানু ও ভৈমরিক নামে কৃষ্ণের দুই পুত্র সত্যভামার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। রোহিণীর গর্ভে জন্মে দীপ্তিমান, তাম্রপক্ষ প্রভৃতি বহু পুত্র। জাম্ববতীর গর্ভেও শাম্ব প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। নাগ্নজিতীর গর্ভে ভদ্রবিন্দ প্রভৃতি এবং শৈব্যার গর্ভে সংগ্রামজিৎ প্রভৃতি অনেক সন্তান জন্মে। মাদ্রীর বৃক প্রভৃতি, লক্ষ্মণার পাত্রবৎ প্রভৃতি এবং কালিন্দীর শ্রুত প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীরাও এক লক্ষ আশি হাজার পুত্র লাভ করে।

কৃষ্ণের পুত্রদের মধ্যে রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রদ্যুম্নের পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ এবং বজ্র অনিরুদ্ধের পুত্র। অনিরুদ্ধ বলির পৌত্রী ও বাণাসুরের কন্যা উষাকে বিবাহ করেন। এই অপরাধে বাণ রাজা তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে কারাগারে আবদ্ধ করেন। এই জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের ঘোর যুদ্ধ হয় এবং কৃষ্ণ তাঁর চক্রে বাণের সহস্র বাহু ছেদন করেন।

মৈত্রেয় প্রশ্ন করলেন, উষার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের কেন যুদ্ধ হয় এবং কৃষ্ণই বা বাণের সহস্র বাহু কী জন্য ছেদন করেন?

পরাশর বললেন, বাণের কন্যা উষা পার্বতীকে শিবের সঙ্গে ক্রীড়া করতে দেখে নিজেও তার পতির সঙ্গে ক্রীড়ায় অভিলাষী হলেন। তাঁর মনের কথা বুঝে পার্বতী বললেন, তুমি দুঃখ কোরো না, তুমিও তোমার স্বামীর সঙ্গে এই রকম ক্রীড়া করবে। কে তাঁর পতি হবে, এই কথা উষার মনে এল। আর পার্বতী তাও বুঝতে পেরে বললেন, বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে স্বপ্নে যে তোমাকে বিহ্বল করবে, সে-ই হবে তোমার পতি।

বৈশাখের দ্বাদশীতে রাজকন্যা উষা পার্বতী যেমন বলেছিলেন ঠিক সেই রকম স্বপ্ন দেখলেন। একজন পুরুষ তাঁকে বিহ্বল করলেন এবং উষাও তাঁর প্রতি অনুরক্ত হলেন। স্বপ্নভঙ্গের পর সেই

পুরুষকে দেখতে না পেয়ে উষা নির্লজ্জ ভাবে সখীকেই বললেন, তুমি কোথায় গেলে ?

কুম্ভাণ্ড নামে বাণাসুরের এক মন্ত্রীর কন্যা চিত্রলেখা ছিল তাঁর সখী। সে বলল, তুমি কার কথা বলছ? উষা লজ্জায় প্রথমে কিছুই বলতে পারলেন না। কিন্তু নানা রকম শপথ করে চিত্রলেখা তাঁর বিশ্বাস জন্মালে উষা তাকে সব কথাই বললেন। পার্বতী তাঁকে যে কথা বলেছিলেন সে কথাও গোপন না করে বললেন, সখি, তাকে পাবার জন্যে কোন উপায় কর।

চিত্রলেখা তখন দেব দৈত্য গন্ধর্ব ও মানুষদের প্রধান ব্যক্তিদের চিত্রপটে এঁকে উষাকে দেখাতে লাগল। উষা দেব দৈত্য গন্ধর্বদের পর মানুষের চিত্র দেখলেন। বৃষ্ণি কুলের মধ্যে কৃষ্ণ ও বলরামের চিত্র দেখে লজ্জাবিজড়িত হলেন, প্রদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই লজ্জায় অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তারপরে প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে দেখে লজ্জা ত্যাগ করে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, ইনিই সেই পুরুষ।

চিত্রলেখা বলল, ইনি কৃষ্ণের পৌত্র প্রিয়দর্শন অনিরুদ্ধ, দেবী তাঁকেই তোমার পতি নির্বাচন করেছেন। যদি তাঁকে পাও তো জেনো যে তোমার সব কিছুই পাওয়া হল। কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারাবতীতে প্রবেশ করাই দুষ্কর। তবু যে কোন উপায়ে তোমার পতিকে আমি নিয়ে আসব। কিন্তু এ কথা তুমি কাউকে বোলো না। আমি যাব, আর আসব। এই বিরহ তুমি সহ্য করো। বলে চিত্রলেখা দ্বারকাপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

পরাশর বললেন, পুরাকালে বাণ রাজাও মহাদেবকে বলেছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহ নেই, অথচ আমার এই দশ হাজার বাহু নিয়ে বড়ই অশান্তিতে আছি। যদি যুদ্ধ করবার দরকারই না হল, তবে কি আমি শুধু এই বাহুর ভারই বহন করব! এই কথা শুনে মহাদেব বললেন, যেদিন তোমার ময়ূরধ্বজ ভাঙবে, সেদিনই যুদ্ধ লাগবে জেনো। এই

কথা শুনে বাণ খুশী হয়ে নিজের গৃহে ফিরে এসেছিল। তারপর সত্যিই একদিন দেখল যে তার ময়ূরধ্বজ ভেঙে গেছে।

অপ্সরা চিত্রলেখা তার যোগবিদ্যার বলে অনিরুদ্ধকে উষার নিকটে এনেছিল। অন্তঃপুরে উষার সঙ্গে অনিরুদ্ধকে রমণরত দেখে রক্ষীরা দৈত্যপতি বাণকে এই সংবাদ দিল। বাণ তাঁর রক্ষী সেনাকে যুদ্ধের আদেশ দিলেন। কিন্তু অনিরুদ্ধ পরিঘ নিক্ষেপ করে তাদের বধ করলেন। তখন বাণ নিজেই যুদ্ধ করতে রণস্থলে এলেন এবং যথাশক্তি যুদ্ধ করেও অনিরুদ্ধর নিকট পরাজিত হলেন। শেষে মন্ত্রীদের পরামর্শে নানা মায়া বিস্তার করে সর্পাস্ত্রে অনিরুদ্ধকে বন্ধন করে ফেললেন।

এই সময় দ্বারকাপুরীতে যখন সবাই বলাবলি করতে লাগল যে অনিরুদ্ধ কোথায় গেল, তখন নারদ গিয়ে খবর দিলেন যে বাণাসুর অনিরুদ্ধকে আবদ্ধ করে রেখেছে। যাদবরা ভেবেছিলেন যে পারিজাত হরণে পরাজিত দেবতারাই বোধহয় অনিরুদ্ধকে হরণ করেছে। কিন্তু নারদ বললেন যে যোগবিদ্যানিপুণ চিত্রলেখা তাকে শোণিতপুরে নিয়ে গেছে। কৃষ্ণ তখনই গরুড়কে ডেকে বলরাম ও প্রদ্যুম্নকে নিয়ে শোণিতপুর যাত্রা করলেন।

নগরে প্রবেশ করবার আগে কৃষ্ণ প্রমথদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বিনাশ করলেন। তারপর বাণকে রক্ষা করবার জন্য শিবের দেহ থেকে উৎপন্ন জ্বর কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল। তার বিশাল দেহ, তিন মাথা ও তিন পা। তার তাপে বলরাম উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে শান্তি পান। এবং সেই জ্বরকে বৈষ্ণব জ্বর কৃষ্ণের দেহ থেকে বার করে দিল। তারপর কৃষ্ণ পঞ্চ অগ্নিকে বিনাশ করে দানব সেনা বধ করতে লাগলেন। বাণ এসে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলে তাঁর পক্ষে মহাদেব ও কার্তিকেয় এলেন যুদ্ধ করতে।

কৃষ্ণ ও মহাদেবের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। দেবতাদের আশঙ্কা

হল যে জগতের প্রলয় উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণ জৃম্ভণ অস্ত্র নিক্ষেপ করে মহাদেবকে অলসভাবাপন্ন করে প্রমথ ও দৈত্যদের বিনাশ করলেন। কার্তিকেয় প্রদ্যুম্নের অস্ত্রে নিপীড়িত হয়ে প্রস্থান করলেন। মহাদেবকে আলস্যে অভিভূত দেখে বাণ এলেন কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। বলরামের বাণে বিদ্ধ হয়ে সৈন্যরা ইতস্তত পলায়ন করতে লাগল। বাণ দেখতে পেলেন যে বলরাম তাঁর হল ও মুষল দিয়ে এবং কৃষ্ণ তাঁর চক্রে সবাইকে ছিন্নভিন্ন করছেন। কৃষ্ণ বাণের সমস্ত বাণ ছেদন করতে লাগলেন। বাণ ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করলেন, কৃষ্ণও বাণাসুরকে বাণে বিদ্ধ করলেন। পরিশেষে কৃষ্ণ বাণাসুরকে বধ করবার জন্য সুদর্শন চক্র হাতে নিলেন আর তখনই দৈত্যকুলের কোটরী নামের মায়াবিদ্যা নগ্ন রূপে আবির্ভূত হল। চোখ বন্ধ করে কৃষ্ণ বাণের সহস্র বাহু ছেদনের জন্য চক্র নিক্ষেপ করলেন। বাণাসুরের সমস্ত বাহু ছিন্ন হয়ে গেলে কৃষ্ণ আবার তাঁর সুদর্শন চক্র হাতে নিলেন। এইবারে বাণের প্রাণ নাশ হচ্ছে দেখে মহাদেব তাঁর সামনে এসে বললেন, তোমাকে আমি চিনেছি কৃষ্ণ, এবারে তুমি প্রসন্ন হও। বাণকে আমি অভয় দিয়েছি, আমার প্রশ্রয়েই তার এত শক্তি। এর জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

এই কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁর ক্রোধ পরিত্যাগ করে মহাদেবকে বললেন, একে যখন আপনি বর দিয়েছেন, তখন এ জীবিত থাক। আপনার সম্মানে আমি উদ্যত সুদর্শন চক্র ফিরিয়ে নিলাম। আমাকে আপনি আপনার সঙ্গে অভিন্ন বলেই জানবেন। আপনি যাকে অভয় দিয়েছেন, তাকে আমিও আজ অভয় দিচ্ছি।

এরপরে কৃষ্ণ অনিরুদ্ধর কাছে গেলেন। গরুড়ের ভয়ে সর্পরা অনিরুদ্ধর বন্ধন মোচন করে পালিয়ে গেল, কৃষ্ণ বলরাম ও প্রদ্যুম্নের সঙ্গে ঊষা ও অনিরুদ্ধকেও গরুড়ের পিঠে তুলে দ্বারকাপুরী ফিরে এলেন।

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের উপাখ্যান ও কাশীদহন

মৈত্রেয় প্রশ্ন করলেন, মানুষ হয়ে কৃষ্ণ দেবতাদের যে ভাবে জয় করলেন তা শুনলাম, এ ছাড়াও তিনি কী করেছিলেন তা জানবার কৌতূহল হচ্ছে।

পরাশর বললেন, কৃষ্ণ কেমন করে বারাণসীপুরী দাহ করেন এইবারে সেই কথা বলছি। অজ্ঞান মোহিত কিছু লোক পৌণ্ড্র বংশীয় রাজা বাসুদেবকে বলত আপনি ভুবনে বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং এই নামেই তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ক্রমে তাঁর পূর্ব স্মৃতি নষ্ট হল এবং তিনি মনে করতে লাগলেন যে সত্যিই তিনি বাসুদেব রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই সব রকম বিষ্ণুচিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ করলেন। তারপর এক সময়ে কৃষ্ণকে এই বলে দূত পাঠালেন যে তুমি আমার নাম ও চিহ্ন পরিত্যাগ কর, তুমিই বাসুদেব এই অভিমান ছেড়ে নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য আমাকে প্রণতি কর।

দূতের মুখে এই কথা শুনে কৃষ্ণ তাকে হেসে বললেন, ফিরে গিয়ে তোমার প্রভুকে বল যে আমি আমার নিজের চিহ্ন চক্র খুব সত্বর তাঁর প্রতি ত্যাগ করব। তিনি আমাকে তাঁর নিকটে যাবার আজ্ঞা করেছেন তো, আমি তাঁর পুরীতে গিয়েই আমার চক্র পরিত্যাগ করব।

দূত প্রস্থান করবার পর কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করে এনে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পুরীর অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে কাশীর রাজাও দূতের মুখে কৃষ্ণের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সহায়তার জন্য সসৈন্যে এসে উপস্থিত হলেন। দুজনের মিলিত সৈন্য নিয়ে তাঁরা কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হলেন।

কৃষ্ণ দূর থেকেই দেখতে পেলেন যে পীতবস্ত্র পরিহিত পৌণ্ড্রক রাজা বক্ষে শ্রীবৎস ও অন্যান্য চিহ্ন ধারণ করে সুপর্ণরচিত ধ্বজাবিশিষ্ট রথে চড়ে আসছেন। তিনি হেসে হাতী ঘোড়া ও নানা অস্ত্রশস্ত্রে

বলশালী পৌণ্ড্রক সেনার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি তাঁর গদা চক্র ও শার্ঙ্গধনু থেকে নিক্ষিপ্ত বাণে পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের সেনাদের পরাজিত করে পৌণ্ড্রককে বললেন, তুমি আমাকে যে চিহ্ন পরিত্যাগ করতে বলে পাঠিয়েছিলে, আমি এইবারে সেই চক্র ও গদা পরিত্যাগ করলাম, গরুড়কেও তোমার কাছে পাঠালাম। এই বলে চক্র ও গদা নিক্ষেপ করতেই পৌণ্ড্রক রাজা চক্রে বিদীর্ণ ও গদাঘাতে প্রোথিত হলেন। গরুড়ও তাঁর রথের ধ্বজার গরুড়কে ভেঙে দিল।

লোকে হাহাকার করছে দেখে কাশীরাজ মিত্রের প্রতি কর্তব্য বোধে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণ তাঁর শার্ঙ্গধনুর বাণে কাশীরাজের মাথা কেটে কাশীতে নিক্ষেপ করে দ্বারকায় ফিরে গিয়ে স্বর্গসুখে লীলা করতে লাগলেন।

এদিকে কাশীতে রাজার ছিন্ন মাথা দেখে সবাই বলাবলি করতে লাগল, এ কেমন করে হল এবং কে-ই বা এ কাজ করল? তারপর এ কাজ যে কৃষ্ণের তা জানতে পেরে রাজপুত্র পুরোহিতদের সঙ্গে শিবের উপাসনা করতে লাগলেন। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে শিব রাজপুত্রকে বললেন, তুমি বর নাও। রাজপুত্র বললেন, আপনার প্রসাদে আমার পিতৃহন্তা কৃষ্ণের বিনাশের জন্য এক কৃত্যা উত্তিষ্ঠ হোক। তাঁর প্রার্থনার আর এক অর্থ হয়—আমার পিতৃহন্তা কৃষ্ণের নিকট আমার বধের জন্য এক কৃত্যা উৎপন্ন হোক। শিব বললেন, তথাস্তু। তারপর দক্ষিণাগ্নিতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের শেষে এক কৃত্যা উত্থিত হলেন এবং 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে সেই কৃত্যা দ্বারকাপুরীর দিকে প্রস্থান করলেন। অগ্নিশিখার মতো সেই কৃত্যাকে দেখে ভয়ে সবাই বিচলিত হল।

কাশীরাজার পুত্র যে শিবের বরে এই কৃত্যাকে উৎপন্ন করেছে, কৃষ্ণ তা জানতে পারলেন। পাশা-খেলোয়াড় যেমন করে অক্ষ চালনা করে, কৃষ্ণ ঠিক তেমনি অনায়াসে সুদর্শন চক্র ত্যাগ করলেন।

সেই চক্র কৃত্যাকে তাড়া করল এবং কৃত্যা পলায়ন করে কাশীতেই ফিরে এল। প্রমথ সেনা ও কাশীরাজের সেনা নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চক্রের দিকে এগোল। কিন্তু চক্রের তেজে তারা দগ্ধ হল। তারপর সেই চক্র ও কৃত্যা বারাণসীকেও দগ্ধ করল। গৃহ, প্রাচীর, মানুষ, পশু ও অন্যান্য সব কিছু দগ্ধ করে সুদর্শন চক্র কৃষ্ণের কাছে ফিরে গেল।

শাম্বের বিবাহ ও দ্বিবিদ বধ

মৈত্রেয় বললেন, এবারে আপনি বলরামের বীরত্বের কথা বলুন।

পরাশর বললেন, তাহলে বলরামের কথা শোন। স্বয়ম্বরের জন্য সজ্জিত দুর্যোধনের কন্যাকে জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব বলপ্রয়োগে গ্রহণ করেছিলেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ও দুর্যোধন প্রভৃতি বীরেরা শাম্বকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বন্ধন করেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে যাদবরা দুর্যোধনের উপরে রেগে তাঁদের বিনাশের জন্য এক মহা উদ্যম করলেন। কিন্তু বলরাম মদের নেশায় অস্পষ্ট স্বরে তাঁদের নিবারণ করে বললেন, আমার কথায় কৌরবরা তাকে ছেড়ে দেবেন, কাজেই আমি একাই তাঁদের কাছে যাচ্ছি। এই বলে বলরাম হস্তিনাপুরে গিয়ে নগরে প্রবেশ না করে বাহিরের উপবনে রইলেন। বলরাম এসেছেন জেনে দুর্যোধনরা তাঁকে গাভী জল ও অর্ঘ্য দান করলেন। সে সব গ্রহণ করে তিনি বলে পাঠালেন যে রাজা উগ্রসেনের আজ্ঞায় শাম্বকে শীঘ্র ফিরিয়ে দিন। কিন্তু বলরামের এই কথা শুনে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্যোধন প্রভৃতি সকলেই খুব ক্রুদ্ধ হলেন। যদুবংশকে রাজপদের অযোগ্য মনে করে তাঁরা বললেন, ইনি এ কী বলছেন? কুরুকুলের উপর আজ্ঞা করে, কোন্ যাদবের এমন ধৃষ্টতা! তাই তাঁরা বলরামকে বলে পাঠালেন, আপনি ফিরে যান। আপনার বা উগ্রসেনের কথায় পাপী ও অন্যায়কারী শাম্বকে আমরা ছেড়ে দেব

না। কুকুর ও অন্ধক বংশীয়রা আগে আমাদের প্রণাম করতেন, এখন তা না করুন তাতে ক্ষতি নেই। ভৃত্য হয়ে প্রভুকে আবার আজ্ঞা কি! সমান ব্যবহার করে আমরাই আপনাদের গর্বিত করেছি! আমরা আপনাকে ভালবেসে অর্ঘ্য দিয়েছি, কুলোচিত সম্মানের জন্য নয়।

এই কথা শুনে বলরাম কোপে মত্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পা দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করলেন। তাতেই পৃথিবী বিদীর্ণ হল। চোখ রক্তবর্ণ করে বীরের মতো গর্জন করে তিনি বললেন, এই সামর্থ্যহীন দুরাত্মা কৌরবদের এমন রাজগর্ব! তারাই পৃথিবীপতি, আর আমরা কেউ নই! শক্তির গর্বে এরা উগ্রসেনের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করছে! ইন্দ্র তাঁর আজ্ঞায় সুধর্মা নামের সভা দিয়েছেন তাঁকে, আর এরা বসছে শত শত মানুষের ব্যবহৃত আসনে। যে উগ্রসেনের ভৃত্যদের স্ত্রীরাও পারিজাতের মঞ্জরী ধারণ করছে, সেই উগ্রসেন এদের কাছে রাজা নয়। উগ্রসেন সমস্ত রাজাদের রাজা হয়ে থাকবেন। আজ আমি একা পৃথিবীকে কৌরবশূন্য করে দ্বারকায় ফিরব। কৌরব ও পাণ্ডবদের সবাইকে বিনাশ করে সস্ত্রীক শাম্বকে নিয়ে ফিরে যাব। কুরুকুলের সঙ্গে এই হস্তিনাপুরীকেই তুলে গঙ্গায় নিক্ষেপ করব। এই বলে হস্তিনার প্রাকার ও খাত কর্ষণের জন্য হলের অধোমুখ লাগিয়ে আকর্ষণ করলেন। সহসা হস্তিনাপুরী দুলে উঠল। সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে কৌরবরা আর্তস্বরে বলে উঠলেন, আপনি কোপ সংবরণ করুন, প্রসন্ন হয়ে ক্ষমা করুন আমাদের। আপনার প্রভাব না জেনেই আমরা অপরাধ করেছি। শাম্ব ও তার পত্নীকে আমরা প্রত্যর্পণ করছি। এই বলে তাঁরা সত্বর নগর থেকে বেরিয়ে এসে শাম্ব ও তার পত্নীকে বলরামের হাতে দিলেন। তাঁরা দ্বারকায় ফিরে গেলেন। এইজন্যই দেখা যাবে যে আজও হস্তিনাপুর গঙ্গার দিকে কিছু ঝুঁকে আছে।

পরাশর বললেন, বলবান বলরাম তাঁর যে কাজ করেছিলেন তাও

বলি। নরকাসুরের দ্বিবিদ নামে এক বানর সখা ছিল। সেই দ্বিবিদ দেবতাদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করে সে ভেবেছিল যে সে একাই সমস্ত যজ্ঞ নষ্ট করে ও মর্ত্যলোক ক্ষয় করে দেবতাদের প্রতিক্রিয়া করবে। এই ভেবে সে যজ্ঞ নষ্ট, সাধুর মর্যাদাহানি ও দেহীদের ক্ষয় করতে লাগল। কখনও নগর, গ্রাম বা বন পোড়াতে লাগল, কখনও বা পাহাড় নিক্ষেপ করে গ্রামাদি চূর্ণ করতে লাগল। আবার কখনও পর্বত উৎপাটন করে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করতে লাগল। তাতে সমুদ্র ক্ষোভিত হয়ে তীরের গ্রাম ও নগরাদি প্লাবিত করতে লাগল। বানর নানা রূপ ধারণ করে গ্রামাদি লুণ্ঠন করে বেড়াতে লাগল।

একদিন বলরাম রৈবত উদ্যানে রেবতী ও অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে মিলে মদ্যপান করছিলেন এবং গান গেয়ে গেয়ে তাদের সঙ্গে ক্রীড়া করছিলেন। দ্বিবিদ নামের সেই বানর সেখানে এসে বলরামের হল ও মুষল নিয়ে নানা বিড়ম্বনা শুরু করল। মেয়েদের সামনে হেসে হেসে মদের পাত্রগুলি ভেঙে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। বলরাম রেগে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু দ্বিবিদ তাঁকে অবজ্ঞা করে কিলকিলা ধ্বনি করল। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম উঠে হাতে মুষল নিলেন, আর বানরও এক পর্বতের মতো প্রস্তর হাতে নিয়ে তাঁর দিকে নিক্ষেপ করল। বলরামের মুষলে লেগে সেই পাথর খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। বানর লাফিয়ে এসে করতল দিয়ে বলরামের বুকে আঘাত করল। বলরাম তাঁর করতল দিয়ে বানরের মাথায় এমন আঘাত করলেন যে সে রক্ত বমি করে মাটিতে পড়ে গেল। মনে হল যেন ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্বতের চূড়া শতধা বিদীর্ণ হল। বানরের মৃত্যু হলে বলরামের মাথায় দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন।

বলরাম এই রকমের আরও অনেক আশ্চর্যজনক কাজ করেছিলেন।

ঋষির শাপে যদুবংশ বিনাশ

পরাশর বললেন, বলরামের সহায়তায় কৃষ্ণ এইভাবে দৈত্য ও দুষ্ট রাজাদের বধ করে এবং অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আঠারো অক্ষৌহিণী সেনা বধ করে পৃথিবীর ভার হরণ করলেন। তারপর বিপ্রদের শাপে নিজের কুলেরও উপসংহার করে নিজের মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করে গেলেন।

মৈত্রেয় বললেন, কৃষ্ণ বিপ্র শাপের ছলে কিভাবে নিজের কুল ধ্বংস করেন ও নিজের দেহত্যাগ করেন?

পরাশর বললেন, কোন এক সময়ে পিণ্ডারক নামে এক মহাতীর্থে যদু কুমারেরা বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ মুনিকে আসতে দেখেছিলেন। যৌবনমত্ত সেই কুমাররা জাম্ববতীর পুত্র শাম্বকে স্ত্রীবেশে সাজিয়ে মুনিদের প্রণাম করে বললেন, এই পুত্রকামী বভ্রুর স্ত্রীর কী সন্তান হবে, তাই বলুন। কিন্তু দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মুনিরা এই প্রতারণায় কুপিত হয়ে বললেন, ইনি যে মুষল প্রসব করবেন, তাতে সমস্ত যাদবরা ধ্বংস হবেন। ঋষিরা এই শাপ দিলে তাঁরা উগ্রসেনকে গিয়ে সব কথা বললেন।

যথাসময়ে শাম্ব একটি মুষল প্রসব করলে উগ্রসেন সেটিকে চূর্ণ করিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করালেন। মুষলের যে খণ্ডটি চূর্ণ হল না তোমরের আকার সেই খণ্ডটিও সমুদ্রে ফেলা হল। সেই মুষল চূর্ণ তিন দিকে ধারাল এরকা তৃণ বলে পরিণত হল এবং মুষলের তোমরাকার খণ্ডটি একটি মাছ খেয়ে ফেলে। তারপরে মাছটি ধরা পড়ার পরে তার পেট থেকে সেটি বেরোলে জরা নামে এক ব্যাধ সেটি পায়।

একদিন দেবতাদের নিকট থেকে এক দূত এসে কৃষ্ণকে প্রণাম করে বললেন, নির্জনে আপনাকে কিছু বলবার জন্য দেবতারা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। একশো বছরেরও বেশি হল আপনি পৃথিবীতে এসেছেন। দুর্বৃত্তরা নিহত হয়েছে এবং পৃথিবীর ভারও

কমেছে। দেবতাদের প্রার্থনা যে আপনি স্বর্গে এসে আবার তাঁদের সঙ্গে মিলিত হোন।

কৃষ্ণ বললেন, আমি সমস্তই জানি। যাদবকুলের ক্ষয় না হলে পৃথিবীর ভার কমবে না। সমুদ্র থেকে পাওয়া দ্বারকাপুরীও সমুদ্রকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। এ কাজ শেষ হলেই আমি দেহত্যাগ করব। কৃষ্ণের এই উত্তর পেয়ে দেবদূত ইন্দ্রের নিকটে ফিরে গেলেন।

এদিকে দ্বারকায় দিবানিশি দিব্য, ভৌম ও অন্তরীক্ষগত নানা উৎপাত দেখা যেতে লাগল। কৃষ্ণ তাই দেখে যাদবদের বললেন, চল, এইসব উৎপাতের শান্তির জন্য আমরা প্রভাস তীর্থে অবিলম্বে যাই। কৃষ্ণের এই কথা শুনে উদ্ধব বললেন, এই কুলের বিনাশের লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন আমার কী কর্তব্য, সেই আদেশ করুন। কৃষ্ণ বললেন, তুমি গন্ধমাদন পর্বতে নরনারায়ণের নিবাস বদরিকাশ্রমে গিয়ে তপস্যা কর, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। উদ্ধব তাঁকে প্রণাম করে বদরিকাশ্রমে চলে গেলেন এবং যাদবরা কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে রথে চড়ে প্রভাস তীর্থে এলেন।

এখানে এসে কুকুর ও অন্ধক বংশীয়রা স্নান করে কৃষ্ণের আজ্ঞায় সুরাপান আরম্ভ করলেন। তারপর পরস্পরর সংঘর্ষে কলহ শুরু হল এবং সেই কলহ বৃদ্ধি পেয়ে যদুবংশ ধ্বংস হবার উপক্রম হল। অস্ত্র দিয়ে তাঁরা পরস্পরকে আক্রমণ করলেন এবং অস্ত্রাদি নিঃশেষ হলে সমুদ্রের এরকা সংগ্রহ করে তাই দিয়ে পরস্পরকে প্রহার করতে লাগলেন। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, কৃতবর্মা, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ, পৃথু, বিপৃথু, চারুবর্মা, চারুক ও অক্রূর প্রভৃতি যাদবরা এই এরকা রূপী বজ্র নিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাঁদের নিবারণ করতে গেলে তাঁকে প্রতিপক্ষের সহায় ভেবে তাঁরা হানাহানি বন্ধ করলেন না। তাতে কুপিত হয়ে কৃষ্ণও এক মুষ্টি এরকা নিয়ে আততায়ী যাদবদের বধ করতে লাগলেন। অন্য যাদবরাও পরস্পরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলেন।

এই সময়ে সারথি দারুকের চোখের সামনেই তাঁকে অবজ্ঞা করে অশ্বরা কৃষ্ণের জৈত্র রথ সমুদ্রে টেনে নিয়ে গেল। কৃষ্ণের শঙ্খ, চক্র গদা, অসি, শার্ঙ্গ ও তূণদ্বয়ও তাঁকে প্রদক্ষিণ করে আকাশপথে চলে গেল। ক্ষণকালের মধ্যেই দেখা গেল যে কৃষ্ণ ও দারুক ভিন্ন আর কোন যাদব জীবিত নেই। এক স্থানে বলরাম এক বৃক্ষমূলে বদ্ধাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর মুখ থেকে এক বিরাট সর্প বহির্গত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করল।

বলরামের নির্বাণ দেখে কৃষ্ণ দারুককে বললেন, তুমি দ্বারকায় গিয়ে বসুদেব ও উগ্রসেনকে এই সংবাদ দাও। যোগ অবলম্বন করে আমিও দেহত্যাগ করব। দ্বারকার অধিবাসী ও আহুককে বোলো যে সমুদ্র দ্বারকা প্লাবিত করবে। অর্জুন এসে দ্বারকা ত্যাগ করে গেলে আর কেউ যেন দ্বারকায় না থাকে, তারা যেন অর্জুনেরই অনুগমন করে। তারপর তুমি অর্জুনের নিকটে গিয়ে বলবে যে তিনি যেন নিজের শক্তি অনুসারে আমার পরিবার পালন করেন। অর্জুনের সঙ্গে তুমিও দ্বারকাবাসীদের নিয়ে যেও এবং বজ্রকে যদু বংশের রাজপদে অভিষিক্ত কোরো। এই আদেশ নিয়ে দারুক চলে গেলেন।

কৃষ্ণ তারপর ধ্যানে বসলেন। দুর্বাসার শাপের সম্মানে জানুর উপরে পা রেখে যোগ অবলম্বন করলেন। সেই সময়ে জরা ব্যাধ সেখানে উপস্থিত হল। তার হাতে যে বাণ ছিল, তার অগ্রভাগে ছিল সেই মুষলের শেষ খণ্ড। জরা কৃষ্ণের চরণকে মৃগ ভেবে সেই বাণে তাঁকে বিদ্ধ করল। তারপর নিকটে এসে একজন মানুষকে বিদ্ধ করেছে দেখে নানা ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করল। কৃষ্ণ বললেন, তোমার ভয় নেই, আমার প্রসাদে তুমি স্বর্গে যাবে। তৎক্ষণাৎ এক বিমান এল এবং তাতে চড়ে ব্যাধ স্বর্গে চলে গেল। তারপর কৃষ্ণ তাঁর মানুষ দেহ ত্যাগ করলেন।

অর্জুন এসে কৃষ্ণ, বলরাম ও প্রধান যাদবদের দেহ অন্বেষণ করে

বার করে সংস্কার করালেন। রুক্মিণী প্রমুখ কৃষ্ণের আটজন প্রধান মহিষী তাঁর দেহের সঙ্গে আগুনে প্রবেশ করলেন। রেবতীও বলরামের সঙ্গে আগুনে প্রবেশ করলেন। এই সংবাদ শুনে উগ্রসেন, রোহিণী, দেবকী ও বসুদেব—এঁরাও আগুনে দেহত্যাগ করলেন। অর্জুন এঁদের সকলের প্রেতকার্য শেষ করে বজ্র ও যাদবদের সঙ্গে কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীদের নিয়ে দ্বারকা ত্যাগ করলেন।

কৃষ্ণের মৃত্যুর পরেই সুধর্মা সভা ও পারিজাত স্বর্গে চলে গিয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর দিনই কলিযুগ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সমুদ্র এসে শূন্য দ্বারকাপুরী প্লাবিত করল, শুধু জেগে রইল কৃষ্ণের গৃহ। আজও সমুদ্র এই মন্দির গ্রাস করেনি। কৃষ্ণ এখানে সর্বদা সন্নিহিত আছেন। কৃষ্ণের এই ক্রীড়াস্থল পরম পবিত্র, এই স্থান দর্শনে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের পত্নীদের উপাখ্যান ও পাণ্ডবদের বনগমন

পরাশর বললেন, অর্জুন ধনধান্য সমন্বিত পঞ্চনদ দেশে দ্বারকাবাসীদের বাস করালেন। তারপর একা স্বামীহীনা স্ত্রীদের নিয়ে যাত্রা করলেন। এই দৃশ্য দেখে লোভী আভীর দস্যুরা মিলিত হয়ে মন্ত্রণা করল, অর্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বড় বড় বীরদের বধ করে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি গ্রামবাসীদের পরাক্রম জানেন না। এসো, আমরা আমাদের বড় বড় লাঠি নিয়ে আক্রমণ করি। এই বলে তারা মহিলাদের দিকে ধাবিত হল। অর্জুন হেসে তাদের বললেন, যদি মরতে না চাস তো পালা। কিন্তু তারা পালাল না দেখে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনুতে জ্যা আরোপের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। অতি কষ্টে জ্যারোপণ করলেও তা শিথিল হয়ে পড়ল এবং চিন্তা করেও তাঁর অস্ত্রের মন্ত্রাত্মক প্রয়োগ মনে করতে পারলেন না। যে সব বাণ নিক্ষেপ করলেন তা কারও মর্মভেদ করতে পারল না। আভীরদের

সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁর অক্ষয় তূণও ক্ষয় হয়ে গেল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে কৃষ্ণের বলেই তিনি বলীয়ান ছিলেন।

দস্যুরা অর্জুনের সামনেই সুন্দরী স্ত্রীদের আকর্ষণ করতে লাগল। অনেক স্ত্রী নিজের ইচ্ছাতেই দস্যুদের অনুগমন করল। নিরস্ত্র অর্জুন যখন তাঁর ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে দস্যুদের প্রহার করতে লাগলেন, তখন সেই প্রহারে তারা উপহাস করতে লাগল এবং তাঁর সামনেই যদুকুলের বরস্ত্রীদের নিয়ে প্রস্থান করল। দুঃখে অর্জুন কাঁদতে লাগলেন, বললেন, কৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা করেছেন।

এইভাবে বিলাপ করে অর্জুন মথুরা নামে পুরীতে এসে বজ্রকে রাজা করলেন। তারপর এক বনের মধ্যে ব্যাস ঋষিকে দেখে সবিনয়ে তাঁকে অভিবাদন করলেন। অর্জুনকে ভাল করে দেখে ব্যাস বললেন, তুমি এমন শ্রীহীন হয়েছ কেন বল তো?

অর্জুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের পরাভবের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বললেন, আমি কৃষ্ণের স্ত্রীদের রক্ষক হয়ে আসছিলাম, দস্যুরা তাদের যষ্টি প্রহরণে আমাকে পরাজিত করে তাদের হরণ করেছে। আমার লজ্জা নেই, অথবা আমার কলঙ্ক বোধ নেই তাই এমন অবমানিত হয়েও আমি বেঁচে আছি।

ব্যাস বললেন, পরাজিত হয়েছ বলে তোমার সন্তাপের প্রয়োজন নেই। প্রথম জীবনে পুরুষের অনেক পরাক্রম থাকে। ভীষ্ম দ্রোণকে তুমি বিনাশ করেছ, তাঁরা কি কালক্রমে হীনবল হয়ে পড়েছিলেন বলেই পরাজিত হননি! আর দস্যুরা কৃষ্ণের স্ত্রীদের হরণ করেছে বলে তুমি যে শোক করছ, এর বৃত্তান্ত বলছি। পুরাকালে অষ্টাবক্র নামে এক ঋষি বহু বছর জলে বাস করে ব্রহ্ম চিন্তা করছিলেন। সেই সময়ে অসুরদের জয় করে দেবতারা সুমেরু পর্বতে এক মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি সহস্র সহস্র বরাঙ্গনা তাতে যোগ দিতে যাবার সময় পথে এই ঋষিকে কণ্ঠ পর্যন্ত জলে নিমগ্ন দেখে স্তব করে প্রণাম করেন।

অষ্টাবক্র প্রসন্ন হয়ে বললেন, তোমরা বর নাও, সে বর দুর্লভ হলেও আমি তা দেব। তাঁরা বললেন, পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে আমরা পতিরূপে পেতে চাই। 'তথাস্তু' বলে ঋষি জল থেকে উত্থিত হতেই তাঁর আট ভাগে বক্র রূপ দেখে তাঁরা হাসি লুকোতে পারলেন না। ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, আমার বিরূপ দেহ দেখে তোমরা হেসে আমার অবমাননা করলে তো! পুরুষোত্তমকে তোমরা স্বামীরূপে পাবে ঠিকই, কিন্তু পরে তোমরা দস্যুদের হাতে যাবে। এই কথা শুনে অপ্সরারা তাঁকে নানাভাবে প্রসাদিত করলে ঋষি বললেন, পরে তোমরা স্বর্গে যাবে। সেই বরাঙ্গনারাই অষ্টাবক্রের বরে কৃষ্ণকে স্বামী রূপে পেয়েও তাঁরই শাপের জন্য দস্যুদের হাতে পড়েছে। এর জন্য তুমি শোক কোরো না অর্জুন, এ সবই কৃষ্ণের জন্য হয়েছে। তোমাদেরও বিনাশ আসন্ন বলেই বলবীর্য লোপ পেয়েছে। তুমি ভাইদের এ কথা বুঝিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে তপস্যার জন্য বনে যাবার চেষ্টা কর। যুধিষ্ঠিরকে আমার কথা বলে পরশুই বনে যাবার ব্যবস্থা কোরো।

অর্জুন গিয়ে তাঁর অন্য চার ভাইকে সব কথা জানালেন। সব শুনে তাঁরা পরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বনে গেলেন।

পঞ্চমাংশ সমাপ্ত

ষষ্ঠাংশ

কলিযুগ ও প্রলয়ের বর্ণনা

মৈত্রেয় বললেন, আপনার নিকট সৃষ্টি বিষয় ও বংশানুচরিত শুনলাম। এইবারে প্রলয়ের স্বরূপ শুনতে চাই।

পরাশর বললেন, কল্পান্তে ও প্রকৃতির প্রলয়ে প্রাণীর উপসংহার এবং প্রলয়ের স্বরূপ শোন। মানুষের এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি, এক বৎসরে দেবতাদের এক দিবারাত্রি ও দু হাজার চতুর্বিধ যুগে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগ। দেবতাদের বারো হাজার বৎসরে মানুষের এই চার যুগ হয়। সৃষ্টির প্রথম সত্যযুগ ও শেষ কলিযুগ ছাড়া অন্য সমস্ত যুগের একই স্বরূপ। প্রথম সত্যযুগে ব্রহ্মা সকল প্রাণী সৃষ্টি করেন এবং শেষ কলিযুগে সৃষ্টির উপসংহার করেন।

মৈত্রেয় বললেন, যে কলিতে চতুষ্পাদ ধর্ম বিলুপ্ত হবে, আপনি সেই কলির কথা বলুন।

পরাশর বললেন, তুমি যে কলিযুগের কথা শুনতে চাইছ, তা আসন্ন হয়েছে। এই কলিতে বর্ণাশ্রমের প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হবে এবং বেদবিহিত ক্রিয়া এবং পূজাপার্বণ লোপ পাবে। গুরু শিষ্যর সম্বন্ধ থাকবে না, ধর্মানুসারে বিবাহ হবে না এবং দাম্পত্য ব্যবহার অন্য রকম হবে। বলবান ব্যক্তি সকলের প্রভু হবে এবং যে কোন কুলের কন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বিবেচিত হবে। পুরুষ তার ধনের গর্ব করবে এবং স্ত্রীলোক শুধু কেশের পারিপাট্যে নিজেকে সুন্দরী ভাববে। তারা ধনহীন পতিকে পরিত্যাগ করবে এবং ধনবানই স্ত্রীদের ভর্তা হবে। মানুষ অর্থের জোরেই সবার উপরে প্রভুত্ব করবে। ধনের জন্য ব্যয় না করে গৃহ নির্মাণেই অর্থক্ষয় করবে। পরকালের চিন্তা না করে অর্থ উপার্জনের চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে থাকবে

এবং সেই অর্থে কারও উপকার না করে নিজের ভোগেই অপব্যয় করবে।

স্ত্রীলোকেরা বিলাসব্যসনে অনুরাগী ও স্বেচ্ছাচারী হবে। তারা হ্রস্বদেহ, লোভী ও গুরুভোজী হবে। তাদের ভাগ্যহীন অনেক সন্তান হবে। তারা স্বামীর আজ্ঞা অনায়াসে অবজ্ঞা করবে, নিজের দেহ পোষণে ব্যস্ত থাকবে ও নিরন্তর পরুষ ও মিথ্যাভাষী হবে। দুঃশীলা হয়ে অসচ্চরিত্র পুরুষে স্পৃহা করবে এবং নিরন্তর অনাচারে রত থাকবে।

প্রজারা অনাবৃষ্টির ভয়ে কাতর হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে। অন্নের অভাবে পত্র, কন্দ প্রভৃতি খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করবে এবং দুর্দশায় আত্মহত্যা করবে। রাজারা প্রজা পালন করবে না, অথচ কর গ্রহণের ছলে সবলে বিত্তহরণ করবে। হাতী, ঘোড়া, রথ থাকলেই মানুষ রাজা হবে এবং অশক্তরাই ভৃত্য বলে পরিগণিত হবে। বৈশ্যরা শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করবে এবং শূদ্ররা তাপসের বেশ ধারণ করে ভিক্ষাব্রতী হবে। দ্বিজাতিরা পাষণ্ডের আচার ও বৃত্তি অবলম্বন করবে।

কলিকালে আট নয় ও দশ বছর বয়সের বালকের সহবাসে পাঁচ ছয় ও সাত বছরের বালিকারা সন্তান প্রসব করবে। বারো বছরেই মানুষ বৃদ্ধ হবে এবং বিশ বছরের বেশি কেউ বাঁচবে না। শ্বশুর ও শাশুড়ীই প্রধান গুরু হবে, শ্যালক ও সুন্দরী স্ত্রীলোকের পতিরাই বন্ধু হবে।

কলির এই সমস্ত দোষ থাকা সত্ত্বেও একটি পরম গুণ এই হবে যে সত্যযুগে কঠোর তপস্যা করে যে পুণ্য অর্জন করতে হত, অতি অল্প পরিশ্রমেই মানুষ তা অর্জন করতে পারবে।

পরাশর বললেন, এ সম্বন্ধে বেদব্যাস যা বলেছিলেন তা শোন। কোন্ কালে অল্প ধর্মের অনুষ্ঠান করেও বেশি ফল পাওয়া যায় এই নিয়ে এক সময়ে মুনিদের মধ্যে তুমুল বিবাদ আরম্ভ হয়েছিল

সংশয় ভঞ্জনের জন্য তাঁরা ব্যাসের নিকটে গিয়ে দেখলেন যে তিনি গঙ্গায় অর্ধস্নাত অবস্থায় আছেন। গঙ্গাতীরে গাছের নিকটে দাঁড়িয়ে তাঁরা যখন অপেক্ষা করছিলেন, তখন দেখতে পেলেন যে ব্যাস একবার জল থেকে উঠে বললেন, কলিকালই সাধু। আর একবার উঠে বললেন, শূদ্র, তুমিও সাধু ও ধন্য। এবং এইভাবে তৃতীয়বার উঠে বললেন, স্ত্রীগণ, তোমরাই সাধু ও ধন্য, তোমাদের চেয়ে ধন্য পৃথিবীতে আর কে আছে! তারপর স্নান ও নিত্যক্রিয়া শেষ করে নিজের আশ্রমে ফিরলে মুনিরা তাঁর নিকটে এসে আসন গ্রহণ করলে তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কেন আমার কাছে এসেছেন?

মুনিরা বললেন, আমরা যে সংশয় ভঞ্জনের জন্য এসেছি তা পরে বলব। আগে আপনি বলুন যে স্নান করতে করতে কেন আপনি বারংবার বললেন, কলি সাধু, শূদ্রও সাধু এবং স্ত্রীরাও সাধু ও ধন্য।

এই প্রশ্ন শুনে বেদব্যাস একটু হেসে উত্তর দিলেন, আমি এই জন্যে বলেছি যে সত্যযুগে দশ বৎসর। ত্রেতায় এক বৎসর, দ্বাপরে এক মাস পরিশ্রম করে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও জপে যে ফল লাভ হয়, কলিতে এক দিবারাত্রির পরিশ্রমেই সেই ফল পাওয়া যায়। এই জন্যেই আমি কলিকে সাধু বলেছি। এইভাবে সত্যযুগে ধ্যান করে, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠানে ও দ্বাপরে অর্চনায় যে ফল পাওয়া যায়, কলিতে শুধু হরিনাম করেই সেই ফল লাভ হয়। এইজন্যই আমি কলির উপরে সন্তুষ্ট। তারপর দ্বিজাতির নানা নিয়ম কানুন মেনে ধর্মার্জন করতে হয়। সে সবে কোন ক্রুটি হলেই তাদের পাপের ভাগী হতে হয়। কিন্তু শূদ্রের জন্য কোন নিয়মকানুন নেই, দ্বিজাতির সেবা করেই তারা পাপযজ্ঞের ফল পায়। এই জন্যই আমি তাদের সাধু বলেছি। এইভাবে পুরুষদের সৎপথে অর্থোপার্জন ও সদ্ব্যয়ের জন্য নানা ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা কায়মনোবাক্যে স্বামীর সেবা করেই সুফল লাভ করতে পারে।

এইজন্য আমি তাদেরও সাধু বলেছি। এইবারে আপনাদের প্রশ্নের বিষয় বলুন।

ঋষিরা বললেন, আমাদের প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে গেছি।

বেদব্যাস তখন হেসে বললেন, আপনাদের প্রশ্ন আমি বুঝতে পেরেছিলাম বলেই এইভাবে উত্তর দিয়েছি। কলিকালে অতি অল্প আয়াসে ধর্ম সিদ্ধ হয়। শূদ্ররা দ্বিজদের সেবা এবং স্ত্রীলোকেরা পতিসেবা করেই পুণ্য অর্জন করতে পারে। এই জন্যই কলি, শূদ্র ও স্ত্রী-জাতি ধন্য।

পরাশর বললেন, এইবারে আমি তোমাকে প্রলয়ের কথা বলছি। নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক ও প্রাকৃতিক ভেদে প্রাণীদের প্রলয় তিন প্রকার। কল্পান্তে যে প্রলয় তার নাম নৈমিত্তিক, মোক্ষ রূপ প্রলয়ের নাম আত্যন্তিক এবং প্রাকৃত প্রলয় দ্বিপরার্ধিক।

মৈত্রেয় বললেন, পরার্ধ কী তা আমাকে বলুন।

পরাশর বললেন, এক থেকে ক্রমশ দশ গুণ করে গেলে অষ্টাদশ স্থানে পরার্ধ হয়। তার দ্বিগুণ সময়ের পর প্রাকৃত প্রলয় হয়। এই সময়ে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ অব্যক্তে লয় হয়।

মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের এক দিবারাত্রি, তিনশো ষাট বৎসরে তাদের এক বৎসর। সেই পরিমিত বারো হাজার বছরে মানুষের চার যুগ এবং সহস্র চার যুগে ব্রহ্মার একদিন। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলা হয়। এক কল্পে চতুর্দশ মনু উৎপন্ন হন। তারপর ব্রাহ্ম নামে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়। এর স্বরূপ অত্যন্ত উগ্র। এর বর্ণনার পরে তোমাকে প্রাকৃত প্রলয়ের কথা বলব।

প্রথমে একশো বছর কঠিন অনাবৃষ্টি হয়। তাতেই বহু পার্থিব জীব ক্ষয় হয়। তারপর বিষ্ণু রুদ্র রূপ ধারণ করে সূর্যের সপ্ত রশ্মিতে থেকে সমস্ত জল শোষণ করেন। পৃথিবী ও পাতালের জলে পুষ্ট হয়ে সেই সাত রশ্মি সাতটি সূর্যরূপে প্রকাশ পায়। তার তেজে শুধু পৃথিবী নয় সমস্ত ত্রিভুবন দগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত হয়। ভূবর্লোক

ও স্বর্গলোকবাসী মনু প্রভৃতি মহাত্মারা তাপে পীড়িত হয়ে মহর্লোকে যান ; কিন্তু সেখানেও আগুনের তাপে সন্তপ্ত হয়ে বাঁচার আশায় তাঁরা জনলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর সংবর্তক নামে বজ্র ও বিদ্যুতে ভরা নানা বর্ণের মেঘ সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে। সেই মেঘ মুষলধারে শতশত বৎসর বারি বর্ষণ করে সেই সর্বব্যাপী আগুনকে শান্ত করে ত্রিভুবন প্লাবিত করে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে ত্রিলোক একটি মহাসমুদ্রে পরিণত হবে। তারপর বিষ্ণুর নিঃশ্বাসে উৎপন্ন বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে মেঘকে বিনাশ করবে। বিষ্ণু তখন নিজেই সেই বায়ু নিঃশেষে পান করে সমুদ্রের মধ্যে শেষ শয্যায় শয়ন করবেন। জনলোকের সনকাদি সিদ্ধ ঋষিরা তাঁর স্তব ও ব্রহ্মলোকের মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তাঁর ধ্যান করবেন। এইভাবে ব্রহ্মার এক রাত্রির অবসানে বিষ্ণু জাগ্রত হলে জগৎ কর্মোন্মাদনা লাভ করে।

পরাশর বললেন, এইবারে তোমাকে প্রাকৃতিক প্রলয়ের বিষয়ে বলি। প্রলয়কাল উপস্থিত হলে প্রথমে রস থেকে উৎপন্ন জল পৃথিবীর গন্ধাত্মক গুণ গ্রাস করে। তারপর অগ্নি জলের গুণ রসকে শোষণ করে এবং রসহীন জল তেজে প্রবেশ করে। তখন বায়ু তেজের আধার সূর্যকে গ্রাস করতে থাকে এবং ভুবন অন্ধকার হয়ে যায়। ক্রমে সেই বায়ু আকাশকে অবলম্বন করে দশ দিকে প্রবাহিত হয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মূর্তিহীন আকাশ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করে পঞ্চভূত—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। এই ভাবেই পৃথিবী প্রভৃতি সপ্ত প্রকৃতি প্রলয়ের সময়ে লীন হয়ে যায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। তাঁকে প্রধানও বলা হয়। তিনিই জগতের পরম কারণ। ব্যক্তরূপা প্রকৃতি অব্যক্তে লয় হন। যে নিত্য শুদ্ধ স্বরূপ পরম পুরুষ সর্বভূতের অধিষ্ঠাতৃরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকেন, তিনি পরমাত্মারই অংশ। প্রকৃতি ও এই পুরুষ উভয়েই পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন।

পরাশর বললেন, প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার দিন বা রাত্রি বলে কিছু নেই। তাঁর বিরাটত্ব দেখাবার জন্যই এই সব কল্পনা করা হয়। এইবারে তোমাকে আত্যন্তিক প্রলয়ের কথা বলছি।

আত্যন্তিক প্রলয় এবং কেশিধ্বজ ও খাণ্ডিক্যের উপাখ্যান

পরাশর বললেন, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপ জানবার পর জ্ঞানবৈরাগ্য উৎপন্ন হলেই পণ্ডিত ব্যক্তি লয় প্রাপ্ত হন। শারীর ও মানস ভেদে আধ্যাত্মিক তাপ দু রকম। রোগ জনিত শরীরের দুঃখ বহুবিধ, কামক্রোধাদি থেকে উৎপন্ন মানস দুঃখও অনেক প্রকার। এই সমস্ত দুঃখকে আধ্যাত্মিক তাপ বলা হয়। অন্যান্য প্রাণীর কাছ থেকে যে দুঃখ, তার নাম আধি-ভৌতিক। আধিদৈবিক দুঃখ শীত গ্রীষ্মাদি প্রাকৃতিক কারণে উৎপন্ন হয়।

মাতৃগর্ভ থেকেই দুঃখ ভোগের আরম্ভ। বার্ধক্যেও এই দুঃখের শেষ নেই। মৃত্যুর পর নরকে তার পীড়ন হয়। স্বর্গে গিয়েও পতনের ভয়ে ভীত হয়ে দুঃখের অবসান নেই। তারপর পুনর্জন্ম ও পুনরায় দুঃখভোগ। মুক্তি না হলে এই দুঃখের শেষ হয় না। একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তিতেই আনন্দরূপ সুখলাভ। পণ্ডিতরা এইজন্য ভগবানকে পাবার জন্য যত্ন নেন। জ্ঞান ও কর্ম দুইই ভগবৎ প্রাপ্তির হেতু।

জ্ঞান আগম বা শাস্ত্র ও বিবেক থেকে উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রের জ্ঞানে শব্দ ব্রহ্ম ও বিবেকের জ্ঞানে পরম ব্রহ্মকে জানা যায়। মনুও বলেছিলেন যে ব্রহ্ম শব্দময় ও পরম। শব্দ ব্রহ্মকে জানবার পর পরম ব্রহ্মকে জানা যায়। আথর্বণী শ্রুতিতে আছে যে কর্ম ও জ্ঞানরূপ বিদ্যাও দু রকম। পরাবিদ্যায় অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। বেদের বিদ্যাই পরাবিদ্যা।

ভগবৎ শব্দের ভকারের দুটি অর্থ—তিনি সকলের ভরণকর্তা ও

সবকিছুর আধার এবং গকারের অর্থ গময়িতা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের ফলভোক্তা ও স্রষ্টা। ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছটিকে ভগ বলে। বকারের অর্থ সর্ব ভূতে অবস্থান। অর্থাৎ অব্যয়। তাই ভগবৎ শব্দে পরম ব্রহ্মকেই বোঝায়। সমস্ত প্রাণীই পরমাত্মায় আছেন এবং পরমাত্মাও সমস্ত প্রাণীতে আছেন। ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে জানবার জন্য স্বাধ্যায় ও যোগ চক্ষুর মতো, চর্মচক্ষে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না।

মৈত্রেয় বললেন, যে যোগ জানলে পরমেশ্বরকে দেখা যায়, সেই যোগ কী তা জানতে ইচ্ছা করছে।

পরাশর বললেন, পুরাকালে কেশিধ্বজ খাণ্ডিক্যজনককে যোগের বিষয়ে যা বলেছিলেন, আমি তোমাকে তাই বলছি।

মৈত্রেয় বললেন, কেশিধ্বজ কে এবং খাণ্ডিক্যজনকই বা কে ছিলেন এবং কেন তাঁরা যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন?

পরাশর বললেন, ধর্মধ্বজ জনক নামে এক রাজার মিতধ্বজ ও কৃতধ্বজ নামে দুই পুত্র ছিল। কৃতধ্বজ অধ্যাত্মশাস্ত্রে অনুরাগী ছিলেন। এই কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ অধ্যাত্মবিদ্যায় কৃতী হয়েছিলেন। মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্যজনক কর্মমার্গে পারদর্শী হয়েছিলেন; কিন্তু কেশিধ্বজের নিকট পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁর পরিজন, পুরোহিত ও মন্ত্রীদের নিয়ে দূরে দুর্গম অরণ্যে বাস করছিলেন।

রাজা কেশিধ্বজ জ্ঞাননিষ্ঠ হয়েও কর্মদ্বারা মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য অনেক যজ্ঞ করেছিলেন। একদিন বিজন বনে এক বাঘ যোগানুষ্ঠানে রত রাজার ধর্মধেনুকে বধ করে। যজ্ঞের দুধ দেবার গাভী নিহত হয়েছে বলে প্রায়শ্চিত্তের কী বিধান আছে, রাজা পুরোহিতদের তা জিজ্ঞাসা করলেন। পুরোহিতরা বললেন, আমরা জানি না, আপনি কশেরুকে জিজ্ঞাসা করুন। কশেরু বললেন, আমিও জানি না, আপনি ভার্গব শুনককে জিজ্ঞাসা করুন।

শুনকের নিকটে গিয়ে তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সম্প্রতি পৃথিবীতে কেউ এ কথা জানে না ; একমাত্র ব্যক্তি যিনি এ কথা বলতে পারেন তিনি হলেন তোমার শত্রু খাণ্ডিক্য। কেশিধ্বজ বললেন, প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানতে গিয়ে যদি আমি নিহত হই, তা হলেও আমি যজ্ঞের ফল লাভ করব, আর যদি উত্তর পাই তাহলে তো আমার যজ্ঞ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হবে। এই বলে রাজা কেশিধ্বজ কালো মৃগ চর্ম পরে রথে চড়ে খাণ্ডিক্যের বনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কেশিধ্বজকে দেখে খাণ্ডিক্য রাগে তাঁর চোখ লাল করে ধনুক হাতে নিয়ে বললেন, কৃষ্ণাজিন ধারণ করে তুমি আমায় বধ করতে এসেছ তো! ভেবেছ, তোমাকে আমি হত্যা করতে পারব না, কিন্তু মৃগয়ায় গিয়ে কালো মৃগ কি আমরা বধ করি না? কেশিধ্বজ বললেন, আমি একটা সংশয়ের উত্তর পেতে এসেছি। তোমাকে বধ করতে আসিনি। তুমি তোমার ক্রোধ ও বাণ পরিত্যাগ কর। খাণ্ডিক্য তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রীদের সঙ্গে একান্তে মন্ত্রণা করলেন। তাঁরা বললেন, শত্রু বশে এলে তাকে বধ করাই কর্তব্য, তাতে পৃথিবী আপনার বশ হবে। কিন্তু খাণ্ডিক্য বললেন, তাতে আমার পৃথিবী লাভ হবে ঠিকই, কিন্তু ওর পরলোক জয় হবে। পৃথিবা তো ক্ষণকালের, কিন্তু পরলোক জয় অনন্ত কালের। কাজেই আমি ওকে বধ না করে ওর প্রশ্নের উত্তর দেব। এই বলে খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজের নিকটে গিয়ে বললেন, তোমার কী জিজ্ঞাস্য আছে বল। কেশিধ্বজ তাঁর ধর্মধেনু বধের বিবরণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানতে চাইলেন। খাণ্ডিক্য ন্যায়ানুসারে গোবধের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন। কেশিধ্বজ সেই বিধান নিয়ে ফিরে গিয়ে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। তার-পর অবভৃথ স্নান করে দেখলেন যে এত করেও তাঁর মন প্রসন্ন হয় নি। হঠাৎ মনে হল যে খাণ্ডিক্যকে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয় নি।

এ কথা মনে হতেই তিনি আবার রথে চড়ে খাণ্ডিক্যের কাছে গিয়ে

উপস্থিত হলেন, এবং তাঁকে আবার দেখতে পেয়ে খাণ্ডিক্য সশস্ত্র হয়ে রইলেন। কেশিধ্বজ বললেন, আমি তোমার কোন অপকার করতে আসি নি। আমি এসেছি তোমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে। খাণ্ডিক্য তাঁর মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন, ওব কাছে কী চাওয়া যায়? মন্ত্রীবা বললেন, ওঁব সমস্ত বাজ্য চেয়ে নিন। খাণ্ডিক্য হেসে বললেন, পরমার্থ কী তা জানেন না বলেই আপনারা আমাকে এই রকম পরামর্শ দেন। এই বলে খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজ রাজাব নিকটে গিয়ে বললেন, অধ্যাত্মবিজ্ঞানরূপ পরমার্থ বিষয়ে তুমি বিচক্ষণ। তাই তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ বল যে কী কর্ম করলে সমস্ত ক্লেশের শান্তি হয়।

কেশিধ্বজ বললেন, তুমি আমার কাছে নিষ্কণ্টক রাজ্য কেন চাইলে না?

খাণ্ডিক্য বললেন, শক্তিহীন বলেই আমার রাজ্য তুমি অপহরণ করেছিলে, রাজ্যপালন অবিদ্যা বলে তা ত্যাগ করলে আমার দোষ হত। ক্ষত্রিয়ের রাজ্যস্পৃহা ধর্মানুরোধে নয় বলেই আমি তা চাই নি। কেশিধ্বজ এই কথায় সাধুবাদ দিয়ে বললেন, অনাত্মে আত্মবুদ্ধি ও যা নিজের নয় তা নিজের মনে করা—অবিদ্যা এই দুই রকম। মোহে আচ্ছন্ন হয়েই জীবেরা 'আমি ও আমার' এই কথা ভাবে। পঞ্চভূতে উৎপন্ন সেই তো আত্মা নয়, তাই দেহধারী জীবের আত্মবুদ্ধি তাকে সংসারে আবদ্ধ করে। জন্মজন্মান্তর এই সংসার-পথে ভ্রমণ করে জীব শুধু বাসনার ধূলায় ধূসরিত হয়ে মোহভ্রমই লাভ করে। জ্ঞানের উষ্ণ জলে সেই ধূলা প্রক্ষালিত হলেই সংসার-পথিকের মোহভ্রম শান্ত হয়, অন্তঃকরণ সুস্থ হয় এবং পরম নির্বাণ লাভ করে। জ্ঞানময় অমল আত্মা সর্বদাই মুক্ত। অজ্ঞান ও দুঃখ প্রকৃতির ধর্ম, আত্মার নয়। এই অবিদ্যার বীজ থেকে উৎপন্ন ক্লেশ ক্ষয় করতে যোগ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

খাণ্ডিক্য বললেন, নিমির বংশে একমাত্র তুমিই এই যোগ শাস্ত্রের

অর্থ জেনেছ, এই যোগের স্বরূপ তুমি আমাকে বল। কেশিধ্বজ বললেন, মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়ে আসক্ত হলেই মন বন্ধন ও তা পরিত্যাগ করেই মন মুক্তির কাবণ হয়। সেই জন্যই জ্ঞানী মুনিবা মুক্তির জন্য মনকে পরমেশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত রাখেন। ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের নামই যোগ। চুম্বকের মতো তিনি যোগীকে আত্মভাবে আকৃষ্ট করে রাখেন। যোগী নিষ্কাম হয়ে ব্রহ্মচর্য. অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহে নিযুক্ত থাকবেন এবং সংযত চিত্তে স্বাধ্যায়. শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা ও পরব্রহ্মের চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখবেন। যে জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি দূর হয়, যা বাক্যের অগোচর, যা শুধু আত্মাই জানতে পারে, তারই নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বিষয়ান্তরে স্পৃহাহীন যে অবিচ্ছিন্ন চিন্তাধারায় শুধু পরমেশ্বরের রূপই প্রতীতি হয়, তার নাম ধ্যান। আর ধ্যানের কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগ করে শুধু মন দিয়ে স্বরূপ মাত্রের যে জ্ঞান হয় তারই নাম সমাধি। সমাধিই ভগবানের স্বরূপ জানার একমাত্র বিজ্ঞান। সেই পরমাত্মার ভাবনায় নিমগ্ন জীব তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হয়, ভেদজ্ঞান থাকে অজ্ঞানতার জন্যই।

খাণ্ডিক্য বললেন, তবে তো মিথ্যাই আমরা 'আমি' ও 'আমার' ভাবি।

এরপর কেশিধ্বজ নিজের নগরে ফিরে গেলেন এবং খাণ্ডিক্য তাঁর পুত্রকে রেখে যোগসিদ্ধির জন্য আরও গভীর বনে প্রবেশ করলেন। পরমেশ্বরের চিন্তায় রত থেকে তিনি বিষ্ণু নামের নির্মল ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেশিধ্বজ রাজাও মুক্তির জন্য নিজের অদৃষ্ট ক্ষয় করতে বিষয় ভোগ করে ও নিষ্কাম ভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পরাশর বললেন, এরই নাম তৃতীয় প্রলয় বিমুক্তি, জীব শাশ্বত ব্রহ্মের স্বরূপে আত্যন্তিক রূপে লয় হয়।

বিষ্ণুপুরাণের মাহাত্ম্য ও উপসংহার

পরাশর বললেন, তোমাকে আমি সবই বললাম, যদি আর কিছু ানবার থাকে তো বল।

মৈত্রেয় বললেন, আপনার কৃপায় তো জানতে পারলাম যে এই গৎ বিষ্ণু থেকে ভিন্ন নয়, তাই আর আমার কিছু জানবার নেই। ামাকে পুরাণ বলে যে কষ্ট পেলেন, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

পরাশর বললেন, এই পুরাণ শুনে সমস্ত দোষ থেকে উৎপন্ন পাপ ্রশান্ত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর অবভৃথ স্নান করে যে ফল লাভ য়, এই পুরাণ শুনলে সেই ফল পাওয়া যায়। প্রয়াগ, পুষ্কর, রুক্ষেত্র ও অর্বুদাচলে উপবাস করলে যে ফললাভ হয়, এই পুরাণ ুনলেও সেই ফল পাওয়া যায়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করে এক ৎসরে যে ফল লাভ হয়, একবার এই পুরাণ শুনলে সেই ফল াওয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করে মথুরায় বিষ্ণুর র্শন ও অর্চনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই পুরাণ কীর্তন রেও সেই ফল লাভ হয়। ঐ দিনে মথুরায় বিষ্ণুর অর্চনা করে যমুনার লে স্নান করে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিলে যে ফল লাভ হয়, এই পুরাণের একটি মাত্র অধ্যায় শুনলেই সেই ফল পাওয়া যায়।

পুরাকালে ব্রহ্মা ঋভুকে এই আর্য পুরাণ বলেছিলেন। ঋভু প্রিয়ব্রতকে, প্রিয়ব্রত ভাগুরিকে, ভাগুরি স্তবমিত্রকে, স্তবমিত্র ধীচিকে, দধীচি সারস্বতকে, স্বারস্বত ভৃগুকে, ভৃগু পুরুকুৎসকে, পুরুকুৎস নর্মদাকে, নর্মদা ধৃতরাষ্ট্র ও পুরণ নাগকে এই পুরাণ দিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনে নাগরাজ বাসুকিকে, বাসুকি বৎসকে, ৎস অশ্বতরকে, অশ্বতর কম্বলকে ও কম্বল এলাপত্রকে বলেছিলেন। বেদশিরা মুনি পাতালে গিয়ে এই পুরাণ পেয়েছিলেন। তিনি প্রমতিকে, প্রমতি জাতুকর্ণকে এবং জাতুকর্ণ অন্যান্য পুণ্যবান মহাত্মাদের নিকটে তা প্রকাশ করেন। বশিষ্ঠের বরে আমিও এই

পুরাণ জেনেছি। আমি তোমাকে বললাম। কলির শেষে তুমি শমীককে এই পুরাণ শুনিও।

এই পুরাণ শুনলে সমস্ত দোষ মুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যহ এই পুরাণ শুনলে পিতৃপক্ষ, মানুষ ও দেবতাদের স্তবের ফল পাওয়া যায়। এই পুরাণের দশ অধ্যায় শুনলে কপিলা গোদানের পুণ্য হয়। বিষ্ণুকে চিন্তা করে যে এই পুরাণ শুনবে, তার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হবে।

নিত্য সনাতন প্রকৃতি-পরমাত্মাময় নানারূপধারী হরি সকলকে জন্মজরাদিরহিত সিদ্ধি প্রদান করুন ঃ

ইতি বিবিধমজস্য যস্য রূপং প্রকৃতিপরমাত্ময়ং সনাতনস্য।
প্রদিশতু ভগবানশেষপুংসাং হরিরপজন্মজরাদিকাং স সিদ্ধিম্ ॥

॥ বিষ্ণুপুরাণ সম্পূর্ণ ॥